অনুবাদকের কথা

আমেরিকায় তখন সদ্য ফাঁসি হয়ে গেছে রোজেনবার্গ দম্পতি জুলিয়াস আর এথেলের। ইংরিজিতে 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ' কলকাতায় মাত্র দু-চার কপি এসেছে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমাকে বললেন, ক্যালকাটা বুক ক্লাব এখুনি এ বইয়ের বাংলা তর্জমা বার করতে চান এবং ওঁরা চান আমাকে দিয়ে করাতে। রোজেনবার্গের ছেলেদের মানুষ করার জন্যে যে তহবিল হয়েছে, তাতে এ বই বাবদ মোটা টাকা দিতে হবে ব'লে পারিশ্রমিক খুব বেশি পাব না। বইটা উল্টেপাল্টে তৎক্ষণাৎ আমি রাজী হয়ে গেলাম।

কিন্তু কাজে হাত দিয়ে পড়ে গেলাম ফাঁপরে। একেবারে মার্কিনী ইংরিজি। তার অর্থোদ্ধার করতে যে অভিধান দরকার তা বেশ দুষ্প্রাপ্য। অথচ তাড়াতাড়ির কাজ। লেখার পর মাজাঘষা করারও সময় নেই। যেই লিখছি সেই প্রেসের লোক এসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যতই শেষের দিকে আসছি ততই আমার মনের ভার এত বেড়ে যাচ্ছে যে, কলম যেন চলতে চাইছে না। শেষের কয়েক পাতা আমি যে কিভাবে লিখেছি কাউকে ব'লে বোঝাতে পারব না। ঘর বন্ধ ক'রে আমি সমানে কেঁদেছি আর তারপর একটু একটু ক'রে লিখেছি। এক সময়ে মনে হচ্ছিল আমার পক্ষে বোধহয় বইটা শেষ করা আর সম্ভব হবে না। প্রেসের লোক এসে দিনের পর দিন খালি হাতে ফিরে গেছে। প্রকাশকেরও মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা। তর্জমা শেষ হওয়ার পর একটা সপ্তাহ আমি দুজন প্রিয়জনকে হারাবার শোকে বিহ্বল হয়ে কাটিয়েছি। তর্জমা করতে গিয়ে এমন বিপদ ঘটবে আগে ভাবিনি। ক'টা মাস জুলিয়াস আর এথেলের সঙ্গে আমি যেন অহোরাত্র বাস করেছি। শেষকালে ফাঁসুড়ের দল ওদের নিয়ে চলে গেছে। এক নিষ্ঠুর অবিচারের আমি দর্শক। অনুবাদকের এই অসহায়তায় সেদিন আমি শুধু চোখের জল ফেলেছি। রোজেনবার্গদের দুই ছেলে। মাইকেলের বয়স তখন দশ আর রবার্টের ছয়।

তারপর দীর্ঘ পচিশ বছর পরে বাংলায় 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ' আবার নতুন করে ছাপাচ্ছে 'ঈশান'।

রোজেনবার্গদের ফাঁসির পর এই মামলা নিয়ে পঁচিশ বছরের মধ্যে পঁচিশটা বই বেরিয়েছে। এর অনেক বইতেই দেখানো হয়েছে যে, গোটা মামলাটাই

গ্রেপ্তার ও বিচার

প্রিয়তম জুলি, ২৫শে জুলাই, ১৯৫০

রাত এখন প্রায় একটা। কাজেই চিঠিটা হবে ছোট। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ দুটো টন্-টন্ করছে।

সাড়ে এগারোটা বাজতে তবে মাইক ঘুমুল। এইমাত্র কাপড়-জামাগুলো মেলে দিয়ে আসছি। হাতে বিস্তর কাজ। তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে একের পর এক কাজগুলো চুকিয়ে ফেলতে হবে। একগাদা বিল এসে পড়ে আছে—দু-দুটো টেলিফোনের। আর কতদিন বিলগুলো না মিটিয়ে ফেলে রাখা যায়?

তোমায় ভালবাসি, প্রিয় আমার। ফিরে ফিরে কেবলি তোমার কথা মনে হয়। রবিবার তোমাকে আমি দেখতে যেতে পারব। এ কটা দিন কেমন করে কাটাই? রবিবার তোমার দেখা পাবো—জেলখানায়। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না।

ছেলেদুটো কেবলি তোমার নাম করে। তুমি ওদের শুভেচ্ছা নিও। তুমি কাছে নেই, প্রিয় আমার, সমস্তই কেমন যেন বদলে গেছে। শুভরাত্রি।

এথেল

প্রিয়তম জুলি, ২৯শে জুলাই, ১৯৫০

শেষ পর্যন্ত আজ সকালে তোমার চিঠিটা আমার হাতে এল। গোড়ায় কাজের কথাগুলো সেরে নেওয়া যাক। 'ডান্ অ্যাণ্ড ব্র্যাড্ ষ্ট্রীট' থেকে লোক এসেছিল। গ্রাহকদের কাছে ওরা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে—বাকিতে আর কাগজ দেবে না। অ্যাকাউন্টাণ্ট মশাই বিষ্যুৎবার আসছেন। কাল আমি একটু সকাল-সকাল দোকানে

যাবো। খাতাপত্রগুলো একবার দেখতে হবে। টাকাটা ওরা যাতে মিটিয়ে দেয় তার ব্যবস্থা করব।

চার্লিকে আমি বলেছি, ওর কোন ভয় নেই। যদি কখনও আমরা দোকান বন্ধ করে দেওয়া সাব্যস্ত করি, তাহলে যথেষ্ট সময় থাকতে ওকে জানিয়ে দেওয়া হবে—যাতে হঠাৎ না ওকে বেকার হয়ে যেতে হয়।

নতুন চিকিৎসায় গ্ল্যাডি-র* বেশ কাজ হয়েছে। ও যদি সত্যিই সেরে ওঠে—ওঃ, কী ভালই যে হয়! গ্ল্যাডি এখনও তোমার ব্যাপারটা জানতে পারে নি। ওর না জানাই ভাল।

বেচারা মাইক! ওতো ভেবেই পায় না কেন তোমার সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেবে না। অন্তত টেলিফোনেও তো কথা বলতে দিতে পারে। অনবরত ও আমাকে ঘ্যান-ঘ্যান করে বলছে—যেন আমি বলতে না ভুলি যে, তোমার জন্যে ওর মন কেমন করছে; যেন বলতে না ভুলি, ও তোমাকে ভালবাসে। রবীও সব সময় তোমাকে খোঁজে। আর আমি সারাক্ষণ চেষ্টা করছি যেন কিছুতেই ভেঙে না পড়ি।

দোহাই তোমার, নিজের দিকে একটু তাকিও। বিশ্বাস করো—আমার ওপর যে আস্থা তুমি রেখেছ, আমি তার উপযুক্ত হবার চেষ্টা করছি। তবুও তোমাকে ছেড়ে থাকতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে আমি কী যে ভালবাসি! রবিবার দেখা হবে।

এথেল

প্রিয়তম জুলি আমার, ১২ই আগস্ট, ১৯৫০

এতদিনে আমার খবরটা নিশ্চয় জেনে গেছ। বুঝতেই পারছ কেন আমি মেয়েদের জেলখানায় বসে চিঠিটা লিখছি। যদি আমি বলতে পারতাম, প্রিয় আমার—আমি উতলা হইনি, আমি শান্ত,

*এথেলের ভাই বার্নির স্ত্রী

আমি আত্মস্থ। কি ভালই যে হত। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি আকুল হয়ে চোখের জল ফেলেছি অনেক। তাই বলে আমি হাত-পা ছুঁড়ে কোন অবস্থাতেই কাঁদিনি। কাগজে যা বেরিয়েছে তা সত্যি নয়। রবিবার তোমাকে আমি দেখতে পাবো না। তোমার কথা ভাবি—আর আমার মন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

ভেবেছিলাম এই সপ্তাহের মধ্যেই ছেলেদুটোর একটা ব্যবস্থা করে ফেলব—যাতে আমাকে ধরে নিয়ে গেলে ওদের আবার না খুব কষ্টে পড়তে হয়। কিন্তু কারো সঙ্গে ওদের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা আর হয়ে উঠল না। তোমার কাছে লুকুবো না—ওদের ভবিষ্যতের কথা যত ভাবছি, ততই দুর্ভাবনায় শিউরে উঠছি। মনে হয়, মিস্টার ব্লকে-র* সঙ্গে কথা হ'লে পর অনেকখানি সোয়াস্তি পাবো। ওদের ব্যাপারে যদি তোমার কিছু মনে হয়, আমাদের উকিল মশাইকে জানিয়ে দিও। আমাকে লিখো।

প্রিয় আমার, শেষ যেটুকু সময় তোমার সঙ্গে কাটাবার অনুমতি পেয়েছিলাম, কী অসামান্য মূল্যবান সেই সময়টুকু।

এখন আটটা বাজে। আজ রাত্রের মত আমাদের দরোজায় তালা পড়েছে। আমার বিশ্বাস, জানলাটার মুখ গ্রীণউইচ্ অ্যাভিন্যুর দিকে ফেরানো। রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড একটা বাসাবাড়ি। জানলাগুলো দেখতে পাচ্ছি।

যতদূর মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি চিঠি লিখতে পারি মাসে শুধু একটা। কিন্তু আজ আমি ক্যাপ্টেন হাবার্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। যাতে আমরা পরস্পরকে আরও ঘন ঘন চিঠি লিখতে পারি, সে বিষয়ে আমার অনুরোধ তিনি বিবেচনা করে দেখবেন বলেছেন।

রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে, প্রিয়তম, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি। আমার কথা তুমি শুনতে পাওনা বলে আমি কাঁদি।

*ইমান্যুয়েল ব্লক, জুলিয়াসের তরফে এথেলের নিযুক্ত উকিল

আর নিজেকেই নিজে বলি, নিশ্চয় সেই একই বিফলতায় তোমার কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ। প্রিয় আমার, যেন আমরা পরস্পরকে না হারাই—যেন ছেলেছুটোর কাছ-ছাড়া না হই। যেন আমরা এক হয়ে থাকি।

এতদিন যে সার্থক সুন্দর জীবন আমরা যাপন করে এসেছি, তার কথা আমি ভাববার চেষ্টা করি। সেই জীবনের কোলে আবার ফিরে যাবার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠি।

হে আমার প্রিয়তম পুরুষ, তোমাকে ঘিরে আমার সমস্ত ভালবাসা, আমার ঐকান্তিক ভাবনা। যত তাড়াতাড়ি পারো চিঠি দিও।

এথেল

প্রিয়তম, ২০শে আগস্ট, ১৯৫০

এখন সাতটা বেজে পনেরো। গা ধুয়ে, সাবান-কাচার পর্ব শেষ করে ভিজে জিনিসগুলো শুকোতে দিয়ে এসেছি। সাড়ে সাতটা হলেই 'বাড়ি'র (সেলগুলোকে এখানকার মেয়েরা বলে 'বাড়ি') দিকে রওনা দেব। আটটার সময় তালাবন্ধ করবে। আলো নিভবে ন-টায়। পরদিন ভোর সাড়ে ছ-টায় আবার উঠবার পালা।

আমি তোমার ছুটো চিঠি পেয়েছি। আমার চিঠিগুলো তুমি পেলে কিনা জানাতে ভুলো না। তাহলে আমি বুঝব চিঠিতে কতটা কী লেখা যেতে পারে। ক্যাপ্টেন হাবার্ড আমাকে অবশ্য সপ্তাহে একটা করে চিঠি লেখার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সব চিঠি বিনা বাধায় তোমার কাছে পৌঁছুবে।

তোমার দ্বিতীয় চিঠিটা যখন এল, ঠিক সেই সময় চিঠিটা পাওয়া আমার পক্ষে একান্ত দরকার ছিল। মোটামুটিভাবে বলা চলে, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে আমি বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েই চলেছি। তবে মাঝে মাঝে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায়, মুষড়ে পড়ি। শনিবারটা ছিল এমনি এক অশান্তির দিন। রবিবার অনেকটা ভাল ছিলাম।

সকালের বেশ খানিকটা সময় প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স-এর প্রার্থনাসভায় কেটেছে। গান গাইবার সুযোগ জুটে গিয়েছিল আমার। এই ফাঁকে বলে রাখি, আমার গান গাইবার গলা যে আছে—দিন কয়েকের মধ্যেই ওরা তা টের পেয়ে গেছে। তার পর থেকে প্রায় রোজ রাত্তিরেই গান গাওয়ার ফরমাশ হয়। একদিন সকালে চা খাবার সময় তো আমি অবাক,—হলঘরটা পেরিয়ে দূরে যে দালানগুলো আছে, সেখানকার একদল মেয়ে আমার গানের খুব সুখ্যাতি করল।

গত শুক্রবার আমি ইহুদিদের প্রার্থনাসভায় ছিলাম। বড্ড তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে গেল। ধর্মযাজকটি এত সুন্দর পড়ছিলেন।

সাতে-পাঁচে সপ্তাহটা কেটে যাবে। বিকেলে এক ঘণ্টা ছাদের ওপর খাবারদাবার বিলি হয়। কাল যখন আমি নেমে আসছি, আমাকে সমাজসেবার সভায় যেতে বলা হল। গিয়ে দেখি মিসেস পি-* বসে আছেন। ওঁর মঙ্গল হোক। উনি বললেন, বাড়ির কাজকর্মের জন্যে মা একজন বেশ ভাল মেয়ে পেয়েছেন। মাইকেল নাকি নিজে থেকেই মিসেস পি-র সঙ্গে এসে দেখা করে। গত সপ্তাহে উনি নাকি মাইকেলকে একটা স্যাণ্ডউইচ্ দিয়ে ট্যাক্সিতে করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।

আশা করি, আদালতে আজ তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব। প্রিয়তম, আমার ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রাণের জুলি আমার, ২৯শে আগস্ট, ১৯৫০

সেদিন কোর্টে আমরা কিছুক্ষণ দুজনে দুজনকে কাছে পেয়েছিলাম। পরে আমার মনে হল, যা বলেছি তা ছাড়াও আরও কিছু বলার

*মিসেস পি-জুয়িশ বোর্ড অব গার্ডিয়ান্স-এর একজন সমাজসেবী কর্মী

ছিল। এবার সেই কথা তাহলে বলি। তবু আমি সবটা প্রকাশ করে কিছুতেই বলতে পারতাম না। তুমি যে আমার কত গর্বের, তোমার প্রতি আমার কত যে ভালবাসা, কত যে গভীর শ্রদ্ধা,—আমি তা বলতে পারতাম না। আমার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে বিশ্বাস আর আনন্দের এমন এক উদ্বেলিত অনুভূতি, আমাদের সমৃদ্ধ সার্থক জীবনের এমন এক অভ্রান্ত উপলব্ধি যে, হঠাৎ এক দুর্দমনীয় বাসনা আমায় পেয়ে বসছে—তোমাকে দেখবার, তোমাকে সেকথা বলবার আর সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে চুম্বন করবার দুর্দমনীয় বাসনা।

প্রিয় আমার, আমরা দুজন দুজনের সম্বন্ধে যা কিছু ভাবি—এসো আমরা চিঠির মধ্যে তার সবটা উজাড় করে দিই। পরস্পরকে জানাবার শুধু এই একটিমাত্র রাস্তাই আমাদের আছে—যখন ভাবি কী খারাপ যে লাগে! গেল বুধবার এরই মধ্যে দীর্ঘ অতীত বলে মনে হচ্ছে। আবার কবে দেখা হবে? মন মানছে না।

সোমবার মিস্টার ব্লকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মঙ্গলবার তোমার বোন লেনা এবং তোমার মা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। শুধু লেনাই দেখা করবার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু আমি যাবার সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দুজনকেই হাত নেড়ে ইশারা করেছিলাম। আমি জানি, আগের মতই আমার শরীর ভাল, মন প্রফুল্ল দেখে তোমার মা ভরসা পেয়েছিলেন। প্রিয় আমার, মোটের ওপর আমার স্বাস্থ্য ভাল, মনও চাঙ্গা আছে। আমার জন্যে মোটেই ভেবো না। ভাল কথা, ক্লিনিকের ডাক্তার গত সপ্তাহে আমার পিঠ পরীক্ষা করে দেখেছেন। বড় ডাক্তারের কাছে রিপোর্টও দিয়েছেন। আশা করছি, দিন কয়েকের মধ্যেই ওঁর সঙ্গে দেখা হবে।*

দাবাখেলায় তোমার বিক্রমের কথা শুনে, হে আমার "প্রাণেশ্বর ও প্রাণনাথ", তোমাকে যথাবিহিত অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু তাই

*এথেল এই সময় মেরুদণ্ড সংক্রান্ত রোগে ভুগছিলেন

বলে তোমার স্ত্রীও নেহাৎ অপদার্থ নয়। খবর্দার, যেন বলো না—মিসেস্ পি-র জন্মে আমি একটা চমৎকার সবুজ রঙের সোয়েটার বুনছি। বলোতো কেমন হবে! ভালবাসা জেনো, প্রিয়তম।

এথেল

প্রিয়তম জুলি, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

খবর পেলাম এদিকটায় ওরা চিঠিপত্র আটকাচ্ছে না। আমি হলে ওদিকটায় একবার পরখ করে নিতাম। আমি তো বুঝতেই পারছি না—সপ্তাহে ভারি তো এইটুকু একটু চিঠি, তাতে এত দেরি হয় কেন?

মাইকেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে আমার প্রস্তাবটার কথা মিস্টার ব্লক কি তোমায় জানিয়েছেন? অবশ্য এক্ষুনি জানাবার খুব তাড়াও নেই। কেননা আমরা এখনও জানি না ছেলেরা কোথায় থাকবে না থাকবে। যে জায়গায় তারা থাকবে, সেখানে তো এমন ইস্কুল নাও থাকতে পারে যে ইস্কুলে আমরা মাইকেলকে ভর্তি করাতে চাই।

অবশ্যই আমি বুঝি ওদের পরের বাড়িতে মানুষ হতে হবে। সে ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত। ছেলেদুটোর ওপর দিয়ে যে ধকল যাচ্ছে, তাতে আমারও খুব খারাপ লাগছে—এত রাগ হচ্ছে যে বলবার নয়। অবস্থা এমন থাকবে না—এই আশা নিয়ে আর বসেও থাকা যায় না। ওদের দুজনের জন্মে কী কী দরকার, তার একটা ফর্দ আমি তৈরি করছি। কিভাবে এতদিন ওরা মানুষ হয়েছে, তাও লিখছি। এইভাবে সময়টা কাজে লাগাতে পেরে ভারি ভাল লাগছে। এইভাবে লিখে লিখে এবং আমাদের ইচ্ছেগুলো জানতে চাওয়া হচ্ছে দেখে ওদের কাছে থাকার এবং ওদের যত্ন করবার অশান্ত বাসনার খানিকটা নিবৃত্তি হচ্ছে।

তুমি যত সহজে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার কথাটা বলেছ, সত্যিই

যদি দেখা করাটা অত সহজ হত। অবশ্য তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করো যাতে দেখা করার একটা ব্যবস্থা হয়।

প্রিয়তম, এখুনি ওরা আলো নিভিয়ে দেবে। তখন থাকব শুধু তুমি আর আমি। এমনি একটা ভাণ করি। তুমি কাছে নেই, বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে। যেখানে আমার স্থান, তোমার সেই দুই বাহুর নীড়ে কবে আবার আমি ফিরে যাবো। শুভরাত্রি, প্রিয় আমার।

এথেল

প্রিয়তম জুলি আমার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

তোমার আরও দুটো চিঠি পেলাম। প্রিয় আমার, ভাবতে পারা যায় না—আদরের গ্র্যাডি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে! ঘটনাটা ঘটবে বলে তৈরি হয়েই ছিলাম। তবু যখন উকিল মশাই খবরটা দিলেন, শুনে থ' হয়ে গেলাম। এখনও আমার যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ব্যথা করে ফেললেও ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও সত্যি হয়ে ওঠেনি।

প্রিয়তম, তোমার সুন্দর কথাগুলোর জন্যে ধন্যবাদ। ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রিয় আমার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

ওপরের তারিখটা দেখে বুঝবে আমার জন্মদিন এসেছিল, চলে গেছে। কতদিকের কত দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ তোমার—তার মধ্যে থেকেও দেখছি আমাকে কার্ড আর টেলিগ্রাম পাঠাতে ভোলোনি। তোমার অচঞ্চল অকাতর প্রেম আমার ঐশ্বর্য। তোমার সেই প্রেমই দেয় আমাকে আমাদের বিচ্ছেদের বেদনা বহন করবার ক্ষমতা, সন্তানদের ছেড়ে থাকার কষ্ট সহ্য করবার শক্তি।

রোজ সকালে উঠবার আগে আমাকে লড়তে হয়। ছেলেদুটোকে

দেখবার জন্যে একটা দারুণ দুরপনেয় বাসনা আমাকে পাগল করে; তাদের কথা মনে করে, তোমার কথা মনে করে হঠাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠবার এক অন্ধ উন্মত্ত আবেগ আমাকে পেয়ে বসে। তারপরই আমি মনে করতে থাকি—ধরো, গেল সোমবার কোর্টে তোমাকে কেমন দেখাচ্ছিল, তোমার কথাগুলো কিভাবে ঘরময় গমগম করছিল, আর তক্ষুনি নিজেকে তোমার চেয়ে অনেক ছোট বলে মনে হয়। তাতে আমার নিজের সম্বন্ধে গর্ববোধ এতটুকু কমে না, বরং গর্বের আরও খোরাক পাই, নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যায়।

কাল ছেলেদের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। আমার আদরের বার্নি ওদের নাম দিয়ে একটা কার্ড পাঠিয়েছে! ওর নিজের হাতে লেখা মাইকেলের নাম দেখে ভারি ভাল লাগল। কিন্তু এই ভেবে মনের মধ্যে খচখচ করে উঠল যে আমার অনেক আদরের গ্র্যাডি আর কখনও জন্মদিনে অভিনন্দন পাঠাবে না।

প্রেমমুগ্ধা—এথেল

প্রিয় জুলি, ৫ই অক্টোবর, ১৯৫০

কাল আমাদের সেই দেখা হবার পর থেকে আমি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরছিলাম। গুণতির সময় যখন আমি সেলে ফিরে গেলাম, ধোপদুরস্ত কাপড়জামা ছেড়ে যখন আবার আটপৌরে ধোকড়া গায়ে চড়ালাম, তখনও খুবই ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল তুমি আমার কাছে নেই। কখনও-সখনও যেটুকু সামান্য সময় আমরা এক সঙ্গে কাটাই, তাতে আমার মধ্যে তোমার অভাব আরও তীব্র হয়ে ওঠে। প্রিয়তম, তুমি আমার কাছে কত প্রিয়, তা কি জানো?

বিষ্যুৎবার মিসেস বি-* আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

*একজন সমাজসেবী

ছেলেদের থাকবার জায়গা সম্বন্ধে উনি যা বললেন, তাতে ওদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করছি। উনি ওদের সঙ্গে আজ দেখা করেছেন এবং তোমার সঙ্গে সোমবার দেখা করবার চেষ্টা করবেন।

যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হয়, জীবন যেন নতুন আশায়, নতুন অর্থে নিজেকে সাজায়। যখনই বিদায় নিই, বেদনায় হৃদয় ছিঁড়ে যায়। তবু প্রত্যেকবারই আমি কঠিন অবস্থায় হাল ধরবার, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করবার প্রেরণা পাই। আমাকে তা উদ্দীপিত করে, বাঁচিয়ে রাখে।

তোমার প্রেমমুগ্ধা স্ত্রী—এথেল

প্রিয়তম আমার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫০

আজ মনটাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা ক'রো। যেখানেই ব্যাপারটা ছেলেদের নিয়ে, সেখানেই আর কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারি না। ভেবে দেখ, এই শুক্রবার এগারো সপ্তাহ পুরো হবে আমি ছেলেদের দেখিনি। বিশ্বাস হয় না, ভাবা যায় না, মনে হলে বুকের স্পন্দন থেমে যায়। কী করেছি আমরা যে, এত দুঃখ আমাদের পেতে হবে? সারাটা জীবন আমরা ভদ্রভাবে বেঁচেছি, দুহাতে গড়েছি।

২৮শে অক্টোবর।—কানের এত কাছ থেকে একটা ধেড়ে ইঁদুর কিচমিচ করে ডেকে উঠেছিল যে ভোর সাড়ে চারটেয় ঘুম না ভেঙে পারেনি। স্প্রিংয়ের ওপর বারকয়েক দুপ-দাপ শব্দ ক'রে ইঁদুরটা সরু দালানে খর-খর করে ছুটে গেল। সেখানে উচ্চকণ্ঠে সে তার নালিশ জানাতে লাগল। কিন্তু সমস্তটাই হল তার অরণ্যে রোদন। তাকে দরোজা খুলে ভেতরে ডেকে নেবার ব্যাপারে কারো কোন গা দেখা গেল না। আমার যা ক্ষতি হবার তা হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও আর দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

ছেলেদের কথা আর আমাদের ভাঙা নীড়টার কথা মনে এলেও সচরাচর সেই ভাবনাটা আমাকে একেবারে পেয়ে বসতে পারে না,—মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু আজ আমি লড়াইতে হেরে গেলাম। দুপুরে খাওয়ার পর খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিলাম, মাথা ধরে ছিঁড়ে পড়তে লাগল। বসে থাকতে পারলাম না। ছাদে গিয়ে জন দুই মেয়ের সঙ্গে বল লোফালুফি করে মরীয়া হয়ে মাথাধরা ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হল না। ঘণ্টাকয়েক ধরে কেবলি মনে হতে লাগল এখুনি দুর্নিবার কান্নায় ভেঙে পড়ব। মনে হচ্ছিল, মাথাটা যেন চৌচির হয়ে ফেটে যাবে। সকালে আমি যার ওপর ডাক্তারি করেছিলাম, আমার সেই বিশেষ বন্ধুটি এবার আমার ওপর সেই একই ডাক্তারি ফলাতে শুরু করল। ঠাণ্ডা জলের ছাট দিতে দিতে আমাকে সে কাঁদতে বারণ করে প্রচণ্ডভাবে ধমকালো। তাতে বরং হিতে বিপরীত হল! বুঝতেই পারছ, আজকের দিনটা ছিল জেলখানার অনেক আরামের দিনের মধ্যে একটা দিন। আমার বন্ধুটি এখুনি মাথা ঘষে দিয়ে গেছে। চুলের গোড়াগুলো এখনও কাঁটা দিয়ে আছে। এখন মোটের ওপর অনেকটা ভাল লাগছে। এবার মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবেচিন্তে খানিকটা লিখতে পারব।

তুমি আমার হৃদয়ের কতখানি অধিকার করে আছো, তা কি জানো? আমার কাছে তুমি শক্তিমান হয়ে দাঁড়াও—আমার কথা ভেবে শক্ত হও। আমার ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রিয়তম, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫০

এসপ্তাহে চিঠি লেখার ব্যাপারে একটু পিছিয়ে পড়েছি। শুক্রবার দেখা হওয়ার পর যখন আমরা বিদায় নিয়ে চলে আসি, জেলখানার দেয়ালগুলো সত্যিই দখল করে নেয়। আর মনে হয় সপ্তাহের শেষটা যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

যাবো বলে আজ আমি ইচ্ছে করে একটু সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসেছিলাম। জেল-অফিস থেকে খবর এলেই চলে যাবো। সাড়ে দশটার সময় খবর এল আজ আমার যাবার দিন নয়। সুতরাং কাপড় জামাগুলো ছেড়ে আলনায় উঠিয়ে রাখলাম, বিছানায় চাদরগুলো লুটিয়ে পড়ল। আর এভাবে হদ্দ বোকা ব'নে গিয়ে তোমার বিক্ষুব্ধ বউ দালান পেরিয়ে অন্য একটা সেলে রাগে গটগট করে চলে গেল। খানিকক্ষণ মন খারাপ করে গোঁজ হয়ে বসে থাকার পর ঠিক করলাম বাকি দিনটা 'হেসে খেলে' কাটাবো।

দুপুরে খাওয়ার পর এই জেলখানার উদীয়মান খেলোয়াড়টি ছাদে গিয়ে তিন তিনটে রাণ করলেন। বল পিটিয়ে ছুটে যেতে আর আলো-বাতাস গায়ে লাগাতে কী ভাল যে লাগে! চারপাশে জ্বলজ্বল-করা মুখগুলোর দিকে তাকাই আর দেখি তাদের গভীর উল্লাস আর তীব্র বেদনা। সহজ আনন্দগুলো ভাগ করে নিতে কী মধুর যে লাগে! অনুভূতিগুলো কত সুন্দর, কত স্নিগ্ধ। ইঁটের দেয়াল আর লোহার গরাদে-ঢাকা এই বাড়িটার মধ্যে সেই আনন্দটুকু ভাগ হচ্ছে, আশ্চর্য!

বার বার হলেও আমি বলব, সত্যিকারের ভাল ভাল মানুষ আছে এ জায়গায়,—সেটাই এখানকার একমাত্র বাঁচোয়া।

ওগো, চলো বাড়ি যাই। তোমার জন্যে, ছেলে দুটোর জন্যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে—কী করব? আজ রাতে আমাকে তুমি কাছে টেনে নাও। আমার বড় একা একা লাগছে। অনেক, অনেক চুমো।

এথেল

এথেল, প্রিয় আমার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৫১

তুমি সত্যিই এক গৌরবময়ী মহীয়সী নারী। এথেল, তুমি সত্যিই শ্রদ্ধময়ী। মনের ভাব কাগজে ফোটাতে গিয়ে আমার চোখের দুকূল

জলে ছাপিয়ে উঠছে। আমি শুধু বলতে পারি, তুমি আমার পাশে আছো বলেই আমার জীবনটা সার্থক। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, মানুষ হিসেবে আমরা অনেকের চেয়ে ভাল—কেননা প্রাণ-ওষ্ঠাগত করা এই বিচার এবং নিষ্ঠুরতম দণ্ড সত্ত্বেও আমরা সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পেরেছি—পেরেছি কারণ, আমরা নির্দোষ।

যারা খবর রাখে না, কিংবা যাদের অনুভূতির বালাই নেই—তাদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল কিসের জোরে আমরা লড়ছি! আমাদের ছোট থেকে বড় হওয়া, আমাদের জীবনের পুরোপুরি অর্থ—তার গোড়ায় আছে আমাদের মার্কিন আর ইহুদি ঐতিহ্যের সত্যিকার সমন্বয়! আমাদের কাছে তার অর্থ স্বাধীনতা, সংস্কৃতি আর মানবিক সদাচার। এই ঐতিহ্যের কোলেই আমরা মানুষ। সাজানো আজগুবি মামলায় ফাঁসিয়ে নোংরামি, মিথ্যে আর কুৎসা দিয়ে কেউ আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। বরং যতদিন না আমরা নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছি, ততদিন তা আমাদের ক্রমাগত এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেবে।

এর মধ্যে আমরা নিজেরা সাধ করে মাথা গলাইনি। আমরা চেয়েছিলাম নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে। জোর করে যখন আমাদের মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে—যতক্ষণ না আমরা মুক্তি পাই, ততক্ষণ শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা লড়ে যাবো।

সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবি। তোমার জন্যে আমি কাতর। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই। তোমার অভাব এতো যে বেদনা আনে, এত যে জ্বালা ধরায়, তার শুধু একটি অর্থই আছে—আমার সত্তার তন্তুতে তন্তুতে জড়ানো তোমার প্রতি আমার ভালবাসা। আমি বার বার একই কথা বলতে পারি—তোমাকে কেন্দ্র করে আমার যে ভাবনা, স্ত্রী হয়ে যে অজস্র সুখ আমাকে তুমি দিয়েছো, তাতে আমার বেদনার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়েও অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকে। প্রিয় আমার, তোমাকে ছাড়া আমার চলে না; তুমি যে আমার কত আপনার! আমার মধ্যে যে জীবনরস তুমি সঞ্চারিত

করো, যদি আমার কাছ থেকে তার কিছুটাও তুমি নিতে পারো, তাহলে তুমি যে তারই জোরে সমস্ত দুঃখকষ্ট জয় করতে পারবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

মাইকেলের কাছ থেকে একটা চমৎকার চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা আমাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। তখন তখনই আমি ওর চিঠির জবাব দিয়েছি। আমাদের অফুরন্ত ভালবাসার কথা জানিয়েছি। যাতে বুঝতে কষ্ট না হয় সেইমত করেই ওর চিঠির আমি জবাব দিয়েছি। ওকে আমি লিখেছি, আমরা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়েছি এবং বড় আদালতে আপীল করার কথাটাও ওকে বুঝিয়ে বলেছি। ওকে জানিয়েছি, শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। ওকে দেখবার জন্যে আমরা যে কতটা উদ্গ্রীব এবং ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কোর্ট থেকে যে আমরা অনুমতি আদায়ের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, সে কথাও ওকে লিখেছি। মোটের ওপর মাইকেল বুঝবে বলেই মনে হয়।

আমাদের সাজা পাওয়ার কথাটা ওকে বলিনি। ওকে বলেছি মামলার ব্যাপারে সাক্ষাতে সব বলব। ছেলেদের ছেড়ে থাকাটা এত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়—কিন্তু লোহার গরাদেগুলো যে খুবই বাস্তব। আমি খাই, ঘুমোই, পড়ি আর ছোট্ট এই চার হাত সেল্‌টার মধ্যে পায়চারি করি। তোমার কথা, ছেলেদের কথা অজস্র ভাবি।

আমার পরিবার ষোলআনা আমার পেছনে। এতে আমি উৎসাহ পাই। আমি জানি, যত দিন যাবে ততই বেশি বেশি লোক এসে আমাদের পাশে দাঁড়াবে। তারা আমাদের এই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। আমার আদর জেনো। মুঠো মুঠো ভালবাসা।

তোমারই—জুলি

মৃত্যুপুরী

প্রিয়তম স্বামী আমার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫১

জোর করে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। জীবনে এমন আর কখনও হয়নি। এখানে এই মৃত্যুপুরীতে এসে পর্যন্ত আমাকে সারাক্ষণ সারাবেলা কেবলি ভারাক্রান্ত করে তোলে অগণিত স্মৃতি। মন চলতে চায় না। শুধু যদি তোমাতে আমাতে ভাগ করে নিতে পারতাম আমার হৃদয়মনের এই বোঝাটা, তাহলে দুজনে দুজায়গায় থাকার এই নিদারুণ জ্বালা আর থাকত না।

প্রিয় আমার, আমরা চলেছি ইতিহাস রচনা করতে। আমাদের সেই যাত্রাপথের দ্বিতীয় ধাপে আমি দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়েছি, তার লক্ষণগুলো ফুটে উঠেছে। আমার প্রকাণ্ড সেলটার গরাদের গায়ে একরাশ বই। বন্দীনিবাসে থাকার সময় যে চমৎকার রংচঙে কার্ডগুলো আমি জমিয়েছিলাম, আমার জন্মদিনে পাঠানো তোমার সেই অনিন্দ্যসুন্দর কার্ডটাও সে-দলে আছে। আমার লেখবার টেবিলের ওপরকার খোপে সেগুলোকে একটার পর একটা এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে সেদিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়, মন নেচে ওঠে। ছেলেদের ফটোগুলো আমি কার্ডবোর্ডের ওপর সরু ফিতে দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছি। যখনি ওদের দেখতে ইচ্ছে করে ফটোগুলোর দিকে তাকাই। অমনি ওরা আমার চোখে চোখ রেখে হেসে ওঠে। দিন আর রাত্রির বুক জুড়ে এখানে অতলস্পর্শ অনুচ্চারিত ব্যথাভরা আর্ত-নাদ, এখানে নিজেকে শুধু বঞ্চিত করা মিলনের দুরন্ত বাসনা। নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাবো আমি 'সাহস, বিশ্বাস আর লক্ষ্য', যার

ওপর ভর করে সেইসব দিন সেইসব রাত্রি আমি পার হতে পারব। প্রিয়তম জুলি, আমি অপেক্ষা করে আছি সেই দিনটির জন্যে, যেদিন আমাদের যাত্রার অবসান হবে—আবার আমরা ফিরে যাবো বহুমূল্য জীবনের কোলে। তোমাকে ভালবাসি, প্রিয় আমার।

এথেল

প্রিয়তমা এথেল, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫১

ওসিনিং থেকে তোমার চিঠি আজ বিকেলে আমার হাতে এসে পৌঁছুল। কী আশ্চর্য চিঠি লেখো তুমি! সত্যি বলতে কি আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তোমার খবরের জন্যে। ম্যানি যখনই আসে, ওর কাছ থেকে তোমার খবরাখবর পাই। কেমন করে তোমার সময় কাটে, তোমার স্পর্শকাতর মনে কিভাবে সিং-সিং জেল রেখাপাত করে—সমস্তই ও বলে।

তোমাকে সিং-সিং জেলে পাঠানোর ব্যাপারটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। বিচার-দপ্তর চাইছে আমাদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে এমন ভাবে চাপ দিতে যাতে দাবার ঘুঁটি হিসেবে আমাদের ওরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে! কিন্তু আমরা জানি, তাদের সে আশা ব্যর্থ হবে।

চিঠি পড়ে মনে হল, মস্ত বড় ঘা লাগলেও এবং নতুন জায়গায় গিয়ে গোড়ায় একটু আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লেও তোমার মধ্যে রীতিমত চিন্তার স্পষ্টতা এবং দৃঢ়চিত্ততা এসেছে। এত অল্পদিনের মধ্যে তুমি যে নিজেকে গুছিয়ে নিতে শুরু করেছো, সেটা কম কথা নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিকে তোমার যা তীক্ষ্ণ নজর, তাতে সহজেই তুমি নিজেকে সামলে নিতে পারবে।

এখন যখন তোমার শরীরটা ভালই আছে, আমি বলি কি একটা কাজ করো—নিয়ম করে ঘড়ি ধরে লেখাপড়ার কাজ শুরু করে

দাও, ধারাবাহিক ভাবে নিজে নিজে পড়ো, গানের চর্চা করো। তাহলেই দেখবে কষ্টগুলোকে আর কষ্ট বলে মনে হবে না, মনের অস্থিরতা দূর হবে।

টেম্প্‌ স্ট্রীটে মেয়েদের বন্দীনিবাসে তোমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আমাদের পক্ষের উকিলরা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব তোমার কাছাকাছি থাকার জন্যে যাতে আমি সিং-সিং জেলে বদ্‌লি হতে পারি। তুমি যেন আমাকে এই সংকল্প থেকে বিরত করার চেষ্টা করো না—কেননা এ আমাকে করতেই হবে।

তুমি যে সত্যিই অসামান্য, এই দারুণ অগ্নিপরীক্ষা থেকে কপালে জয়টিকা নিয়ে বেরিয়ে আসার মত সাহস ও স্থির লক্ষ্য যে তোমার আছে, তোমার এই একটি চিঠিই তার অক্ষয় প্রমাণ। তোমার পাশে আমার মাথা নত হয়ে আসে, আমি গর্ব বোধ করি। বধূ আমার, আমি প্রেরণা পাই।

সাধারণ মানুষের কাছে থেকে আমাদের ব্যাপারটার সত্যতা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আজ হোক কাল হোক, আসল কথা লোকে টের পাবে। এরই মধ্যে অনেকে আমাদের পক্ষের উকিলদের এবং আমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে জানিয়েছেন তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে চান। মনে সাহস আনো। জেনো আমরা একা নই।

আমাদের যে অমানুষিক দণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাতে লোকে গোড়ায় একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যত দিন যাবে, ততই প্রতিবাদের ঝড় প্রবলবেগে নেমে আসবে। সেই সঙ্গে সমানে চলতে থাকবে আমাদের আইনগত লড়াই। তারই ফলে আমরা মুক্তি পাবো।

প্রিয়তমা, আমি তাই বলে তোমার বাধাবিঘ্নগুলোকে ছোট করে দেখাতে চাইছি না। আমি ভাল করে জানি কী বেদনা কী দুঃস্বপ্ন তোমাকে ঘিরে আছে—আমি জানি মনে মনে তুমি কত কষ্ট পাও। আমি তোমাকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে চাই, তোমার কাছে

থাকতে চাই, বাহুডোরে তোমাকে বাঁধতে চাই। তবু আমি বিচলিত হই না—আমি জানি তোমার ওপর আমার এই অবিচলিত বিশ্বাসের জোরেই একদিন আমাদের বহুমূল্য জীবন আর সুন্দর সংসার ফিরে পাবো।

আর দুদিনের মধ্যেই আমাদের স্বজাতীয়দের মুক্তি সন্ধানের উৎসব—পার-হওয়ার পর্ব* এখানে অনুষ্ঠিত হবে। একালের ফেয়ারোর দল‡ আমাদের দুজনকে আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে, দুজনকে দুজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বন্দী করে রেখেছে। তাই এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আরও একটি তাৎপর্য আমাদের কাছে আছে।

ছেলেদের কথা খুব বেশি ভেবে ভেবে মন খারাপ করো না। ওদের মঙ্গলের জন্যে সম্ভবপর সমস্ত ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।

এথেল, তোমার মত মেয়েই আমি জীবনে কামনা করেছিলাম। পৃথিবীতে তা চিরসত্য হয়ে থাকবে। চিরদিন একান্ত তোমার

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৫১

সুপ্রভাত! এখন আটটা বেজে পনেরো। শুক্রবার আজ। ঘণ্টা দুই আগেও লাউডস্পীকারে কানে তালা ধরিয়ে বিগ্‌ল্‌-এর গাঁক্ গাঁক্ আওয়াজ হচ্ছিল। যে সেল্‌টায় আমি থাকি, তার বর্ণনা দেব?

তিন হাত চওড়া, চার হাত লম্বা আর মাথার সাত ফুট উঁচু এই সেল। মাথার ওপর সরু সরু লোহার জাল্‌তি। জাল্‌তিটাকে ঢেকে

*ইহুদিদের বসন্তকালীন পার্বণ। স্বাধীনতার উৎসব হিসেবে পালিত হয়।

‡প্রাচীন মিশরের নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা।

আছে যে মোটা একপর্দা কাঁচ, তার গায়ে পুরু হয়ে জমা একরাশ ধূলোর ভেতর দিয়ে ক্ষীণ আলো পাঠাবার নিস্ফল চেষ্টা করে এক একটি ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌। তার ফলে ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ গা শির শির করা কেমন যেন বিষন্ন একটা আবহাওয়া। এক নাগাড়ে এক ঘণ্টার বেশি পড়াশুনো করা আমার চোখে পোষায় না।

দুপাশে নীরেট ইস্পাতের দেয়াল। পেছনের দিকে লোহার গরাদগুলোর গায়ে জড়ানো আরও একপ্রস্থ তারের জাল। সামনের দিকে চার ইঞ্চি অন্তর লোহার গরাদ, দশ ইঞ্চি অন্তর পেটা লোহা আড়াআড়ি হয়ে আছে। শুনে অবাক হবে—গরাদের ভেতর দিয়ে দুটো হাতের কনুই পর্যন্ত আমি দিব্যি চালিয়ে দিতে পারি। রিসিভিং রুমে কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্তই আমি টের পাই। ডানদিকের দেয়ালে ওপর-নিচে দুটো ঝোলানো বিছানা। ওপরেরটায় আমি বইপত্র, দরকারী জিনিস আর কাপড়চোপড় রাখি। নিচেরটায় থাকে কম্বল, তোশক, বালিশ আর চাদর—বিছানাটা এত শক্ত যে স্বস্তিতে শোয়া যায় না। কোন রকমে যদি বা চোখের পাতা এক করি, একটানা বেশিক্ষণ ঘুমুনো কিছুতেই সম্ভব হয় না।

আমার সেলের ঠিক সামনেই তিরিশ ফুট লম্বা বিশ ফুট চওড়া খোলা জায়গা। তার ঠিক সামনে দিয়ে গেছে জেলখানার সদর রাস্তা। তামাম জেলখানার মধ্যে এই জায়গাটা দিয়েই লোকের আনাগোনা সব চেয়ে বেশি। সুতরাং, বুঝতেই পারছো আমি সব সময় নজরবন্দী হয়েই আছি—রাস্তা দিয়ে যেই যাক একবার করে আমার খাঁচাটার দিকে তাকায়।

আমার কাছে ওদের আসা বারণ। তবু বলতে গেলে জেলখানার প্রত্যেকটি লোকই রিসিভিং রুমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কখনও হাত নাড়ে, কখনও চিৎকার করে কুশল নেয়, কখনও আমার দিকে চেয়ে একমুখ হাসে। আরও ওদের মুখ দেখে আমি বুঝি, ওরা আমাকে উৎসাহ দিতে চায়, সমর্থন জানায়। কখনও খোলাখুলি

কখনও গোপনে ওরা ওদের মনের কথা আমাকে জানিয়ে দেয়। আমরা যেরকমের মানুষ, তারই জন্যে ওরা আমাদের শ্রদ্ধা করে, আমাদের সাহসকে বলিহারি দেয়, আমাদের আশীর্বাদ করে যেন আমরা জয়ী হই।

নিউইয়র্ক শহরের টেম্ব স্ট্রীটে মেয়ে বন্দীদের সঙ্গে থাকার সময় তোমারও নিশ্চয় এই রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মনে রেখো তারা তো তবু আমাদের মামলার আসল ঘটনাগুলো এখনও জানবার সুযোগ পায়নি। জানবার আগেই এই, তাহলেই বুঝে দেখ যখন আমাদের সম্পূর্ণ নির্দোষিতার খবরগুলো প্রকাশ পাবে, যখন রাজ-নৈতিক কারসাজি ফাঁস হয়ে যাবে—তখন আরও কত সমর্থন আমরা পাবো। যখন আমাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ নিঃসন্দেহ হবে, যখন তারা নিজেদের মনের ভাবনাকে কাজের মধ্যে রূপ দেবে, তখন আমাদের চূড়ান্ত জয়ের পথে কোন বাধাই আর থাকবে না।

ওরা আমাদের জেলখানায় বন্দী করেছে কিন্তু যতদিন আমাদের দেহে প্রাণ আছে ততদিন ওরা কিছুতেই আমাদের হৃদয়গুলোকে শেকলে বাঁধতে পারবে না। বন্দী হয়েও আমরা আগের মতই শান্তি, স্বাধীনতা আর প্রকৃত ন্যায়ের জন্যেই লড়াই চালিয়ে যাবো।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। আমার দিন কেমন করে কাটে। (এলীনর রুজভেল্ট-এরই মত, তফাৎ যা, খুব সামান্যই)। সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশে ঠেলাগাড়িতে করে প্রাতরাশ নিয়ে আসে। দশটায় দিয়ে যায় 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'। এগারোটায় দুপুরের খাওয়া। ভরপেট না খেলেও আমি এমনভাবে খাই যাতে শরীরটা বজায় থাকে। এই সূত্রে বলে রাখি, তোমার স্বামীটি হয়েছেন আজকাল সিগারেটের যম। ভাবছ কি, সিগারেট উড়ছে দিনে এক প্যাকেটেরও বেশি। আজকাল হাতের এমন সাংঘাতিক টিপ হয়েছে যে, সিগারেটের শেষটুকু পায়খানার টুক্‌রির মধ্যে নিখুঁতভাবে ছুঁড়ে ফেলতে পারি। দুপুরের খাওয়ার পর ঘণ্টা দুই গড়িয়ে নিই। এক ঘণ্টা পড়ি! তারপর

পায়চারি করি। ভাবটা এমন যেন চৌকি দিচ্ছি। বিকেল চারটেয় শেষ খাওয়া। তারপর আরও এক ঘণ্টা বই পড়া।

জেলের ওয়ার্ডেন একজন বিশ্বস্ত কয়েদীকে অনুমতি দিয়েছে আমার ঘরে সে আসতে পারে। আমার সঙ্গে কথা বলতে আর তাস-দাবা খেলতে পারে। লোকটা শীগগিরই খালাস পাবে। সাড়ে ছ-টা থেকে সাড়ে আটটা—এই সময়টুকু ওর সঙ্গে কাটাতে পারি। রাত ন-টা থেকে সুরু করে ঘণ্টাখানেক ধরে পায়চারি করি আর গান গাই। বেশির ভাগই গাই লোক-সঙ্গীত, মজুরদের গান, জনগীতি, অপেরা আর সিম্ফনির সুপরিচিত সুর আর বাছা বাছা অংশ! গাই 'পিট্ বল সোল্জার্স', 'কেভিন্ ব্যারি,' 'ইউনাইটেড নেশনস্', 'নাইন্থ কোরাল সিম্ফনি' এবং ছোটদের যত রেকর্ড আমার মনে আছে। বলতে বাধা নেই—যখন গান গাই, চাঙ্গা হয়ে উঠি, মনে জোর পাই।

ঘুম না আসা পর্যন্ত বাকি সন্ধ্যেটা পড়ে কাটিয়ে দিই। এখন নাথান অজুবেল-এর 'ইহুদি লোক সাহিত্যের সংকলন' পড়ছি। এই সঙ্গে বলে রাখা ভাল, রাত্তিরে আমাকে আরও একটা ব্যাপারে মন দিতে হয়। রোজ রাত্তিরে বেরোতে হয় শিকারে। ঐ সময় আমি আরশোলাদের মারি।

কাল বিকেলে ম্যানি আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিল যে চিঠিটা তুমি ওকে লিখেছো। প্রিয়তমা, তুমি আশ্চর্য মেয়ে—তোমাকে ভালবাসি। ছেলেদের জন্যে আমিও চিন্তিত; ওদের দেখা করতে আসার ব্যাপারে আমারও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। যখন ওরা আসবে তখন আমরা দুজনেই নিশ্চয় এমন ভাবে ব্যবহার করব যাতে মনের দিক থেকে ওদের কোন রকম হানি না হয়।

জানো এথেল, ম্যানির মধ্যে এমন কিছু আছে যার টানে আমি বাঁধা পড়ে গিয়েছি। অমন মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। কোন রকম বাইরের চাল নেই। যেমন প্রখর বুদ্ধি, তেমনি তার গভীর চিন্তাশীলতা। ইহুদিদের মধ্যে একটা কথা আছে—'ও আমাকে দেয়

যেমন আনন্দ, তেমনি গরিমা'। ওর সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা হুবহু তাই। আর আলেকজাণ্ডার ব্লকের* কথাই ধরো—ওঁকে তো আমি বাপের আসনে বসিয়েছি।

আজ রাত্রে অতিক্রম-উৎসবের† সময় আমাদের দেশের মানুষের পুরুষানুক্রমে গাওয়া বন্ধনমুক্তির সাবেকী গান যখন আমি গাইব—প্রিয়তমা আমার, তোমার কথা ভাবব। মৃত্যুর হাত থেকে, কারাযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ভাবব। ভাবব এর চেয়ে সার্থক, এর চেয়ে সুন্দর কোন জীবনের কথা।

তুমি আপন স্বরূপে ফুটে ওঠো। তোমার সেই স্বভাব আমি ভালবাসি।

জুলি

প্রিয়তমা আমার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫১

আজ রাত্তিরে লাউডস্পীকারে বব হোপের গান দিয়েছে। মন স্থির করে চিঠি লেখা খুবই মুস্কিল। তোমার সম্পর্কে পঞ্চমুখে প্রশংসা শুনছি। লেনাকে§ তুমি যে চিঠি দুটো লিখেছো পড়লাম। ম্যানির কাছ থেকে গতবারে তোমার সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনলাম। শুনে-টুনে মনে হচ্ছে আবার তুমি সেই পুরনো ধাত ফিরে পেয়েছ,—তোমার স্বাভাবিক সেই ফূর্তি আর মনের সাহস। নিজেকে তুমি নিয়মের শাসনে বাঁধতে পেরেছ।

এথেল, তোমাকে একটু হিংসে না করে পারছিনে। সবাইকে

*আলেকজাণ্ডার ব্লক—ইমানুয়েল ব্লক-এর বাবা। তিনি ছিলেন রোজেনবার্গদের পক্ষের অন্যতম উকিল।

†ইহুদিদের একটি বিশেষ পার্বণ।

§জুলিয়াসের বোন।

তুমি সাহস দিচ্ছ। আমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে তুমি হলে উৎসাহের উৎস। আমিও যদি তোমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, তোমার কাছ থেকে যদি সেই রকম একটু সান্ত্বনা পেতাম—যা শুধু আমিই পেতে পারি। কী যে ইচ্ছে করে! তোমার কাছ থেকে সামান্য একটু উত্তাপ, এতটুকু ভালবাসা। নিজেকে এত বঞ্চিত বলে মনে হয়।

কিন্তু ওসব কথা থাক। আমরা হলাম খাঁচার বন্দী। শারীরিক চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে পুরোপুরি কলের তৈরি মানুষের মতই আমাদের টিঁকে থাকতে হবে। আধুনিক দণ্ডবিজ্ঞান নাকি মানুষকে টেনে তোলার কথা, গড়ে তোলার কথা বলে। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বর্তমান দণ্ডবিজ্ঞানের কুফল সম্বন্ধে আমি আস্ত একটা বই লিখে ফেলতে পারি—সেইসঙ্গে কিভাবে একে সংশোধন করা যায়, তা নিয়েও আরেক খণ্ড বই হতে পারে।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল,

জেলখানার আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে জেলখানার ভাষায় বলে, 'যুৎ করে নিয়েছ'। আমার সঙ্গে যে লোকটা দাবা খেলে, তাকে আমি তোমার চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছি! শুনে সে বলল, 'দুর্দান্ত চিঠি। তোমার চেয়ে দেখছি তোমার বউ দড়।'

গত সোমবার শেষ পর্যন্ত আমাকে ওরা বাইরের খোলা হাওয়ায় আধ ঘণ্টার জন্যে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছিল। সঙ্গে একজন সেপাই ছাড়া কেউ ছিল না। তাহলেও প্রত্যেকটা মুহূর্ত এত ভাল লেগেছে! যাতে নিয়মিতভাবে এইরকম বেড়াবার ছুটি পাই তার চেষ্টায় আছি।

বেঞ্জামিন ফ্যারিংটনের* লেখা বই 'প্রাচীন দুনিয়ায় বিজ্ঞান ও রাজনীতি' পড়ছি। লেখক রীতিমত তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন— কিভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে জনসাধারণের ওপর চাপানো কুসংস্কার, বিশেষ একটা সমাজকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে এবং নিজেদের শ্রেণীগত সুযোগসুবিধা বজায় রাখার জন্যে রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী এবং গীর্জার মোহন্তরা কিভাবে সেই কুসংস্কার জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে রেখেছে! জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের তত্ত্ব পৌঁছে দেওয়া ছিল সব চেয়ে বড় অপরাধ, সব চেয়ে বড় অধর্ম। আজও সে কথা খাটে—যেমন আমাদের নিজেদের বেলায়। পারমাণবিক গোপনতার গল্প বানিয়ে সরকার জনসাধারণের চোখে ধূলো দিতে চাইছে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

আমরা দুজন দুজায়গায়। পরস্পরের কাছে পরস্পরের এই অভাব অন্য কিছুতেই মিটতে পারে না। সবচেয়ে বিপদের কথা হল এই যে, আমাদের মামলাটাকে এমনভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে যাতে স্পষ্টবাদী প্রগতিপন্থীরা মাথা তুলতে না পারে, যাতে পারমাণবিক যুদ্ধাভিযানের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দ না করতে পারে। শান্তির এই সর্বব্যাপী আন্দোলনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে আমাদের প্রত্যেকের লড়াই। আমাদের কাছে তা স্পষ্ট। যে যেখানেই থাক যেমন করে

*আরও হাজার হাজার লোকের মত বেঞ্জামিন ফ্যারিংটন পরে রোজেনবার্গদের মুক্তি চেয়ে প্রেসিডেণ্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের সোয়ান্‌সীতে তাঁর বাড়ি। সেখান থেকে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন যে, রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা 'অবাঞ্ছিত ঘটনা' হবে এবং মার্কিন ন্যায়বিচার সম্পর্কে আমাদের ধারণা খারাপ হবে।

হোক সকলের চোখ আজ খুলে দেওয়া দরকার। বুক উজাড় করা ভালবাসা।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ২রা মে, ১৯৫১

ওয়েস্ট স্ট্রীটে আমার জীবনের তিনটি বড় উৎস : প্রথমত, তোমার চিঠি, ম্যানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আর বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। তোমার চিঠিগুলো আমার সত্তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

আমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছে। অধীর হয়ে তারা দেখা করবার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছে। বন্দীর সঙ্গে দেখা করা—এটা একটা সাধারণ ভদ্রতাসঙ্গত মানবিক অধিকার। অথচ এই তুচ্ছ অধিকারটুকুর জন্যেও আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। আমার সমস্ত ভালবাসা তোমারই।

জুলি

এথেল, ৯ই মে, ১৯৫১

উইলি ম্যাক্‌গী*কে ফাঁসী দেওয়ার খবর পড়ে স্তম্ভিত হলাম। এত খারাপ লাগছে কী বলব। দুচোখ আমার জলে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে, ফেডারেল কোর্টগুলো দক্ষিণী বুরবন্‌দের মত মধ্যযুগীয় ধারায় চলেছে। আইনের মারপ্যাঁচে নিগ্রোদের তারা তেমনি নৃশংসভাবে খুন করে চলেছে। আর এবার তারা রাজনৈতিক

*উইলি ম্যাক্‌গী, মিসিসিপি প্রদেশে বলাৎকারের অভিযোগে এই নিগ্রোজাতির মানুষটিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের ৮ই মে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

বন্দীদের বেলাতেও সেই একই প্রথা চালু করতে চাইছে—যেমন আমাদের বেলায়! কিছুতেই মেনে নেওয়া নয়, জবাব দিতে হবে। যুক্তি আর তথ্য দিয়ে জবাব দিতে হবে।

আমি জানি, ক্রমেই বেশি বেশি লোক আমাদের সংগ্রামের মর্ম গ্রহণ করতে পারবে। আর সেই ন্যায়ের সংগ্রামে তারা আমাদের কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াবে।

তোমার জন্যে মন কেমন করে। এথেল, তোমাকে ভালবাসি।

জুলি

প্রিয়তম আমার, ১৯শে মে, ১৯৫১

তোমাকে ছেড়ে আসতে কী খারাপ যে লাগছিল। নিজের সেলের দিকে ফিরতে আমার পা উঠছিল না। ক্ষমাহীন নিষ্করুণ সেলটা ভ্রূকুটিভরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল আমার জন্যে। তার ভাবটা এমন, যেন তার অজান্তে ঘরের মানুষ বাইরে বেরিয়েছিল। আসলে তার বেজায় গর্ব—কেননা সে ভাল করেই জানে লোকটাকে ফিরে আসতেই হবে।

যাকে চিরদিন ভালবেসেছিল, অসম্ভব চেনা হয়েও যে অসম্ভব অচেনা, যার পাশে শুয়ে আমার রাতের পর রাত কেটেছে—তাকে দেখেছি আমি তিন দিন আগে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় মাত্র তিনটে দিন। তবু আমি নিশ্চয় জানি, লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে গেছে। যতই হোক, তোমাকে আমি দেখেছিলাম স্বপ্নে। আমার চোখে ভাসছে তোমার ঝুলে-পড়া ফ্যাকাশে মুখ, আকুতিভরা চাহনি, শীর্ণ সুকুমার তোমার দেহ, যন্ত্রণার সুস্পষ্ট ছাপ। প্রিয়তম স্বামী আমার, স্বর্গ ছেড়ে এ কোন নরকে তোমাকে আজ বরণ করতে হচ্ছে। এখানে এই সিং সিং-এ একঘেয়ে বিষণ্ণ দিন, নিরানন্দ রাত্রি। এখানে অন্তহীন কামনার পায়ে পায়ে ঘোরে অন্তহীন বঞ্চনা। তবুও

এখানকার এই ইঁট, কংক্রিট, আর ইস্পাত চেপে ধরে আমাদের ভালবাসা দৃঢ়মূল হবে, নবীন ফুল ফোটাবে। আর আমরা এখানে গর্জে উঠে বলব—না, বাধা মানি না। আমরা লড়ব।....

তোমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত অনুভূতিকে সেদিন ভাষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমিও পারিনি। তুমি কি মনে করেছিলে এই অবস্থার মধ্যে পরস্পরের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করা এতই সহজ? তবু আমি স্বীকার করছি, আমার আশা ছিল মনটা অনেকখানি হাল্কা হবে। যখন তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন কেমন যেন নিজেকে বঞ্চিত মনে হল। যা ভেবেছিলাম ঘটল তার বিপরীত। কাজেই আমি তোমারই মত আশাভঙ্গের বেদনায় একেবারে মুষড়ে পড়লাম। সে কথা যে লিখে জানাবো, তোমার চিঠি পাবার আগে পর্যন্ত এমন কি কাগজকলম নিয়ে বসবার ক্ষমতাটুকুও ছিল না।

তোমার নিঃসঙ্গ স্ত্রী—এথেল

প্রিয়তম জুলি, ২০শে মে, ১৯৫১

সারা বিকেল থেকে থেকে বৃষ্টি। এত সুন্দর লাগছিল কী বলব। আমার চোখের আড়ালে কোথাও ফুল ফুটেছে। ভুর ভুর করছিল তার গন্ধ। উঠোনে ঢুকবার মুখে চেয়ার পেতে আমি সারাক্ষণ বসে রুটির টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিয়েছি মাটিতে। এক ঝাঁক চড়ুই পাখি নিরাসক্ত ভাবে তা থেকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি যেই ধরে যাচ্ছে, অমনি আমি ব্যস্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিচ্ছিলাম কোথায় কোথায় কংক্রিটের বুক চিরে সবুজ চারা মাথা তুলেছে।

ইঁটের দেয়াল আর পাথর-বাঁধানো রাস্তার মাঝখানে লতিয়ে উঠেছে ফুটফুটে সবুজ পার্সলি গাছ। অন্য আরেকটি দেয়ালে বুনো ভায়োলেট গাছের পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ফুলের দুটো কুঁড়ি।

কংক্রিটের গায়ে যেখানটা ফাঁক হয়ে আছে, সেখানে নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসি। উঠোনের ঠাণ্ডা সাঁৎসেঁতে যে জায়গাটায় ন-মাসে ছ-মাসে রোদ্দুর আসে, সেখানে মখমলের মত ছ্যাৎলা জমেছে। ছ্যাৎলা সরিয়ে তার নিচেকার মাটি দিয়ে অনেক কষ্টে ভরাট করা দেয়ালের সেই ফাটলটায় আমি আপেলের একটা বীজ পুঁতেছিলাম। আজ সে বীরদর্পে মাথা তুলেছে। আমার ভালবাসা নিও।

তোমারই—এথেল

প্রিয়তমা এথেল, ২১শে মে, ১৯৫১

তোমার চিঠিতে আমাদের দারুণ আশাভঙ্গ আর সেইসঙ্গে আমাদের পারস্পরিক ভাব আর ভালবাসা অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাইরের প্রাণচঞ্চল পৃথিবীর সঙ্গে আমরা শক্ত গ্রন্থিতে বাঁধা। যে দুঃসহ নিঃসঙ্গতা আমাদের ঘিরে আছে, তা যেন সেই গ্রন্থি খুলতে না পারে। খাঁচায় বন্দী থেকে আমরা শুধু প্রতিবাদ করে জানাতে পারি—আমরা নির্দোষ। আমরা শুধু শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারি। আমেরিকার মানুষ আজ হত্যাকারী জল্লাদের হাত চেপে ধরুক। এটা তাদের কাজ। প্রিয়তমা আমার, আমার কাছে এটাই সব চেয়ে খারাপ লাগে যে, তোমাকেও আজ এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে! শুধু তোমার অবিচলিত প্রেমই আমাকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছে।

বাইরে থেকে আমাকে যেমনই দেখাক না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। শরীরে আমি বেশ বল পাচ্ছি। নিজের শরীর সম্পর্কে আমি খুব হুঁশিয়ার। রবিবার বিকেলে আমার কানে এল, তুমি পাহারার সেপাইকে বলছিলে ওবেলা খাবার সময় তোমার খানিকটা সর-লাগানো পনীর চাই। তোমার গলা শুনে আমার সে কী রোমাঞ্চ! উঠোনের সিঁড়ির ওপর তখন আমি বসে ছিলাম। আমার মনে হয়, তোমাদের দালানের দরজাটা সামান্য ফাঁক ছিল।

প্রিয়তমা, আমরা তো আইনসিদ্ধ দম্পতি। এখানে আমাদের সংসার পাততে দেওয়া উচিত। সত্যি বলছি, সম্পূর্ণ মুক্তি ছাড়া কিছুতেই আমি খুশি হবো না। আবার দেখা হবে। আমার চুম্বন নাও।

তোমারই— জুলি

প্রিয়তমা আমার, ২৪শে মে, ১৯৫১

এখানকার এই একঘেয়ে বাঁধাধরা জীবনের মধ্যে আস্তে আস্তে আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করছি। আমাদের জীবনের বিগত ঘটনাবলী মনে মনে খতিয়ে দেখছি। তাই বলে আমি অতীতের মধ্যে পড়ে থাকতে চাই না। কিন্তু আমার আরও কিছু চাই যা আমাকে এই প্রেতায়িত জীবনে বাঁচবার শক্তি দেবে।

আমার বাবা-মা ছিলেন গোঁড়া ধরনের সেকেলে মানুষ। আমি বড় হয়েছি লোয়ার ইস্ট সাইড-এর এঁদো বস্তিতে। ছোটবেলার সে সব কথা ভুলবার নয়। আমরা ছিলাম পাঁচ ভাইবোন। আমাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বাবা আর মাকে কী নাকের জলে চোখের জলেই না হতে হত। বাবা কাজ করতেন পোশাক-পরিচ্ছদের কারখানায়। সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনির বিরুদ্ধে একবার একটা বড় ধর্মঘট হয়। বাবা ছিলেন একে তাঁর সহকর্মী শ্রমিকদের মুখপাত্র, তায় ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী—কাজেই তাঁকে কর্তৃপক্ষের বিষনজরে পড়তে হল। ফলে কী টানাটানির মধ্যে যে তাঁকে সংসার চালাতে হত।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, ইঁদুর আর পোকামাকড়ের সঙ্গে আমাদের সেই অহোরাত্র লড়াই। হিব্রু ইস্কুল থেকে চলে যাবার সময় আমি বিদায়কালীন বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ভাল ছাত্র ছিলাম আমি। তার চেয়েও বড় কথা, আমি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, মিশরে দাস-প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের জাতির মুক্তি-সংগ্রাম সহজেই নিজের করে নিতে

পেরেছিলাম! আমেরিকার ইতিহাসেও আমি তেমনি মহৎ ঐতিহ্য খুঁজে পেয়েছিলাম। এইভাবে মানুষ হয়ে আমেরিকাবাসী ইহুদি হিসেবে আমি যে তার ঐতিহ্যের পথ ধরেই চলব, সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্যই যে চেষ্টা করব—তা তো নিতান্ত স্বাভাবিক।

আমি তোমার মধ্যে খুঁজে পেলাম এমন এক মনের মতন মানুষ, যাকে অসম্ভব ভাল লাগে, আমি যেন তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। পরস্পরকে কাছে পেয়ে আমাদের লক্ষ্য স্পষ্টতর হল, জীবন পূর্ণতর হয়ে উঠল।

আমার হৃদয়-উজাড়-করা ভালবাসা নাও। কাল তো দেখাই হবে।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ২৫শে মে, ১৯৫১

আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কী ভাল যে লাগল। মুখ বুঁজে বসে থেকে পর্দার ভেতর দিয়ে আমি তোমার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে ছিলাম আর সারাক্ষণ আমার ইচ্ছে করছিল তোমাকে আমি দুটি বাহু দিয়ে জড়াই, চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করি, অনির্বচনীয়ভাবে তোমাকে আমি জানাই আমার অসহ্য ভালবাসার কথা। প্রিয়তমা, আশা করি আমাদের ওরা নিয়মিত এইভাবে দেখা করতে দেবে। নানা রকমের বাধাবিঘ্ন আছে সত্যি, তবু তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার মন অনেকটা হাল্কা হয়েছে। এ পর্ব শীগ্‌গিরই চুকে যাবে। আমরা আবার আমাদের আনন্দোজ্জ্বল সাংসারিক জীবনে ফিরে যেতে পারব। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন 'সাহস, বিশ্বাস ও লক্ষ্য'—এই আদর্শে এসো আমরা নিজেদের জীবন ঢেলে দিই।

২৭শে মে, ১৯৫১

অবশেষে কাল ওয়েস্ট স্ট্রীট থেকে আমার চিঠি ও ছবির প্যাকেটটা এসে পৌঁচেছে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা একবার সব দেখে নিলাম।

কিছুক্ষণ পুরনো দিনের কথা খালি মনে হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি একটা কার্ডবোর্ড যোগাড় করে ছেলেদের ছ-খানা ছবি বাঁধিয়ে ফেললাম। পাহারাদার সেপাইদের একজন পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটার পর আড়া-আড়িভাবে তার প্রত্যেক কোণে গেঁথে দেওয়া হল ছবিগুলো। টেবিলের ওপর বই এবং টুকিটাকি জিনিস ছিল। সেসব ডিঙিয়ে আমার দিকে চেয়ে ছেলে দুটো হাসছিল। ওদের কপাল বড় খারাপ। যেভাবে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তাতে ওরা থই পাচ্ছে না। ওদের একটু ভালবাসবে, রাস্তা দেখাবে—কিন্তু মা বাবা কেউই কাছে নেই। প্রিয়তমা আমার, আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে যাতে মা আর বাবা হিসেবে আমরা স্বস্থানে ফিরে যেতে পারি।

তোমার আর আমার মধ্যে বিচ্ছেদের পাঁচিল তুলেছে একশো ফুট বিস্তীর্ণ বস্তুপুঞ্জ! তাকে অগ্রাহ্য করে আমার যা আছে তুমি নাও। তোমার একান্ত আপনজনের ভালবাসা।

জুলি

প্রিয়তম জুলি, ২৭শে মে, ১৯৫১

খুব ভাল লাগল তোমার চিঠিটা। যখন তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিলে, আমাদের পরিচয়ের প্রথম যুগের সেই বিদ্রোহ আর সংগ্রাম, সেই হাসি আনন্দ আর ভাল লাগার দিনগুলো কি আমরা ভুলতে পারি? এই জটিল হৃদয়হীন সমাজে আপাতদৃষ্টিতে যত কিছু দুর্বোধ্য হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছিল, আমরা দুজনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছিলাম তার উত্তর। এতদিনের এত পরিবর্তনেও সে উত্তরগুলো আজও অম্লান। একদিন যেমন আমরা করেছিলাম তেমনি আজও যারা নির্ভয়ে চোখ খুলে তাকাবে, কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখবে—তারা আজও সেই একই উত্তর পাবে। আমরা সেই উত্তর উঁচু গলায় হেঁকে বলতে ভয় পাইনি বলেই আজ আমরা সিং সিং-এর কারাপ্রাচীরে বন্দী।

তবু হেঁয়ালির সেই উত্তরের কথা মনে রেখে আমেরিকান গণতন্ত্র, ন্যায় আর ভ্রাতৃত্বের কথা ভেবে, শান্তির জন্যে, রুটি আর গোলাপের জন্যে, শিশুর মুখের হাসির কথা মনে করে আমরা এখানে গর্বে মাথা উঁচু করে বসে থাকব। আমরা জানি ভগবানের কাছে, মানুষের কাছে আমরা নির্দোষ। তবু আমরা দিন গুণব যতদিন না সত্যের শঙ্খধ্বনি সমস্ত সৎ মানুষকে ডাক দেয়।

একজন বহুদর্শী মানুষ ছিলেন, নামটা ভুলে গিয়েছি। তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন 'মানব-চরিত্রের বিনাশ নেই'। প্রিয় আমার, আমরা প্রমাণ করে দেব তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। হয়ত তখন অন্য সব মানুষেরাও নিজের নিজের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং তখন হয়ত একাধারে আমাদের সাহায্য করতে আর নিজেদের রক্ষা করতে তারা হাজারে হাজারে এগিয়ে আসবে।

তোমারই—এথেল

প্রিয়তম আমার, ২৯শে মে, ১৯৫১

তোমার জন্মদিনে মাইকেলের লেখা পদ্যটা তোমার পরের চিঠিতে পাঠাতে যেন ভুলো না, কেমন? এর আগে কিন্তু আনন্দের এমন শিহরণ অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না।

ইহুদি প্রার্থনাসভায় তোমার কণ্ঠস্বর শুনে কত যে সান্ত্বনা পেলাম। ধর্মোপদেশের পর সাধারণ আলোচনার সময় তোমার বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক হয়েছিল। একটা কথা জিগ্যেস করে নিই, তোমার কি মনে হয়নি সেদিন আমি ঠিক বলেছিলাম? আমার ধারণায় তরুণ ধর্মযাজকটি চমৎকার মানুষ, বুদ্ধিমান এবং আন্তরিক। ওঁর সম্বন্ধে তোমাদের ওখানে লোকজনেরা কিছু বলল? আমার ব্যাপারে কিন্তু বেশ মনে হল ওঁর সহানুভূতি আর সহৃদয়তার ভাব আছে। আজ আমি অনুভব করলাম সেই সৌহার্দ্য থেকে তুমিও

বঞ্চিত নও। আমার মনে হচ্ছে, প্রিয়তম আমার, তুমি নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠাবান হয়ে উঠেছ এবং বর্তমানে তুমি হয়ে দাঁড়িয়েছ 'ফাঁসীর সেল'—সমাজের সত্যিকার খুঁটি।

খবরের কাগজের সেই প্রবন্ধগুলোর কথা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না,—তাতে বক্রোক্তি করে বলা হয়েছে যে আমরা নাকি চাই না আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা আমাদের সঙ্গে দেখা করুক, নিজেরা দেখা করার অনুরোধ জানাতেও নাকি আমরা তেমন ইচ্ছুক নই! যারা এসব লেখে, তাদের সম্বন্ধে ঘৃণায় আর রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

প্রিয় আমার, তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমি কষ্ট পাই। আমার প্রাণভরা ভালবাসা নাও।

এথেল

প্রিয়তমা বধূ আমার, ৩১শে মে, ১৯৫১

মাইকেল আমাকে জন্মদিনের যে কার্ড পাঠিয়েছে, তাতে আছে হ্রদের জলে ভাসা পাল-তোলা নৌকোর ছবি। ছাপা পদ্যের নিচে মাইকেলের নিজের হাতে লেখা দুটি ছত্র :

'বইছে হাওয়া মাতোয়ারা
ছুটছে কথার ফোয়ারা।'—মাইকেল।

প্রিয়তমা, এই আমাদের আট বছরের মাণিক। কেন্দ্রীয় বন্দীনিবাসে থাকবার সময় আমাকে যে বইগুলো পাঠানো হয়েছিল কর্তৃপক্ষ সেগুলো আমাকে দেয়নি। চার্লস ও মেরী বেয়ার্ড-এর লেখা 'দি রাইজ অব অ্যামেরিকান সিভিলিজেশন' বইটা পেয়েছি—ম্যানিই সম্ভবত পাঠিয়েছে। এই সঙ্গে আরেকটি বইও এখন হাতে আছে—টমাস উল্ফ-এর 'ইউ ফাস্ট গো হোম এগেন'। পড়বার পক্ষে দুটো বই এখন যথেষ্ট।

ইহুদি প্রার্থনাসভাটা দিব্যি জমেছিল। প্রিয়তমা আমার, প্রার্থনায় তোমার অংশগ্রহণ সকলেরই অন্তর স্পর্শ করেছে। এখানে সবাই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। সবাই তোমাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। ওরা মনে করে, নিজেকে চালনা করার দক্ষতা তোমার আছে। এটা আমার কথা নয়; লোকে যা বলে আমি শুধু সেইটুকুই তোমাকে জানাচ্ছি।

লেনা আমাকে চিঠিতে লিখেছে—তোমার ইস্ত্রি করার পুরনো তক্তাটা ওরা সারিয়ে রেখেছে, আমার শার্ট আর মোজা ধুইয়ে রখেছে আর আমাদের জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে রেখেছে। আজ হোক কাল হোক আমরা ফিরব—সেই আশায় ওরা তৈরি হয়ে বসে আছে।

বন্ধ ঘরে তুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে, কাগজে দিনের পর দিন আমাদের সম্বন্ধে রটানো মিথ্যে খবর পড়ে, আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে অকালে প্রাণ হারাতে হবে জেনে—আমার শক্তি নিঃশেষিত হয়, বুক টান করে দাঁড়াবার মত মনের অবস্থা থাকে না। তবু যখন তোমাকে দেখি, তোমার কণ্ঠস্বর শুনি, তোমার কাছ থেকে অমন চিঠি পাই—তখন এসবই খুব সহজে স্বাভাবিকতার সঙ্গে আমি গ্রহণ করতে পারি।

যেদিকে ন্যায়, আমরা সেই দিকে। আমরা তাই ভীত নই। পথ দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। তবু এরই মধ্যে ফুটে উঠেছে জয়ের সমস্ত লক্ষণ। তোমাকে নিঃশেষে জানাই আমার ভালবাসা।

তোমারই—জুলি

প্রিয়তম, ৬ই জুন, ১৯৫১

শুক্রবার আমাদের দেখা হবে। কিন্তু নানা কারণে আমার আর তর সইছে না। আমার ভাই বার্নির কাছ থেকে আজ একটা চিঠি পেলাম। মাইকেল আর রবীর তুটো খুব সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে।

তোমাকে ছবি ছুটো দেখাবার জন্যে মরে যাচ্ছি। ওদের আশ্চর্য বাড়ন্ত গড়ন দেখলে সত্যি মন খারাপ হয়ে যায়—তবু তো বুঝি, আমাদের ছাড়াই ওরা বড় হচ্ছে। একটা ভাবনা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারি না—আর হয়ত কখনই ওদের কাছে আমরা ফিরে যাব না। মনে হলেই কি রকম যেন হয়ে যাই। রক্ত হিম হয়ে আসে।

ভয়ের কথা এই যে, চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠিক হাসিখুশি থাকতে পারছি না। ছেলেদের সম্পর্কে আমাদের ব্যবস্থাটা যদি নিখুঁতভাবে হয়ে যায়, হয়ত তাহলে মনে একটু শান্তি পাবো। আমার অতন্দ্র ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রিয়তমা আমার,
১২ই জুন, ১৯৫১

আজকের প্রার্থনাসভায় তোমার মধুর কণ্ঠস্বর আর বুদ্ধিদীপ্ত মঙ্গলাচরণ শুনলাম। তোমার পাঠানো চিরকুটটাও পেয়েছি। আমরা হলাম সোজা রাস্তার মানুষ। যা আমরা বিশ্বাস করি, সেইমত কাজই আমরা করে থাকি। অর্থাৎ, ইহুদি ধর্মযাজকের ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের আদর্শ হল : 'অন্যের কাছ থেকে যে রকম আচরণ তুমি আশা কর, অন্যের প্রতিও তুমি সেই রকম আচরণ করো'। অনেকে হয়ত এর নানারকম অর্থ করবে। আমার কাছে এটা 'শুষ্ক তত্ত্বের' ব্যাপার নয়, আমার কাছে এটা জীবন্ত কার্যকরী দর্শন। এই দর্শনকে কাজে লাগানো মানেই হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যি-কার ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা।

ইহুদিদের প্রার্থনাসভায় কত যে চিন্তার খোরাক মেলে, বিশেষত আমাদের মত বন্দী নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে তা যে কত মূল্যবান—দেখে অবাক লাগে। আমেরিকাবাসীর জীবনে এবং এ-যুগের গণতান্ত্রিক

আদর্শের পক্ষে প্রধান নির্ভর হল আলোচনা এবং মত প্রচার। আজকের এই ধর্মীয় সভাটি সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত* সম্পর্কে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে নিয়মতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং সেই সঙ্গে ধর্মগত স্বাধীনতাকেও দারুণভাবে আঘাত করা হয়েছে।

ছেলে দুটোর ছবি বার বার আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। পুত্রপরিবার আর স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে নিজেদের অবিচলিত রাখাই হল আমাদের এখনকার কর্তব্য।

যখন আমি শুতে যাই তুমি তখন নিঃসন্দেহে থাকো আমার বাহু-পাশে ; আমরা লোহার গরাদ আর দুঃস্বপ্নকে বাইরে বার করে দিয়ে খিল দিই! কিন্তু সকালের কাঁচা রোদ রুক্ষ হাতে ঠেলা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দেয় আমার সঙ্গে আমার প্রিয়তমার নিরুপায় বিচ্ছেদের কথা।

মনে সাহস রাখো! আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে আশ্চর্য ভবিষ্যৎ। ভালবাসা নিও।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ১৩ই জুন, ১৯৫১

তোমার মহৎ গুণাবলীর কথা যখন ভাবি, আমাকে মাতিয়ে তোলে আলোর এক স্নিগ্ধ আভা। ইচ্ছে করে গলা খুলে গান গাই, নতুন কিছু সৃষ্টি করি! আশাভঙ্গ আর বেদনা যতই দুঃসহ হবে, পরিণামে ততই মহানন্দময় হবে আমাদের পরস্পরকে ফিরে পাওয়া।

সার্কিট কোর্টে আমাদের আপীলের যে সংক্ষিপ্ত খসড়া দেখলাম, তাতে মনে নতুন বল পাচ্ছি।—এই নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় নিজেকে

*শ্রমিক-বিরোধী কালাকানুন 'স্মিথ অ্যাক্ট' অনুমোদন।

টিঁকিয়ে রেখে উপরন্তু যদি কেউ তার সময়টাকে এখানে কাজে লাগাতে পারে তাহলে বুঝতে হবে এ অবস্থায় সে যা করছে তা চূড়ান্ত। আমি যখন ছেলেদের ছবিগুলো দেখি, তখন বলি,—ওদের যখন বুঝবার বয়েস হবে, ওরা ওদের মা-বাবার জন্মে গর্ব বোধ করবে, মাথা উঁচু করে ওরা ঘুরে বেড়াবে।

আমাদের মনগুলো চাঙ্গা। আপীলে ফল হবে বলে আমরা যে আশা করছি, তার খুবই সঙ্গত কারণ আছে। আইনের তুলাদণ্ডে পক্ষপাতহীনভাবে যদি বিচার হয়, আমরা নিশ্চয়ই জিতব। আদরের বধূ আমার, আজ আমরা কষ্টে দিন কাটাচ্ছি; কিন্তু মুক্তহস্তে এর প্রতিদান পাবো।

একান্ত তোমারই—জুলি

প্রিয়তমা,

১৭ই জুন, ১৯৫১

শুক্রবার! দিনটা মনে থাকবে। তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখা, তন্ময় হয়ে শোনা তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার জ্ঞানবৃদ্ধ কথা। তোমার চোখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকা। সারাক্ষণ গভীর চিন্তায় তোমার সন্ধানী মনের স্বচ্ছন্দ বিহার, তোমার নির্ভুল বিশ্লেষণ। খুঁটিনাটির প্রতি প্রবল নিষ্ঠা। কখনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নয়। এ সমস্ত-কিছুর অন্তরালে ছিল অন্তহীন বেদনা আর জ্বালা—কে বলবে?

ছেলেদের সম্পর্কে ঠিক যে সময়টাতে আমার বোনটি তোমাকে সুখবর দিচ্ছিল, সেই সময় আমি তোমার পাশে থাকতে পারলে কী ভাল যে হত। তুমি আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলে—আমার কানে গানের মত তা ভেসে এল! আমরা আরও একটি বাঁক পার হয়ে এলাম। তোমার মনের যন্ত্রণা এবার নিশ্চয়ই কমবে। আমার মা তোমার সঙ্গে বার বার দেখা করতে চেয়েছেন। মা তোমাকে বলতে চান, ওঁর কাছে যতদিন আছে আমাদের ছেলেদের ভালবাসা, আদর-

যত্ন সহানুভূতির কোন অভাব হবে না। মা আশা করে আছেন আর সব সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন আমরা যেন শীগ্‌গির ফিরে যাই। মা তোমাকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

আজ পিতৃতিথি। আমি যে কার্ডগুলো পেয়েছি, বুধবার নিয়ে যাবো, তোমাকে দেখাব। আজ আমাদের বিয়ের দ্বাদশ বার্ষিকী। জুন মাসের সেই অতুলনীয় রবিবারটা আজও আমার চোখে ভাসছে। এমনকি আজকের এই নিষ্ঠুর বন্দীজীবন আর অমানুষিক দণ্ডের কথা ধরলেও বলা যায়, আমাদের জীবনটা সার্থক।

আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের এগিয়ে যাবার চাবিকাঠি—*প্রিয়তমা আমার, তোমার হাতে।* আজও তুমিই আমাদের আত্মরক্ষার দেয়াল। বধূ আমার, বন্ধু আমার, আমরা দুজনে একই যূপকাষ্ঠের বলি—আজ আমাদের এই দিনটিতে তুমি উজাড় করে নাও আমার ভালবাসা।

তোমারই—জুলি

প্রিয়তম আমার,   ১৮ই জুন, ১৯৫১

এ সপ্তাহের শেষে তোমাকে চিঠি লেখা চুলোয় যাক, বসে বসে আমার অবস্থাটা হয়েছে সখেদে চোখের জলে শূয়োরের গড়াগড়ি দেওয়ার মত। তোমার চিঠি পড়েছি আর কেবলি মনে হয়েছে আমাদের বিয়ের দ্বাদশ বার্ষিকীতে আমাদের এই বিচ্ছেদ পত্রাঘাতে ঘুচিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি লিখিনি।

বারো বছর ধরে আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি। আমাদের নীতি ছিল। আমরা দুহাতে গড়েছি, আমাদের জীবন সারগর্ভ। অথচ বিশ্বাসই হয় না, দীর্ঘ বারো বছর পর আমি কিনা সিং সিং-এর নির্জন কুঠুরীতে বসে অপেক্ষা করছি—কতক্ষণে আমাকে বিধিবলে হত্যা করা হবে। আনন্দোজ্জ্বল উৎসবে স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারত দুটি

এমন দিনে তীব্র জ্বালা দিয়ে আমি তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এও এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার, তোমাকেও কিনা আরেকটি কুঠুরিতে থেকে সেই একই সর্বনাশের অপেক্ষায় দিন গুণতে হচ্ছে। স্বামী হিসেবে, সন্তানের পিতা হিসেবে শুভকামনা পেতে হচ্ছে তোমাকে কিনা নরকতুল্য অন্ধকারে।

তোমার মধ্যে আছে দুর্দমনীয় তেজ। আমাকে তা নতুন করে সাহস, নতুন করে শক্তি দেয়।

আমারা সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমাকে আমি ভালবাসি। আম প্রাণপণে চাই তোমার যোগ্য হতে।

সমস্ত সময় ও চিরদিনের—এথেল

প্রিয়তম এথেল, ২০শে জুন, ১৯৫১

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছুবে, সরকারীভাবে বসন্ত তখন অতিক্রান্ত। বসন্তের আবির্ভাব শুধু যে কমবয়সী ছোকরাদের মনেই ভালবাসার রঙিন স্বপ্ন আনে, তা নয়। এই বিয়ে-করা বুড়োটার কথাই ধরো। তার অভিশপ্ত হৃদয়াবেগ খোঁচা খেয়ে জেগে উঠেছে। কত যে সুন্দর নিদাঘ আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। গ্রেনে ১৯৩৯-এর বসন্ত। সদ্য বিয়ে করে ছুটিতে বাইরে গিয়ে যে ছবিগুলো আমরা তুলেছিলাম মনে আছে, বহু দিক থেকে তখনকার চেয়েও তুমি এখন দেখতে অনেক বেশি সুন্দর হয়েছো। তোমাকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে। আগুনের যে স্ফুলিঙ্গ তোমার মধ্যে আছে, সাময়িকভাবে এখানকার ইঁট-পাথরে তুমি চাপা পড়ে থাকলেও—সে স্ফুলিঙ্গ কিছুতেই ঢাকা থাকবে না। প্রিয়তমা, আজ সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে নিজের মধ্যে দারুণ প্রেরণা পাচ্ছি। তোমার কাছে আমি কত যে ঋণী, ছেলেদের মানুষ করার ব্যাপারে যে বিবেচনা তুমি দেখিয়েছ—তার তুলনা হয় না।

একেক সময় আমি নিজের মধ্যে এমন শক্তি অনুভব করি যে, তখন মনে হয় আমাদের জীবনের ওপর চেপে বসা মুখোশ-পরা এই বিভীষিকাকে যেন আমি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু না,—নিজের সম্বন্ধে কোন মোহ আমি পোষণ করি না। সভ্য মানুষের জীবনযাত্রায় যে সৌন্দর্য থাকে, যে স্বাধীনতা থাকে—তা থেকে আমরা একেবারে বঞ্চিত। আমি জানি এখানে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের লোহার মত শক্ত হতে হবে। হাওয়ায় ছড়ি ঘোরানো, কথার তুবড়ি ছোটানো—এর কোনটাতেই আমাদের কাজ নেই। প্রকৃতির যেমন বজ্র—তেমনি পরাক্রান্ত শক্তি সত্যের ও ন্যায়ের। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে করে আনা হয়েছে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিপূর্ণ এই মামলা। আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ—আজ হোক কাল হোক এ সত্য সকলে জানবে। আমার ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তম, ২২শে জুন, ১৯৫১

সুপ্রভাত, বুধবার তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় মনটা কী খুশি যে হয়েছিল। শুধু খারাপ লাগে এই জন্যে যে তোমার হাত, তোমার মুখ স্পর্শ করতে পারি না—ঠায় বসে থেকে কথা বলতে হয়।

শুনে বেজায় খুশি হবে, তোমার মা বাড়ি বদলাতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে হয়ত তিনি নতুন বাসায় উঠে গেছেন। কাল বিছানাগুলো পাবার কথা ছিল। ওরা চটপট বাঁধাছাঁদার কাজ চালাচ্ছে। আমার কী ফুর্তি যে হচ্ছে—

আমাকে তুমি আদর করে বলো তোমার আত্মরক্ষার দেয়াল। কিন্তু ভয়ের কথা এই যে, আজকাল সেই দেয়াল বড় বেশি তোমার ওপর ভর করছে। ভেবো না। যতই হোক আমরা জয়ী হবো।

যতদিন না আমরা পরস্পরের কাছে, ছেলেদের কাছে ফিরে যেতে পারছি—ততদিন আমাদের কাজ হল দাঁতে দাঁত দিয়ে টিঁকে থাকা।

তোমার অনুরাগিনী স্ত্রী—এথেল

প্রিয়তমা, ২৪শে জুন, ১৯৫১

কেমন যেন আমার মনে হয় মাকে সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ছেলেরা নিজের বাড়িতে গিয়ে কেমন আছে জানবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করছে। ওদের মানুষ করবার ব্যাপারে এক্ষেত্রে আমাদেরও খানিকটা হাত থাকবে। আমি আশা করছি মাইকেলের সঙ্গে আমার নিয়মিত পত্রালাপের একটা ব্যবস্থা হবে! খুব পরোক্ষভাবে হলেও তাতে করে আমরা ওদের হাসি আনন্দে কিছুটা শরিক হতে পারব।

অতীতে যে কথা তুমি আমাকে বলেছ, সেই কথা তুমি বলে যাও তোমার পেন্সিলে, তোমার চোখে, তোমার হাসিতে, তোমার সংকল্পে। আমাদের এই যূথবদ্ধ দল জয়ী হবেই। আমার আকণ্ঠ তোমার প্রতি ভালবাসা। তাহলেও উপায় নেই ব'লেই, তোমাকে আজ আমার শুধু হৃদয়টাই নিবেদন করতে পারি।

জুলি

প্রিয়তম আমার, ৩০শে জুন, ১৯৫১

এখানকার অসহ্য একাকিত্ব আজ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। একেই তো দিন কাটতে চাইছে না, তার ওপর বৃষ্টি আর বিষাদে আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে সময়। তবুও যদি কেউ ভেবে থাকে আমি মুষড়ে পড়েছি, আমার বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে, আমি হেঁকে বলছি, যারা আমাকে এবং আমার বলতে যা কিছু ধ্বংস করতে

চাও, তারা জেনে রেখো—শেষ পর্যন্ত আমি মাথা উঁচু করে অদম্য সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। যারা প্রাচীনকালে রাস্তা দেখিয়েছিল, তাদের সেই একই ধাতু দিয়ে আমি গড়া। আমার ধমনীতে আজও বহমান ম্যাকাবীদের* সেই রক্ত।

এতক্ষণে একটু ভাল লাগছে। 'কিছুতেই ওরা পার পাবে না'।†

তোমার ছেলে মাইকেল আমাকে চিঠি লিখেছে। বুকে করে রাখার মত চিঠি লিখেছে, ও আর রবী কাল থেকে দিনের বেলার এক ক্যাম্পে যাবে। এথেল এবং দুজন বন্ধু বাড়িতে দেখা করতে এসেছিল —মাইকেল তার বর্ণনা দিয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ওদের অবস্থা ভালোর দিকে। কৃতজ্ঞতায় চোখে আমার জল আসতে চাইছে। সেই সঙ্গে ওদের দেখবার জন্যে মনটা এত চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, ইচ্ছে করছে চিৎকার করে কেঁদে উঠি। প্রিয়তম আমার, তোমাকে ভালবাসি।

চিরদিনই তোমার—এথেল

প্রিয়তমা এথেল ৪ঠা জুলাই, ১৯৫১

আজকের স্বাধীনতা-দিবসে ওসিনিং পরগণার সুস্বাদু আইসক্রীমে বলীয়ান হয়ে এই ছুটির দিনটা আমি মুক্তির উৎসব করে কাটাচ্ছি। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' থেকে এক কপি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমি কেটে রেখেছি। বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংবাদপত্র আর ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে যেসব কথা ঘোষণাপত্রে বলা আছে, আজকের অবস্থায় তা

*ম্যাকাবী—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে জেরুজালেমের এই বীর পরিবারটি সিরিয়ার রাজাদের বিরুদ্ধে ইহুদি জাতির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সার্থক সংগ্রাম করেছিলেন।

†নো পাসারান—স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোর সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে মাদ্রিদরক্ষী নাগরিকদের রণধ্বনি।

পড়লে আশ্চর্য লাগে। এই সব অধিকার অর্জনের জন্যে আমাদের দেশভক্তদের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছিল। কংগ্রেসই হোক আর কোর্টই হোক—কারো ক্ষমতা নেই দেশবাসীর অর্জিত সেই অধিকার কেড়ে নেবার !

একদল রাজনীতিক আমাদের মামলাটার সুযোগ নিয়ে উদারপন্থী আর প্রগতিশীল লোকজনদের ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা এই সাজানো মামলা ফাঁস করে দিচ্ছি। তাছাড়া আমরা একা নই। এ লড়াই হল আমাদের জীবনমরণের লড়াই। শুধু তাই নয়। সুবিচার আর চিন্তার স্বাধীনতার জন্যে যে সংগ্রাম—আমাদের এই লড়াই তারই অঙ্গ।

ছেলে দুটোর লাঞ্ছনার একশেষ। নৃশংসভাবে তাদের মনগুলোকে থেঁৎলে দেওয়া হচ্ছে। তাদের ওপর অন্যায়ভাবে জুলুম চলছে। ওরা আমাদের একান্তভাবে চাইছে! কিন্তু আমাদের আদর যত্নে, আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের ভালবাসায় কিছুদিনের মধ্যেই ওদের মানসিক কষ্ট অনেকটা দূর হবে। যাতে আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি না হয়, তার জন্যে আমাদের শক্ত হতে হবে—নিজেদের জন্যে যতটা নয়, তার চেয়েও বেশি দরকার ওদের জন্যে। বড্ড মন কেমন করে ওদের জন্যে। কী যে ভালবাসি ওদের !

শান্তির নাকি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। *খবরটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মত আমাদের ভাগ্যও এর ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে। প্রিয়তমা আমার, যা আমাদের এসো তার জন্যে আমরা আশায় বুক বেঁধে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ি। ভালবাসা জেনো।

তোমারই—জুলি

*কোরিয়ায় তখন শান্তি-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রিয়তম জুলি, ৫ই জুলাই, ১৯৫১

ছেলেদের সম্পর্কে তুমি যা লিখেছো, পড়ে খুব উৎসাহ পেলাম। লেনা ওদের সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে যে চিঠি দিয়েছিল, সেই চিঠি পড়েই আমি অতটা মুষড়ে পড়েছিলাম এবং ভয় পেয়েছিলাম। প্রিয় আমার কাল আমাদের দেখা হবার পর ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওদের জন্যে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি। যারা ওদের শৈশব কেড়ে নিতে চায়, তাদের কথা মনে করে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল।

সকাল সাড়ে ছ-টা, ৬ই এপ্রিল—সুপ্রভাত! সকাল সকাল উঠেছি যাতে চিঠিটা শেষ করে ডাকে দিতে পারি। ৪ঠা জুলাই উৎসবের দিনটা আমার কেমন কাটল বলি।—রাজ্যের আইসক্রীম এসে পড়ায় তার ধাক্কায় মনের গুমোট ভাব খানিকটা কেটে গিয়েছিল। কিন্তু থেকে থেকে কেবলই মনে পড়ছিল ছেলেদের কথা, কিরকম ভাবে আমরা আইসক্রীম নিয়ে হুটোপাটি করতাম। রবীকে লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গত 'চেরী-উনিলা'র কথা মনে পড়েছিল। খানিকক্ষণ পরে মন একটু হাল্কা হল। তারপর বসে বসে রেডিও এবং 'আমেরিকানদের গাথা' শোনবার পর আর একটুও বেদনা রইল না। ফ্রাঙ্ক সিনাট্রার রেকর্ড 'হাউস্ আই লিভ ইন' শুনে হঠাৎ আমার মধ্যে জেগে উঠল 'সাহস, বিশ্বাস আর লক্ষ্যে'র জোয়ার।

প্রিয় জুলি, তোমার প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস, অশেষ শ্রদ্ধা—তুমি তা ভালভাবেই জানো। আমার সামনে তুমি তুলে ধরো অনুকরণযোগ্য সুন্দর আদর্শ। আমাকে তুমি বুকের মধ্যে নাও, তোমার মহৎ হৃদয় আমার মধ্যে সংক্রামিত করো।

তোমার প্রেমমুগ্ধ—এথেল

*নিউ ইয়র্ক ডেইলি মিরর পত্রিকায় ওয়াল্টার উইনচেলের কলমে ১৯৫১ সালের ৪ঠা জুলাই নিম্নলিখিত খবরটি বেরোয় : 'বর্তমানে মৃত্যুপুরীতে বন্দী পারমানবিক গুপ্তচর জুলিয়াস রোজেনবার্গ

প্রিয়তমা এথেল,　　　　　　　　　　　　　　১২ই জুলাই, ১৯৫১

তোমার মনে আছে, ওয়াল্টার উইন্‌চেলের কলমে* প্রকাশিত সংবাদের ব্যাপারে ওয়ার্ডেনের কাছে আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। জবাবে তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের অফিসের পক্ষ থেকে কিংবা যতদূর জানি সেপাইদের মধ্যেও কারও পক্ষ থেকে এই খবর কোন সাংবাদিক-কে দেওয়া হয়নি এবং আপনি কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ উক্তি করেছিলেন বলে আমি জানতে পারিনি।'

জেলখানার যা আইনকানুন, তাতে এর বেশি কিছুকরার ক্ষমতা অবশ্য তাঁর নেই।

আমার বোন এথেল লিখেছে মঙ্গলবারে মাকে দেখতে গিয়েছিল। রবী ফুর্তিতে আছে। দিনের বেলার ক্যাম্পে মাইকেলের খুব ভাল লাগছে। মার ঘরের জানলা দিয়ে নদী দেখা যায়। রেলরাস্তাটা দেখা যায়। ভারি চমৎকার দেখতে। দৃশ্যটা স্বভাবতই রবীর ঠিক উপযুক্ত। সব সময় ও বসে বসে নৌকো আর ট্রেণের আনাগোনা দেখে।

ডন গ্রাণ্ডোস্‌-এর 'ইস্‌রাইলের জন্ম' বইটা শেষ করলাম। ইহুদি ধর্মযাজক বইটি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। বইটা সত্যিই পড়বার মত।

আমাদের শক্তির উৎস হল আমাদেরই মত মানুষেরা। আমাদের শক্তির উৎস হল আমাদের পরস্পরের প্রেম। সেই উৎস থেকেই আমরা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করব। চিরদিন তুমি আমার কাছে থাকো, হে অসমসাহসী নারী।

চিরকাল তোমার—জুলি

জেলের সেপাইদের বলেছে: 'যদি আর দু-তিন বছর টিঁকে থাকতে পারি, তাহলে সোভিয়েটের বৈমানিকরা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।'

প্রিয়তমা, ১৫ই জুলাই, ১৯৫১

এখানে আজ রবিবাসরীয় সন্ধ্যা। ফাঁসীর সেলগুলোতে গীতিমুখর রাত্রি। রেডিও বেজে চলেছে। ছবির বই আর খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেছে। বল খেলার পর রোজকার স্নানের পর্ব চুকিয়ে এখন আমি চিঠি লিখতে বসেছি আমার বউ আর ছেলেদের।

উলম্যান-এর 'দি হোয়াইট টাওয়ার' পড়লাম। এখন পড়ছি জেন ফাউলার-এর লেখা জন ব্যারিমোরের জীবনী 'গুডনাইট, স্যুইট প্রিন্স'। বইটা তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। অফুরন্ত সময় কি করে কাটাই—সেটাই একটা সমস্যা। এ হপ্তায় বার দুই দাবায় বসেছি।

কেমন যেন মনে হয়, সেই কোন অতীতে তোমায় দেখেছি। যেদিকেই চাই নতুন নতুন ঠেকে, মনে হয় যেন কত দূরের। আমাকে পেয়ে বসে দারুণ শূন্যতা। এ চিঠি যখন তুমি পাবে জেনো আমার প্রাণহীন জীবনযাত্রার একটা বছর পুরো হল—

যখন তোমার সঙ্গ পাই, যখন আমাকে লেখা তোমার চিঠিগুলো পড়ি, যখন বইপত্রের মধ্যে ডুবে থাকি—তখন মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিফলতা বোধ আর থাকে না। তখন মনে হয় আমি যেন আবার নতুন করে তোমার প্রেমে পড়েছি। ফল রমণীয় হবে এবং তা একান্ত আমার—সে কথা জানি বলেই ব্যাপারটায় মুগ্ধ, পুলকিত হই।

এথেল, বধূ আমার—আমরা চাই আমাদের দুঃখের দিন ঘুচুক, আমাদের নির্দোষিতা প্রমাণ হোক।

সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি তোমার—জুলি

প্রিয়তমা, ১৯শে জুলাই, ১৯৫১

রাত এখন সাড়ে আটটা। উল্‌ফ-এর 'লুক হোমওয়ার্ড, এঞ্জেল' পড়লাম সারা দিন ধরে। ভারি সুন্দর গদ্য। উঠোনে বল খেলছিলাম এমন সময় তোড়ে বৃষ্টি এল। লক্ষ্য করেছ, বৃষ্টির সময় কান পেতে

থাকতে আর বই পড়তে কী সুন্দর লাগে? আমি বসে বসে ভাবলাম, কী আশ্চর্য পৃথিবীতে আমরা বাস করি। ভাবলাম, মানুষের সৃজনী ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগালে মানুষ কত কিছু যে করতে পারত।

আজকের কাগজগুলোতে একটা খবর পড়ে থ' হয়ে গেলাম—আমাদের এদেশের সরকার স্পেনের সঙ্গে রফা করতে যাচ্ছে। ফ্যাশিস্ট ফ্রাঙ্কো 'গণতন্ত্র' রক্ষায় সহায় হবে।—আগাগোড়া যত সব বাছা বাছা প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক এবং ফ্যাশিস্ট ধরনের লোক-জনদের সঙ্গে এই রকমের ঢলাঢলি দেখে এদেশের অনেকেই অবাক হবেন। লঙ্কার হাল বড় খারাপ।

এখানে বসে বসে আমি ছেলে দুটোর মুখ দেখতে পাচ্ছি। ওরা হাসছে। এই নারকীয় উন্মত্ততা আর নৃশংসতার হাতে দুটি নিঃসহায় শিশু লাঞ্ছিত হচ্ছে—এর চেয়ে অন্যায় আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের ছেলে দুটোর গায়ে যাতে বরাবরের মত দাগ কেটে না বসে সেই চেষ্টাই আমরা করব।

এক বছরের ওপর আমরা পরস্পরকে ছেড়ে আছি। আমাদের সম্পর্কটা সব কিছু জুড়ে আছে বলেই আমি এই বিচ্ছেদে এবং এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনাতেও ভেঙে পড়িনি। যাতে রাজনৈতিক দণ্ড পুনর্বহাল না হয়—আমার ভরসা আছে আমাদের পক্ষের উকিলরা তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তাঁরা চেষ্টা করবেন যাতে আইনের মাপকাঠিতেই বিচার হয়। তুমিই আমার আশা—

চিরদিন তোমার গর্বে গর্বিত স্বামী—জুলি

শিশুকণ্ঠের কাকলি

প্রিয়তম,   ১৯শে জুলাই, ১৯৫১

কাল বড় খোকার চিঠি পেয়েছি। খুব বড়াই করে লিখেছে, ও এখন ‘খ’ শ্রেণীর সাঁতারু অর্থাৎ ‘উঁচুদরের’ সাঁতারু। বোঝা যায়, ও উন্নতি করছে।

ছেলেদের মানসিক ব্যাপারে আবার এক নতুন ঝঞ্ঝাট....এথেলের কাছে শুনলাম বাড়ির ঝি দিনের বেলা রবীর সঙ্গে সারাদিন ক্যাম্পে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু রবী তাতে একদম রাজি হয়নি, বরং শুনে খুব রাগারাগি করেছে।

আমি তোমাকে চাই, প্রিয়তম। অনেক চুমো, প্রিয় আমার।

এথেল

প্রিয়তম জুলি,   ২৫শে জুলাই, ১৯৫১

আসছে হপ্তায় ছেলেদের আসবার কথা। ওরা এলে এমন কতকগুলো সমস্যায় পড়তে হবে যা নিয়ে আগে থেকে আলোচনা হওয়া দরকার। সকালে এ সম্বন্ধে কথা বলার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আমাদের নজর থাকবে এইদিকে যে, সমস্ত প্রশ্নের চূড়ান্তভাবে উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং আমাদের অভিযানের এই তো শুরু—এর পরেও দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে যেতে হবে। এটা যদি আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি যে আমরা অযথা উতলা নই—তাহলে ওদের মনে কোন রকম খারাপ প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

অনেক ভেবে দেখেছি—ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তাটা এই রকমের হওয়া দরকার। স্বগতোক্তির ধরণে এখানে আমি লিখছি।

'জানছি ফাঁসী হবে, কাজেই মাঝে মাঝে ভাবনা তো হবারই কথা। কিন্তু ব্যাপারটাকে এই ভাবে দেখা যাক। আমরা জানি যে কোন মুহূর্তে গাড়ীচাপা পড়ে আমরা মরে যেতে পারি—কিন্তু তাই বলে গাড়ির ভয়ে সব সময় তো আমরা জড়োসড়ো থাকি না।'

'দেখ, আমরা আগেও যেমন ছিলাম এখনও তেমনিই আছি। তফাৎ শুধু এই যে, আমরা থাকি এক জায়গায় তোমরা থাকো আরেক জায়গায়। তোমাদের কাছে থাকতে না পেরে আমাদের খুব খারাপ লাগে। কিন্তু আমরা এও জানি, আমাদের কোন দোষ নেই। সেই সব লোক আমাদের নামে মিথ্যে কথা বলে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। সেই সব লোকদের সম্পর্কে তোমরা যেমন খুশি ভাবতে পারো—শুধু দেখো মনে মনে নিজেরাই না কষ্ট পাও, মন না খারাপ হয়।'—

ওদের সঙ্গে যখন কথা বলব, তখন নিশ্চয়ই ঠিক এই ভাষাতে বলব না।

আমি কী ভাবছি, সেটাই আমি তোমাকে যত কাঁচা ভাবেই হোক জানাতে চেয়েছি।

ভালবাসা নিও—এথেল

প্রিয়তমা আমার, ২৫শে জুলাই, ১৯৫১

দাবায় কিস্তি মাৎ করে যখন উঠলাম, তখন রাত নটা বেজে পনেরো। কম সময় লড়তে হয়নি। খেলা শেষ করে তাড়াতাড়িতে তোমাকে এই চিঠিটা লিখতে বসেছি!

সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। এক বছরের ওপর ছেলেদের সঙ্গে আমার দেখা নেই। ওদের আশায় আমি পথ চেয়ে বসে আছি।

এখনও পুরো এক সপ্তাহ বাকী! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত অস্থির হয়ে উঠছি। চিন্তায় যাতে ভেঙে না পড়ি, তার জন্যে অনেক কষ্টে মনটাকে বাগ মানাতে হবে।

সব প্রথম তুমিই ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ। আমি জানি, অক্লেশে সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুমি জয় করবে এবং আমার পথও পরিষ্কার করে রাখবে। বুঝলে, মনে মনে আমি একটা দারুণ মতলব ভেঁজে রেখেছি। ছেলেরা হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে। পাতার পর পাতা জুড়ে ট্রেণ, নৌকো আর বাসের ছবি নিয়ে যাবো— আমি জোর করে বলতে পারি ছবিগুলো মাইকেলের এবং বিশেষ করে রবীর খুব পছন্দ হবে। কী বলো?

প্রিয়তমা, পেন্সিলটা একজন চাইছে। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে দেখে আজ রাত্রে মনের সুখে তুমি ঘুমোতে পারো। আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি, আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ছেলেদের কাছে আবার যাবো। আমার সমস্ত হৃদয় তোমাকে দিলাম।

জুলি

প্রিয়তম, ২৯শে জুলাই, ১৯৫১

আড়ষ্টতা কাটিয়ে ছেলেরা যাতে সহজ হয়ে ওঠে তার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। তোমার সঙ্গেও যে ওদের দেখা হবে, সে কথা বলে আগে থেকে ওদের মন তৈরি করে রাখব। ততদিন মন থেকে দুর্ভাবনা খানিকটা তাড়াবার চেষ্টা করো। সত্যি বলছি, নিজের মনকে আমিও প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছি।

তুমি ভাবছ তোমার নৌকো আর ট্রেণের কথা শুনে হিংসেয় আমি মরে যাবো। কক্ষনো নয়। আমার কাছে আছে একটা লেফাফাভর্তি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ—বন্য পতঙ্গ-শিকারী তোমার অসম-সাহসী স্ত্রী খুব কষ্ট করে সংগ্রহ করেছে।

বিশেষ করে রবীর পক্ষে তোমার জিনিষটা খুবই মনের মত হবে। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের দেখে রবীর হয়ত একটু লজ্জা-লজ্জা করবে, একটু পর-পর ভাববে।

হ্যাঁ, একটা কথা যেন মনে থাকে। আমাদের মৃত্যুদণ্ডের ধরন সম্পর্কে মাইকেল যদি আমাকে প্রশ্ন করতে ভুলে যায়, তাহলে উত্তর দেবার কাজটা তোমার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। সে ক্ষেত্রে খুব সংক্ষেপে জবাব দিও। বলো ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসে মরতে কোন কষ্ট নেই—অবশ্যই তেমন কোন আশঙ্কা আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

বিশ্বাস করো, বাপ মা ঠিক যেমনিটি চায় ছেলেপুলেরা হয় হুবহু তাই।

প্রস্তাবিত ফাঁসীর ভাবনায় যদি আমরা ভীত না হই, তাহলে ছেলেরাও মনে বল পাবে। অবশ্য আমরা দুজনের কেউই ওদের সামনে এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব না। তাহলেও আমরা নিজেরা যদি ভয় না পাই ওরাও ভয় পাবে না। প্রিয়তম, বুকভরা ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রিয়তমা বধূ আমার, ২৯শে জুলাই, ১৯৫১

তোমার বলবার কথাগুলো এত সুন্দর এবং এত চমৎকার ভাষায় তুমি তা বলেছো যে, সে সম্বন্ধে বিখ্যাত ইহুদী প্রবচন উদ্ধৃত করে আমি বলতে পারি : 'তোমার মুখ থেকে বিধাতার কানে যায়।' ছেলেদের সঙ্গে দেখা দেওয়ার ব্যাপারে তোমার প্রস্তাবগুলো খুবই ভাল।

আসছে বুধবার আমার বাবার পঞ্চম মৃত্যু বার্ষিকী। এমন একজন বুদ্ধিমান, হৃদয়বান, স্নেহবৎসল সদাশয় পিতাকে হারিয়ে

আমাদের বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে। ধর্মযাজককে আমি বলব বাবার স্মৃতিতে যেন একটা বাতি জ্বালানো হয় এবং ইহুদী প্রার্থনা সভায় আমি নিজে তর্পণ করব।

ইস্কুল, সামাজিক জীবন এবং মানসিক চাহিদা—ছেলেদের যাবতীয় ব্যাপার নিয়ে আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে। ওদের গরমের ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই অনেকগুলো কাজ চালু করে দেওয়া দরকার।

খুব শান্তি পাই যখন দেখি আমার পরিবার পরিজনদের নিষ্ঠা ও অনুরাগ এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। ওরা ষোল আনা আমাদের পেছনে।

তোমার সুন্দর মুখের দীপ্তি অম্লান রাখো। ভালবাসা।

জুলি

প্রিয়তমা, ১লা আগষ্ট, ১৯৫১

আজকের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে আগে বলে নিই। আজ সকাল থেকেই খুব অস্থির, উন্মনা হয়ে পড়েছিলাম। এত উদ্বেগ হচ্ছিল বলার নয়। তোমাদের গলার স্বর যেই সেল ব্লকের দিকে ভেসে এল, অমনি আমার সেই অসহ্য ভাব দূরে চলে গেল। রবার্ট-এর গলা-ফাটানো চীৎকারও আমার কাছে গানের কলির মত মনে হল।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে গেলাম কাউন্সেল ঘরে। বাচ্চারা ছিল দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। আমি যখন ওদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম, ওরা কেমন যেন জড়োসড়ো হয়ে গেল—যেন অনেক দূরের মানুষ। প্রথমটা আমার একটু ধন্ধ লেগে গিয়েছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না, দুটো চোখ ভরে উঠেছিল জলে। আর মাইকেল কেবলি বলছিল, 'বাপি, তোমার গলা যে চেনাই যায় না।'

মিনিট দুই পরে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর কিছুক্ষণ

চুমো খাওয়া আর বুকে জড়ানোর পালা। রবী আমার কোলে এসে বসল। আমার দিকে সরু ক্ষীণ মুখ তুলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বাড়িতে যাও না কেন, বাপি?' আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম। 'কেন তুমি রবিবারে রবিবারে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে শেল্টারে যাওনি?' আবার আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু ও এত ছোট যে, মাথায় কিছুই ঢুকল না। ঘরময় ছুটোছুটি করে চেয়ারগুলোর সঙ্গে খেলা করতে লাগল।

ছেলেদের আমি থলি ভর্তি শক্ত চিনির মিঠাই দিলাম আর ট্রেণ, বাস আর মোটর গাড়ীর আঁকা ছবি দেখালাম। মাইকেল বেশীর ভাগ সময় বসে বসে পেন্সিল দিয়ে ট্রাকের ছবি আঁকল— বড়টিকে একটু লাজুক-লাজুক মনে হল, কথা বলল কম। আমার দিকে মুখ তুলে তাকায়নি বললেই হয়। তুমি যা বলেছিলে সেইমত আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ডেভ, তোমার মা এবং রুথ সম্পর্কে দুচারটে কথা বলল।

যখন তোমার পরিবার সম্পর্কে আমি সব খুলে বললাম একমাত্র তখনই আমাদের আলাপ জমে উঠল। মাইকেল হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'তোমাদের বিচারে কোন নিরপেক্ষ উপদেষ্টা ছিল কি?' জিজ্ঞেস করল, 'মিষ্টার ব্লক ছাড়া তোমাদের পক্ষে আর কে সাক্ষী ছিল?' আসল কথা, ওরা দুজনেই খুব ভয় পাচ্ছে।

মাইকেলের কথা থেকে একটা জিনিষ বেরিয়ে এল। তা হল এই যে, আমার বদলে মাইকেল এখানে থাকলেই ভাল হত। অবশ্য ইচ্ছে থাকলেও প্রথম দেখা সাক্ষাতে এর চেয়ে বেশী বিষয়ে কথা হওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুক্ষণ গান করা গেল। তারপর খেলার ইস্কুল নিয়ে গল্প—তাতে ওদের মন অনেকটা হাল্কা হল।

তুমি আগে যেভাবে কথাবার্তা বলে রেখেছিলে, তাতে আমার খুব সুবিধেই হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা এত ভালভাবে উৎরে যাবে ভাবতেও পারিনি। জানো, ওরা বায়না

ধরেছিল সেপাইরা ওদের দেহতল্লাসী করুক। ছেলেরা বলল তোমাকে নাকি আরও ছোট দেখাচ্ছে। আমি ওদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম আমার গোঁফ জোড়াটি নেই। ছোটটি জিজ্ঞেস করল, 'গেল কোথায় ?'

ওদের কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কাঠের ব্লক, রেলের লাইন, মূর্তি গড়বার মাটি, রকমারি জিনিষ তৈরির বাক্স এবং আর যা সব খেলনা ছিল কোনটা নিয়েই ওরা খেলেনা। এমন হতে পারে যে খেলনাগুলো হারিয়ে গেছে, কিম্বা খেলনাগুলো ওরা পায় না।

ব্যাপারগুলো আমাদের খুঁটিয়ে দেখা দরকার। প্রিয়তম, ছেলেদের কাছে থাকা আমাদের একান্ত দরকার। আশা করি বেশিদিন ওদের ছেড়ে থাকতে হবে না আমাদের। মাইকেল বলেছিল আমরা যাব বলে আমাদের জন্যে নাকি ঘর গোছানো হচ্ছে, ওর ঠাকুমা নাকি ভেতরের ঘরে উঠে যাচ্ছেন। অর্থাৎ, ও ধরেই নিয়েছে আমরা ফিরে যাচ্ছি। ওদের ছেড়ে চলে আসবার সময় মনে হল আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে ফেলেছি। ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তম আমার, ১লা আগস্ট, ১৯৫১

আমার মনটা বিষাদে ভারী হয়ে আছে। আমার ভয় হচ্ছে আমি মোটেই নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি। অবশ্য খুবই স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেছি। বাইরে থেকে দেখে হয়ত তাই মনে হয়ে থাকবে। আমি যখন হাসছিলাম, ছেলেদের চুমো খাচ্ছিলাম—সারাক্ষণ আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল বিচিত্র আবেগ। আমি মনে করি না আমি নিজেকে তার মধ্যে এতটা ধরে রাখতে পেরেছিলাম যাতে কিছু কাজের কাজ করা সম্ভব হয়েছে। অন্য কারো পক্ষে যে সম্ভব হত

তাও অমার মনে হয় না। এক বছর পর প্রথম দেখা হচ্ছে সেখানে মুখ খোলার চেয়ে বেশী কিছু আশাও করা যায় না।

যাই হোক, কিছুতেই আমি আশাভঙ্গের বেদনা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। ওদের কলকণ্ঠ আর শুনতে পাচ্ছি না—দারুণ যন্ত্রণা আর ওদের কাছে পাবার বাসনা আমাকে নিষ্ঠুর ভাবে দহন করছে।

তবু আমার বুক গর্বে আর আনন্দে ভরে আছে। শুক্রবার দেখা হবে।

ভালবাসা জেনো—এথেল

প্রিয়তম আমার, ২রা আগস্ট, ১৯৫১

ছেলেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিবরণ তোমার চিঠিতে এত জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে—পড়তে পড়তে চোখে জল এল। ওদের কি যে ভালবাসি, কি করে ওদের ছেড়ে বেঁচে থাকব?

ভেবাচেকা খাওয়া ছোট ছেলেটার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ, ভয়াকুল চাহনি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আর মাইকেল সম্পর্কেও আমার দুশ্চিন্তা কম নয়—হাসি হাসি ভাব আর মুখে কথার খৈ ফুটিয়ে আসলে ও আমাদের ভোলাতে চাইছিল। ওদের যে এক্ষুনি সাহায্য করা দরকার, সে বিষয়ে ভুল না হয়। আমার কতকগুলো প্রস্তাব আছে, তোমার সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করব বলে অস্থির হয়ে উঠেছি। কিছু কিছু আমি সংক্ষেপে লিখে রেখেছি দেখা হবার আগেই বাকি গুলো লিখে শেষ করে ফেলব।

এবার আমার শুতে যাওয়াই উচিত। চোখের জল আবার শুরু হয়েছে। প্রিয় আমার, তোমাকে আমি চাই, তোমাকে ভালবাসি।—হায় ভগবান, এই দারুণ হতভাগ্য যন্ত্রণার শেষ কোথায়! শুভরাত্রি, প্রিয় জুলি আমার।

এথেল

প্রিয়তমা, ৫ই আগস্ট, ১৯৫১

দুঃখ আর বেদনার অভাব নেই আমাদের। তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি। আমারও খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু ছেলেদের ভাঙা জীবন জোড়া লাগাবার জন্যে ঠিক যে ব্যবস্থাগুলো করা দরকার, তা করবার যোগ্যতা আমাদের তো আছে।

ওদের সঙ্গে দেখা হবার পর আমাদের অবস্থাটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমি বলি কি, ধাপের পর ধাপ কি রকম ব্যবস্থা হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে তুমি মোটামুটি ছক তৈরী করো। ম্যানির সঙ্গে এবং আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এ বিষয় কথা বলব এবং আমাদের লিখিত প্রস্তাব ওদের হাতে দেবো। গোটা বাড়ির আবহাওয়া, খেলাধুলো, জিনিষপত্র সমস্ত দিক থেকে আমূল পরিবর্তন দরকার।

মাইকেলকে অন্য কোন ইস্কুলে এবং ছোটটিকে নার্সারি ইস্কুলে দেবার জন্যে খুবই চেষ্টা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। একটা জিনিষ মনে রেখো আমি কিন্তু একটুও ভয় পাইনি—কেননা আমি মনে করি এ সমস্তই করবার মত মালমশলা আমাদের হাতে আছে। তোমার বিশ্লেষণমুখী আর খুঁটিনাটির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর থাকায় ছেলেদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরির ভার তোমাকেই নিতে হবে। চিরদিন তোমারই।

জুলি

প্রিয়তম, ৭ই আগস্ট, ১৯৫১

শনিবার সকালে ঘুম ও দেখি মাথার ভেতর দবদব করছে, ভেতরে একটা অস্বস্তির ভাব। মনের উপর দিয়ে সপ্তাহভর যে ঝড় ঝাপ্টা গেছে বুঝলাম ওটা তারই ফল। এখন আমি দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। শুধু শুধু ভেবো না যেন।

তোমার মনের কোমলতা, একাগ্র নিষ্ঠা আর সাহসের জন্যে

তোমাকে আমি ভালবাসি। স্ত্রীর কথা ভেবে, ছেলেদের কথা ভেবে তুমি কি অসহ্য যাতনা পাও, আমি জানি। আমার সমস্যাগুলো তুমি বারবার বুঝবার চেষ্টা করেছ এবং বরাবর এই বিশ্বাস রেখেছ যে আমি নিজেই তা সমাধান করতে পারব। তোমার সেই সহানুভূতি আর বিশ্বাসের জোরেই আমি বীরবিক্রমে প্রত্যেকটি যন্ত্রণাকাতর দিন পার হয়ে চলেছি। তোমার চির অনুগত।

এথেল

প্রাণের জুলি, ৯ই আগস্ট, ১৯৫১

পৃথিবীতে কোনদিন কোন মেয়ে কি তোমার মত এমন স্বামী পেয়েছিল? না পায় নি। হঠাৎ এত ক্ষেপে উঠলাম কেন, জানো? আজ 'আমার স্মৃতির সাজি' ঘাঁটতে ঘাঁটতে মাতৃদিবসে আমাকে পাঠানো তোমার সেই অন্তরস্পর্শী উচ্ছ্বাস-ভরা কার্ড'টা হঠাৎ খুঁজে পেলাম। মনে পড়ে, কার্ড'টা পেয়ে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কার্ড'টা হাতে দিয়ে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে ম্যানির চোখদুটো চক্ চক্ করে উঠেছিল, তারপর বাজি মাৎ করার ভাব নিয়ে সগর্বে বার করেছিল মাইকেলের অতুলনীয় ছবি। চোখ দুটো তার আনন্দে উজ্জ্বল—পেছনের সারিতে একাগ্র ভঙ্গিতে বড়দের মত হাসি-হাসি মুখ করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে যে, ছবিটা দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি। সেই সঙ্গে ছেলের জন্যে অসহ্য ব্যথায় ককিয়ে উঠছে আমার মন। আমি সেই পশুজননীর মত আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করতে পারি, যার কোল থেকে তার শাবককে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে! হীন নীচাশয় লোকগুলোর এতদূর সাহস হয় যে, কলঙ্ককলুষ হাতে তারা আমাদের পবিত্র সংসার স্পর্শ করে? আমেরিকাবাসী সমস্ত বোনদের আমি ডেকে বলছি—আজ যদি তোমরা নীরব থেকে এই অন্যায় বিনা বাধায় ঘটতে দাও,

তোমাদের কারো স্বামী, তোমাদের কারো ছেলেমেয়ে কতকাল নিরাপদে বাঁচতে পারবে ?

মনে হচ্ছে যেন তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কোন্ দূর অস্পষ্ট অতীতে। তবু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, দুজনের মাঝখানে আড়াল-করা নিষ্ঠুর কিন্তু হাস্যকর তারের জালে দৃঢ় সংকল্পে ঠেকানো তোমার নাক। আমি দেখতে পাচ্ছি দুষ্টুমিভরা তোমার চোখ। আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে চুম্বন এঁকে বিদায় নিই !

এথেল

প্রিয়তম জুলি আমার,   ১০ই আগস্ট, ১৯৫১

এর মধ্যেই আমার মন উড়ে যেতে চাইছে বুধবার সকালে। যে দূরত্বটুকু আমাদের আড়াল করে রেখেছে সেটা পেরিয়ে যেই তুমি সোল্লাসে ডেকে ওঠো, অমনি আমি আবার বেঁচে উঠি, আমি নিজের সত্তা ফিরে পাই—শুধু তখনই জানতে পারি অন্য কোন জগতের কাল্পনিক বাসিন্দা নই আমি। তাহলেও আমার মনে হয়, আমি এমন জগতে এসে পৌঁচেছি যখন অনর্থক অস্থির না হয়ে এই একভাবে মাসের পর মাস আমি এখানে কাটিয়ে দিতে পারি। আমি এখন খানিকটা থিতিয়ে বসতে শুরু করছি। প্রাণপণে কামনা করছি, আমার এই দার্শনিক ভাব যেন বজায় থাকে।

সত্যি সত্যি আমি ভাবতে শুরু করেছি, আমি যেন শুধু অপেক্ষায় আছি। তারপর বাড়ি ফিরে যাবো তোমার কাছে, ছেলেদের কাছে। সদাচারের দিক থেকে, ন্যায়ের দিক থেকে দেখলে শুধু এইভাবেই এ কালরাত্রির অবসান হতে পারে। কাজেই আমি বলি কি, এসো মনে ফূর্তি আনি। অন্তত এই রকম একটা সিদ্ধান্তে আমার পৌঁছুনো দরকার—নইলে এ দুদিন কেন আমি কেবলি গান গাইছি ?

আমার বিশ্বাস, ছেলেরা আসাতেই আমার মধ্যে আশাবাদ দিন

দিন এমনি ভাবে মাথা তুলছে। যে কারো খাতা দেখে আমি যে গান গাইছি, তার মূলে আছে ওরা। ম্যানির সঙ্গে সেদিন দেখা হওয়াতেও খুব উৎসাহ পেয়েছি। যত দিন যাচ্ছে ততই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, আইনের বিধানমতেই বিচারের ফল উল্টে যাবে। তোমাকে ভালবাসি, প্রিয়তমা, চিরদিন তোমার।

এথেল

প্রিয়তমা এথেল, ১৬ই আগস্ট, ১৯৫১

দিন দিন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ওদের মতলব। রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছে। জনসাধারণের অধিকার আর সংবিধান পদদলিত হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে ব্যাপকতর করে তোলা হচ্ছে স্নায়বিক উত্তেজনা। সময় এসেছে, এবার জনসাধারণকে উঠে দাঁড়াতে হবে, নিজেদের অধিকার বুক দিয়ে রক্ষা করতে হবে।

লেনা আমাকে চিঠি লিখেছে। অন্যান্য খবরের সঙ্গে জানিয়েছে মাইকেলের ঘুমোবার সমস্যার কথা। মার কাছে শুয়ে ঘুমোতে চায় সে। লেনা লিখেছে, শনিবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে এ বিষয়টা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। ঠিক ওর মা আর বাপের মতই মাইকেল সারাক্ষণ এত ভাবে যে ওর পক্ষে দুচোখের পাতা এক করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। ও চায় শুতে যাবার সময় ওকে চুমো খেয়ে শুভরাত্রি জানাই, কাছে বসে ঘুম পাড়াই। এ ধরণের ব্যাপার যখনি দেখি বুক আমার ফেটে যায়।

অনেক বেশি মনের জোর দরকার। যদি আমরা পুরোপুরি স্বাধীনতা আদায় করতে পারি, শীগ্‌গির ফিরে যেতে পারি নিজেদের সংসারে—একমাত্র তাহলেই যে-ক্ষতি আমাদের হয়েছে তা পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। ফল যাই হোক, নির্দোষিতা প্রমাণ করবার লড়াই আমি চালিয়ে যাবো। উজাড় করা ভালবাসা।

জুলি

প্রিয়তম আমার,   ১৬ই আগস্ট ১৯৫১

কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি যেন এমন এক জগতের বাসিন্দা, যার পাঁচিলের ওপাশে আর কোন জগৎ নেই। জেলখানার ভাষায়, আমি 'মানিয়ে নিয়েছি'। আমি 'উৎরোতে পেরেছি', কেননা একদিন যার হাতছানি আমাকে জ্বালিয়ে মারত—সেই 'রাস্তা' আজ আর আমাকে চুম্বকের মত টানে না। যে সুনির্দিষ্ট এলাকার গণ্ডী দিয়ে আমার গতিবিধি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, আজ তা মিলিয়ে গেছে—কেননা অন্য এলাকা বলে কিছু আর নেই।

এই যেন আজ আমার মনের গতিক। আমি বুঝি আজ আমার দরকার নিজের সত্তার মধ্যে ডুবে থাকা—তার মানে আমার চিন্তা ও অনুভূতি যাতে প্রকাশ না পায় তা দেখা। ছেলেদের সম্বন্ধে, তোমার সম্বন্ধে আমি কত যে পরিকল্পনা করছি—কোনদিন এসব যে সত্য সত্য ঘটবে সে বিশ্বাস আমার নেই। আমাকে শুধুই স্বপ্ন দেখে যেতে হবে। আমি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে আনি। আমাকে আচ্ছন্ন করে অবসাদ আর ক্লান্তি, তবু বাইরের যে জগৎকে দৃশ্যত আমি পরিহার করেছি, সে জগৎ আগের চেয়ে ঢের বেশি তীব্রতা নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত—কেননা এখানকার অবস্থাটা আজ আর আমার কাছে আগের মত অতটা অজ্ঞাত কিম্বা ভীতিপ্রদ নয়।

আমি জানি এসবই খুব অসম্ভব বলে মনে হবে। হয়ত বড় বেশি খোঁচাখুঁচির দরুণ আমার মগজ এত ক্লান্ত যে চলতে চাইছে না। তোমাকে ভালবাসি।

এথেল

প্রিয়তম,   ১৬ই আগস্ট, ১৯৫১

এই সুনীল সোনালি দিনের একটা মধুর প্রশান্তি আছে। আমি পান করি উজ্জ্বল রৌদ্র আর হাওয়া—নিজের মধ্যে দেখতে পাই জীবনের উন্মাদনা আর শক্তিমত্তা।

কাজের কথায় এবার আশা যাক। প্রিয়তম, তোমার মার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে মনটা এত খারাপ হয়ে আছে—ওঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, দেহের ওপর দিয়ে কম ধকল তো যাচ্ছে না। ম্যানিকে আমি জরুরী চিঠি পাঠিয়েছি যাতে আসছে সপ্তাহের গোড়াতেই ওর সঙ্গে দেখা করে ঠিকমত একটা রাস্তা বাৎলানো যায়। বড়রা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই খুব ভোরে ছেলেরা যাতে নিজেরা নিজেরা খেলা করতে পারে তার জন্যে আমি খুঁটিনাটি জিনিষের একটা ফর্দ করেছি। তাতে করে ওদের হৈ-হল্লা হুটোপাটি একেবারে বন্ধ না হলেও কমানো যেতে পারে। ম্যানিকে আমি লিখে দিয়েছি লেনাকে যেন প্ল্যাষ্টিসিন, রান্নাবাড়ি, ম্যাজিক স্লেট এবং রবারে গাড়ি কেনবার কথা জানিয়ে দেয়। ভালবাসা।

এথেল

প্রিয়তমা সহধর্মিণী আমার, ২৩শে আগস্ট, ১৯৫১

মার শরীরের কি হাল হয়েছে! দেখে বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল। ম্যানিকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি যেন মাকে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো হয়। সেই সঙ্গে বাড়ির গোলমালটাও মিটিয়ে ফেলতে বলেছি।

রেমিংটনের সাজা বাতিল করে সার্কিট কোর্ট যে রায়* দিয়েছে, আশা করি তুমি তা পড়েছো। ঘটনাটা খুবই উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করো আদালত সেপল্-কে‡ তার কার্য কলাপের জন্যে কিভাবে

*বিচারক সোয়ান রায়দান প্রসঙ্গে বলেছেন: 'সরকার পক্ষের উকিলকে আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই…যদি পুনর্বিচার হয় তাহলে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী রেডমণ্টের নাম বদলানোর ব্যাপারে যেন তাঁকে আগের মত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা না হয়। রেডমণ্ট বলেছেন যে, বৈষয়িক কারণে তিনি তাঁর নাম বদ্‌লেছেন এবং

ধম্‌কেছে এবং সেই সঙ্গে বিচারকের ভুল দেখিয়ে দিয়েছে। আদালত যদি আমাদের মামলাটা ভালভাবে পুনর্বার বিচার করে দেখে তাহলে আমাদের সাজা যে বাতিল হয়ে যাবে—বিশ্বাস আমার আছে।

বাদামী রঙের ছোট একটা প্রজাপতি এবং সাদা রঙের ছোট একটা পোকা বইয়ের পাতার মধ্যে গুঁজে রেখেছি। অবশ্য আমি তোমারই অনুকরণ করছি—ছেলেরা আবার কবে আসবে সেই আশায় পথের দিকে তাকিয়ে আছি।

কবে আমরা আবার বিজয়গর্বে ঘরে ফিরব—সেই আশায় বসে আছি। ছেলেদের সঙ্গে আর মার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হবে তখন কি করব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবি। তারপর আমি একা তোমাকে পাবো এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

চিরদিন তোমার—জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ২৬শে আগস্ট, ১৯৫১

দাবাখেলা এখন বন্ধ। যাদের সঙ্গে খেলতাম, তারা এখন তাদের মামলার ছাপানো নথিপত্র পাওয়ায় কাজে ব্যস্ত। যতক্ষণ কিছু একটা নিয়ে থাকি, সময় কেটে যায়। আমার কীটপতঙ্গ সংগ্রহে নতুন যোগ হয়েছে একটি পঙ্গপাল এবং একটি ড্রাগনফ্লাই।

আদালতের অনুমোদন নিয়েই তিনি তা করেছেন। জেরা করতে করতে যখন দেখা গেল নাম বদ্‌লানোর ব্যাপারটার সঙ্গে এই মামলার কোনই যোগসূত্র নেই, তখনও সরকারী উকিল জেরা চালিয়ে যেতে লাগলেন—জুরীদের মনে বর্ণবৈষম্য জাগিয়ে তোলা ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।' যুক্তরাষ্ট্র বনাম রেমিংটন ১৯১ এফ ২ ডি ২৪৬, ২৫২

* রোজেনবার্গ মামলার মার্কিন সরকার পক্ষের উকিল।

লেনা লিখেছে যে, শিশুসদনের একটি ছেলের সঙ্গে মাইকেলের খুব ভাব হয়েছে। ছেলেটি কাছাকাছিই থাকে। ছেলেটির বাড়িতে মাইকেল একদিন বেড়াতে গিয়েছিল, তাদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করেছে। ওরা ঠিক করেছে তুজন তুজনের বাড়িতে পালা করে যাবে আসবে। ছেলেত্নটোকে দেখাশুনো করবার মত তেমন যদি চৌকস লোক পাওয়া যায়, তাহলে ওদের ছট্‌ফটে ভাবটা অনেক কেটে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। মার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় খুবই উদ্বেগ বোধ করছি এবং বাড়ির যা অবস্থা তাতে ভাবনা হচ্ছে।

বসে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছি আর সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে, সন্ধ্যে হলে বাড়িতে বসে আমরা রেকর্ড শুনতাম ; ছেলে তুটো পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকত নিজেদের ঘরে। সেই সব তুচ্ছ জিনিষ আজ নতুন অর্থে ধরা দিচ্ছে, আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে তোমাকে নিয়ে ছেলেদের নিয়ে আমি কত সুখী ছিলাম আমার তা জানা ছিল না।

এ সমস্ত কিছুর সত্যিকার মূল্য আমি জেনেছি। তাই আজ আমি আগের চেয়েও সুখী। আমরা কোনদিন বিশ্বাস হারাইনি ! আমাদের মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে এবার তা পরিস্কার হয়ে যাবে এবং ক্রমেই বেশী বেশী লোকের চোখে ধরা পড়ছে। এর সঙ্গে আছে আমাদের পক্ষসমর্থনকারী বিচক্ষণ আইনজ্ঞের দল। সমস্ত মিলিয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা ছাড়া পাবো, আমরা যে নির্দোষ তা প্রমাণ হবে। যে সময় খোয়া গেছে, যে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে— তোমার ও ছেলেদের সমস্ত ক্ষতি আমি পুরিয়ে দেব। সহধর্মিণী আমার, তোমাকে ভালবাসি।

জুলি

ছোট্ট বউ আমার, ৩০শে আগস্ট, ১৯৫১

এ কথা বলা যায় যে, তোমার সঙ্গে এবং ম্যানির সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে মনটা বেশ চাঙ্গা আছে। শুনলাম বহু লোক—যাদের মধ্যে অনেককেই আমরা চিনি না—আমাদের মামলা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। শুনে কি ভাল যে লাগল! আমরা যেটা সব চেয়ে বেশি করে চাই তা হল এই, আমরা যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা প্রমাণ করার জন্যে বিচারের নথিভুক্ত ঘটনাগুলো সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হোক।

কাল আমি মাইকেলকে চিঠি লিখেছি। তাতে আমার কীটপতঙ্গ সংগ্রহের বিবরণ দিয়েছি। আমার সংগ্রহশালায় আজ নতুন চারটে নিদর্শন যোগ হয়েছে।

মাইকেল আর রবার্ট বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে। দরদী মানুষদের সাহচর্যে বেশ আনন্দে থাকবে ওরা। খবরটা পেয়ে খুব ভাল লাগছে।

নিজের এত মুস্কিল সত্বেও যেভাবে তুমি অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করছ তাতে তোমাকে বাহবা না দিয়ে পারি না। আমি জানি, আমি উপলব্ধি করি কি অসামান্য মানুষ তুমি—কিন্তু কষ্ট হয় যখন দেখি তোমার বাড়ির লোকেরা এখনও তোমার গলায় হাড় হয়ে লাগার চেষ্টা করছে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে! সব চেয়ে বড় কথা, তুমি ওদের মতলব ধরে ফেলেছ এবং নিজের মনের শান্তি নষ্ট হতে দাওনি।

এথেল, তোমার জন্যে বড়ই মন কেমন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো। সাজানো মামলা ফেঁসে যাবেই যাবে, যে সময় আমরা খুইয়েছি তা পুষিয়ে নেবো—এ বিশ্বাস আমার আছে। আজ এই পর্যন্ত।

জুলি

প্রিয়তমা আমার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

ছেলেদের সঙ্গে দেখা হবার ব্যাপারটা এত নিখুঁতভাবে ঘটে যাবে ভাবিনি। ঘরে ঢুকবার সময় থেকেই দেখলাম ওদের বেজায় ফুর্তি। দেখা হওয়ায় এত ভাল লেগেছিল, যে ছেড়ে যাবার সময় খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওদের। মাইকেল বলল, আরও দেখা করতে চায় সে। আগে থেকেই তুমি জমি তৈরি করে গিয়েছিলে বলে আবহাওয়াটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পারিবারিক প্রীতিসম্মিলনীর।

লেখবার টেবিলের তলায় দুজনে লুকিয়ে ছিল। রবী ছেলেমানুষের মত খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠায় ধরা পড়ে গেল। তারপর আমার দিকে ছুটে আসতেই পরস্পরকে আমরা জড়িয়ে ধরলাম। পেন্সিল আর কাগজের খাত পেয়ে মাইকেল বলে উঠল, কি সুন্দর! তারপর আঁকতে বসে গেল। আমি ওদের আমার কীটপতঙ্গের সংগ্রহ দেখাতে লাগলাম আর টেবিলের ওপর দুটো কলা আর দু'খণ্ড 'হের্শি' এগিয়ে দিলাম। বড়টি অমনি বলে উঠল, বাবা, আমাদের পেটে আর জায়গা নেই। রবী অবশ্য দুটো 'হের্শি' আর একটা কলা দিব্যি গলাধঃকরণ করে ঘরময় সরবে দস্যিপনা করে বেড়াতে লাগল। আমি ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুমো খেলাম আর কোলে তুলে নিয়ে ঘুরতে লাগলাম যাতে মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

বেশীর ভাগ সময়ই আলোচনায় কেটে গেল। গোড়াতেই প্রাণ-দণ্ডের কথাটা পাড়লাম। মাইকেল বলল খবরের কাগজে পড়েছে। আমি ওকে বললাম, আমরা ও নিয়ে মোটেই ভাবিত নই। আমরা নির্দোষ। আপীল করবার অনেক রাস্তাই খোলা আছে। সেই সঙ্গে বললাম ও বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো মাইকেলের কর্তব্য নয়—ওর উচিত বড় হওয়া এবং শরীর ভাল রাখা।

মাইকেল আমাকে জিজ্ঞেস করল মৃত্যু কিভাবে হবে। আমি সব খুলে বললাম। তারপর ও জিজ্ঞেস করল বৈদ্যুতিক চেয়ার

এখানে আছে কিনা। আমি বললাম আছে। ক্রমাগত ও আপীল সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল—যদি শেষ পর্যন্ত মামলায় আমাদের হেরে যেতে হয়, যদি মরতে হয়? বার বার আমি ওকে আশ্বাস দিতে লাগলাম কিন্তু লক্ষ্য করলাম ও ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে।

এফ-বি-আই আর জুরিদের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে মাইকেল কাগজে যা পড়েছে সে সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। যতদূর সম্ভব আমি তার জবাব দিলাম। জায়গায় জায়গায় ম্যানি সাহায্য করছিল। ম্যানি মাইকেলকে বলল বাড়ি ফেরবার সময় আরও বিশদভাবে তার প্রশ্নের জবাব দেবে।

মাইকেল বলল, বাবা, আমি পড়ে-শুনে উকিল হয়ে তোমার মামলায় সাহায্য করব। আমি বললাম, সে তো অনেক দেরি। তার আগেই তোমরা ছোট থাকতে থাকতেই তোমাদের কাছে আমরা ফিরে যেতে চাই। ও আমাদের সাহায্য করতে চায়, আমাদের জন্যে কিছু একটা করতে চায়,—আমাদের কোন অমঙ্গল হবে না, এ বিষয়ে আশ্বস্ত হতে চায়।

প্রিয়তমা আমার, এই বয়সে মাইকেলের মাথায় পর্বতপ্রমাণ সমস্যা—এতে তার মন গভীরভাবে তোলপাড় হয়। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর ঠাকুমা কেমন আছেন। উত্তরে সে বলল, তেমন ভাল নয়, কারণ ঠাকুমাকে নাকি সে কষ্ট দেয়। মাইকেল বড় বেশী চেঁচামেচি করে বলে পাড়াপড়শীরা নাকি তার নামে নালিশ করে—এ ব্যাপারে তার একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব আছে।

একটা ছোট ঘটনা থেকে রবীর সমস্যা কিছুটা বোঝা যাবে। ছট্‌পট্‌ করতে করতে রবী হঠাৎ জলের গ্লাসসুদ্ধ একটা ট্রে উল্টে দেয়। ফলে একটা গ্লাস পড়ে ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রবী ছুটে ম্যানির আড়ালে গিয়ে লুকোয় আর মাইক বলে ওঠে, 'ইস কি করলি!' কিন্তু আমি এমনভাব করলাম যেন কিছুই হয়নি। অনেক বোঝাবার পর তবে রবীর ভয় ভাঙল।

ছোট্ট বাচ্চাটা আর মাইকেল দুজনেই খুব ভয় পেয়েছে। যদি তাড়াতাড়ি আমরা ওদের কাছে ফিরে যেতে পারি একমাত্র তাহলেই ওদের সমস্ত চোট আমরা সারিয়ে তুলতে পারব। আরও অনেক কথা বলার আছে, সাক্ষাতে বলব। তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করে। ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তম আমার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

আজ সারা বিকেল রোদ্দুরের মধ্যে বসে ছিলাম। শরীর আর মন এলিয়ে দিয়ে, আকাশের দিকে মুখ তুলে উপভোগ করছিলাম সেই মধুর উষ্ণতা। চোখ দুটো বন্ধ করে বিস্মৃতির সুখোচ্ছ্বাসে আমি ভেসে চলেছিলাম। আমি প্রাণপণে চেয়েছিলাম ভুলে যেতে, যাতে ছেলেদের সঙ্গে শুক্রবার দেখা হওয়ার জাজ্বল্যমান স্মৃতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই।

দেখা হওয়ার প্রত্যেকটি মুহূর্ত মনে পড়ে গিয়ে গোড়ায় গোড়ায় মন শুধু আনন্দে ভরে উঠেছিল। কিন্তু কাল রাত্তিরে আমার মনশ্চক্ষে মাইকেলের দুষ্টুমিভরা হাসি-হাসি মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেল, রবীর ছোট্ট মিষ্টি মুখ হয়ে উঠল বিষাদে ভারাক্রান্ত, বেদনায় দিশেহারা।

ভুলে যেও না—এই মাতৃহৃদয়কে রীতিমত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ভাঙা হচ্ছে। এর যে কি যন্ত্রণা তা কেউ ভাবতে পারবে না। ভালবাসা জেনো।

'এথেল

প্রিয়তমা আমার,   ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

ছেলেদের সঙ্গে যেদিন দেখা হয়, সেদিনকার একটি ঘটনার কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। 'গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত প্রবন্ধ যখন আমরা আলোচনা করছিলাম, মাইক্ হঠাৎ সকৌতুকে আমার দিকে তাকিয়ে যেন খানিকটা অপূর্ণ বাসনা নিয়ে বলে উঠল, বাবা তোমাকে আর মাকে তো কখনও চুমো খেতে দেখিনি। আমার ধারণা, ভ্যানের মধ্যে চুম্বনরত অবস্থায় আমাদের ছবি কোন কাগজেও দেখেছে।

মাইকেল যেভাবে কথাটা বলেছিল, তার চোখে যে ক্ষুধা আমি দেখেছিলাম—তাতে মনে হয়েছিল সে যেন চীৎকার করে বলছে, আমি আমার মা আর বাবাকে চাই। আমাকে জোর করে বঞ্চিত করা হয়েছে মা-বাবার ভালবাসা, নিরাপদ আশ্রয় আর আরাম থেকে।

বোধহয় এখন আর কাছাকাছি পায় না বলেই, বিশেষ করে গত বছর থেকে—মাইকেল ভুলেই গেছে সকলের সামনে সর্বদাই আমরা কিভাবে পরস্পরকে আদর করতাম। ছেলেদের দুঃখটাই আমার মনে সব চেয়ে বেশী জ্বালা ধরায়।

মাস তিনেক আগে এখানে কংক্রিটের ফাটলের ময়লার মধ্যে একজন কমলালেবুর বীজ পুঁতেছিল। এই পোড়া জায়গায় আমরা সবাই যেহেতু জ্যান্ত জিনিষে বিশেষভাবে আগ্রহশীল, তাই জল ঢেলে তাকে আমরা লালন করেছিলাম। আস্তে আস্তে মাটির নীচে শক্ত শিকড় চালিয়ে দিয়ে ক্রমে সে ডালপালা মেলে ধরল। এখন সে মাথায় আট ইঞ্চি লম্বা। ডালে ডালে তার ফুল ফুটেছে, ছোট ছোট ফল ধরেছে। তফাৎটা কল্পনা করতে পারো? একদিকে লোহার গরাদ, কংক্রিট, উঁচু দেয়াল—অন্যদিকে ফাটলের মধ্যে বাড়ন্ত একটি কমলালেবুর গাছ। এখানকার এই শ্মশানভূমিতে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করছে সজীবতা, সৌন্দর্য আর জীবন।

আমরাও এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতে থাকব। আমি সেইদিনের কথা ভাবি যেদিন আবার আমরা ছেলেদের বুকে নিয়ে আনন্দে সংসার করব।

তোমাকে উৎসর্গ করছি আমার সমস্ত হৃদয়।

জুলি

প্রিয়তম জুলি আমার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

আমাদের বিচক্ষণ আইনজ্ঞ আছে, তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। সুতরাং এ বিষয় কোন প্রশ্নই উঠে না। বড় কথা হল এই যে, আমাদের এমন একজন বন্ধু আছে যার ওপর পুরোপুরি আমরা নির্ভর করতে পারি। ছেলেদের ব্যাপারে যখন সে কিছু করে, তার প্রতি আমি সীমাহীন ভালবাসা অনুভব করি।

দিনরাত আমাকে পাগল করে তোলে ছেলেদের ভাবনা। পুরোদস্তুর 'শিশু মনস্তত্ত্ববিদ্' বলে যারা গুমর করে—সত্যি বলতে কি, তাদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে! ফাঁদে আর পা দেওয়া নয়! খাদ্যবিশারদেরও খুরে নমস্কার।

ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার পর বন্যার বাঁধ যেন ভেঙে গেছে; আমি যেন আকণ্ঠ ব্যথায় ভরা প্রকাণ্ড জালা। আমার সমস্ত দেহমন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। চিরদিন তোমার—

এথেল

প্রিয়তমা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

এক যুগ আগে ১৯৩৬-এর বড়দিনে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। স্বভাবটা তার ভারি মিষ্টি, ভাণ বলে কিছু ছিল না তার মধ্যে। সেই মেয়ে এথেল। আমি তার গলায় মালা দিয়েছিলাম। জীবনে সেইটাই হয়েছে আমার সবচেয়ে সুখের।

বারোটা সুন্দর বছর আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। দুজনে ভাগ করে নিয়েছি, দুজনে মিলে খুঁজেছি জীবনের আনন্দ-উল্লাস। সাচ্চা নাগরিক হিসেবে মানুষের প্রগতির যজ্ঞে আমরা অংশ নিয়েছি। স্ত্রী-পুরুষে সাহসে বুক বেঁধে লঙ্ঘন করেছি জীবনের বাধা। আমরা বেঁচে থেকেছি, সুখী হয়েছি, শিখেছি আর অবিরাম এগিয়ে চলেছি—

শরীরে কষ্ট পেয়েছি, ব্যথায় কঁকিয়ে উঠেছে মন, আঘাতের পর আঘাত এসেছে, নির্জন নির্বাসনে কেটেছে দিন—আর সারাক্ষণ ছায়া ফেলেছে মৃত্যু। তবু যে আমরা মাথা নোয়াইনি—এটা কম কথা নয়। এই বিষাদের অন্ধকারে কখনও কখনও হতাশা দেখা দিলেও আমরা মাথা উঁচু করে আছি। শেষ পর্যন্ত আমরাই জয়ী হবো। আবার আমার ছেলেদের কাছে নিজেদের সংসারে ফিরে যাবো—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। যা কিছু ঘটছে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই অত্যাচারের কাছে কখনই আমরা নতজানু হবো না।

প্রিয়তমা আমার, আমি দেখাতে চেয়েছি কিভাবে পূর্ণ করেছো তুমি আমার জীবন। আমার হৃদয় উজাড় করে যেটুকু লিপিবদ্ধ করেছি এই চিঠিতে, তা থেকে আমি আশা করি আজ তোমার জন্মদিনে কিছুটা প্রাণরস তুমি আহরণ করতে পারবে।

চিরদিন তোমার অনুরক্ত জুলি

প্রিয়তম স্বামী আমার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

আজ সকালে বোকার মত আমি যে মন খারাপ করে বসেছি তার জন্যে তুমি কি আমাকে মার্জনা করবে না? পত্রপাঠ আমাকে চিঠি দাও। পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার জন্যে যে সংগ্রাম আমি চালিয়ে যাচ্ছি, চিঠিতে জানাও সে সংগ্রামে তুমি আমার শরিক। চিঠির সর্বাঙ্গে এঁটে দাও প্রেমের ঘোষণা, অত্যুক্তিতে কৃপণ হয়ো

না। আমি তোমাকে যে কি গভীরভাবে ভালবাসি আমার তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। আমি শুধু এখানে বসে বসে তোমার জন্যে আর ছেলেদের জন্যে, আমাদের ছিন্নভিন্ন জীবনের জন্যে কেঁদে ভাসাতে পারি।

প্রিয়তম, আমার ওপর ভরসা রাখো; তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বলেই আমি নিজের মধ্যে জোর পাই, নিজের কাছে উচিত মর্যাদা পাই—আমার প্রতি তোমার সেই বিশ্বাসই আমাকে এখানকার নিষ্ফল শূন্যতার হাত থেকে রক্ষা করে।

বন্দীশালায় ধর্মসভার অঙ্গ হিসাবে ইহুদী পর্বগুলো আমাদের কাছে কি তাৎপর্য বহন করে—এর ওপর তোমার সুচিন্তিত মত পেলে ভাল হয়। এর মধ্যে তুমি ভেবে রেখো। পরের দিন যখন দেখা হবে শুনবো।

প্রিয়তম, তাহলে এখন আসি। আগামী কালের গর্ভে কি আছে জানি না। যাই থাক, আমি নির্ভয়ে দিনান্তের বোঝা নামিয়ে রাখছি—নির্ভয়ে তারাই দ্বিধাভয়হীন, হৃদয় যাদের শুদ্ধ। বহুদিন আগে যেমন আমি ধরতাম তোমার সুন্দর মুখ তেমনি দুহাতে ধরেছি। তোমাকে আমি চুম্বন করছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রিয়তমা আমার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

বুধবার তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে কেবলি ভেবেছি। অনেক ভেবেচিন্তে মনে হয়েছে তোমার পক্ষ নেওয়াই আমার উচিত ছিল। কেননা চারিদিক থেকে তোমাকে ঠেসে ধরেছে, কাঁটায় কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছে তোমার মন, নিদারুণ টানাহেঁচড়ায় হাঁপিয়ে উঠেছো তুমি। তোমার কথার মধ্যে ঝাঁঝ না থাকলেও বোঝা গিয়েছিল সেদিন তুমি ফেটে পড়েছিলে। তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার ন্যায্য কারণ ছিল।

প্রিয়তমা, মনের মধ্যে তুমি যে ক্ষোভ পুষে রাখোনি তার জন্যে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তুমি নিজেই নিজের বুক চাপড়াতে থাকো, নিজেকে ছোট করো। সব চেয়ে বড় কথা হল এ নিয়ে অত উতলা না হওয়া।

আজও তুমি এগিয়ে চলেছো। আর জেনো, সারাটা সময় আমি তোমার পাশে আছি। সত্যি তুমি যে কী ভালো, কী অসামান্যা। তোমার হৃদয় আছে, অন্যের দুঃখ দেখলে ব্যথা পাও—তবু একটুতে বড় বেশি কাতর হও তুমি!

আশা করছি, আমার জন্মদিন আর আমাদের বিয়ের বার্ষিকী আমরা দুজনে এক সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে বসে পালন করতে পারব। হয়ত আমি একটু বেশী রকম আশা করে ফেলেছি, তবে আমাদের মত লোকেরা সব সময় একটু আশাবাদীই হয়ে থাকে। শুভ জন্মদিন, প্রিয়তমা।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

সামনের দেয়ালে আঁটা ছেলেদের ছবিগুলির পাশে তোমার ছবি। তোমার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি লেখবার টেবিলে বসে আছি। আজ ইহুদী নববর্ষের দিনে তোমার সুখসমৃদ্ধ জীবন আমি কামনা করছি। তোমার স্বভাব চিরদিন এমনি থাকুক।

লেনা দেখা করতে এসেছিল। ভারি ভাল লাগল। ও তোমাকে বলতে বলেছে ম্যানির স্ত্রী মাইকের জন্যে চামড়ার খাপসুদ্ধ দুটো কাউবয় বন্দুক আর রবীর জন্যে একটা ঘন্টা-লাগানো চাকা উপহার পাঠিয়েছে।

'গার্ডিয়ান'-এর প্রবন্ধগুলো পাওয়ার পর কতবার যে পড়লাম। সত্য আর চাপা থাকছে না। আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন

এমন সৎ অমায়িক মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সম্পাদকের কাছে লেখা যে সব চিঠিপত্র বেরিয়েছে, তা পড়লে মন খুশি হয়ে ওঠে।

প্রায় গোটা বিকেলটাই রেডিওতে কান পেতে একমনে খেলার রীলে শুনেছি। খেলাটা দারুণ জমেছিল। শেষ পর্যন্ত ডজার্স্ দলেরই জিৎ হল। একদম খেলা শেষ হওয়ার মুখে জ্যাকি রবিনসন হৈ হৈ করে পিটিয়ে রাণ তুলল।

প্রিয়তমা আমার, তোমাকে দেখতে কি সুন্দর।

জুলি

প্রিয় আমার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

তাহলে এবার ছত্রিশ পেরোলাম। জেলখানায় এই আমার দ্বিতীয় জন্মদিন। এ দিন ভারি সুন্দর রকমারি কার্ড পেয়েছি—এসেছে আমার প্রিয় স্বামীর বাড়ির লোকদের কাছ থেকে, পাঠিয়েছে তার দুই ছেলে আর সে নিজে।

ইষ্ট সাইড-এর নীচু তরফের আঁধার-ঢাকা রাস্তাগুলোর কথা এখন ভাবছি। রাত পোহালেই সব দল বেঁধে ইহুদী ধর্মমন্দিরে উপাসনা করতে ছুটবে। আমি একান্তভাবে কামনা করি, তাদের প্রার্থনা সফল হোক। তবু জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, কর্মের সঙ্গে যুক্ত না হলে তত্ত্ব হয় নেহাৎ ফাঁকা, শুধু অর্থহীন অনুষ্ঠান মাত্র। সমস্ত সৎ মানুষই আজ অন্তরের সঙ্গে চাইছে শান্তি, ভালবাসা, চাইছে ভয় থেকে মুক্তি। কিন্তু শুধু মুখ ফুটে চাইলেই তো আর হাতে এসে যায় না। সামাজিক ন্যায়বিচার পাবার জন্যে কত ভাই রোজ তিরিশ দিন লড়ছে, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। সর্বশক্তিময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ছুতো করে সে দায়িত্ব যেন কিছুতেই আমরা না এড়াই। যারা ইহুদী নয়, যাদের গায়ের রং শাদা, যারা কালো—সবাইকে নিজেদের শক্তিতে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে।

কোন রকম জানান না দিয়েই হঠাৎ শীত এসে গেছে। কুয়াশায় ঝুলে-পড়া আজকের আকাশ জানুয়ারী মাস হলেই মানাত ভাল—আর যাই হোক এটা রীতি নয়। শান-বাঁধা উঠোনে চিন্তায় ডুবে গিয়ে আমি হাঁটছিলাম আর কন্‌কনে বাতাস যেন সারা গায়ে হুল ফোটাচ্ছিল। ডজার্স দলের কাছে ফিল্‌দের হারের খবরে মনটা আবার বেশ তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়ে উঠল। যে দিনটা আমার কাছে বরাবরই খুব বাজে বলে মনে হয়, কিছুতেই কাটতে চায় না—এখন সেই দিনটা ফুরোতে বসেছে। সোমবার হলেই মনে জোর পাই, তাজা হয়ে উঠি। যতই হোক, সোমবার এলে বুধবারের আর কত বাকি থাকে? সারা সপ্তাহটাই যদি বুধবার হত, ভাবো দেখি কি মজা হত!

গত সপ্তাহে উপদেশটা দিয়ে তুমি ভালই করেছিলে। ক্ষ্যাপা মেয়েটা এখন অনেকখানি শান্ত; সবিনয়ে সে তোমাকে নিবেদন করতে চায় যে, তোমার মন্তরে ফল হয়েছে অব্যর্থ। প্রিয়, তোমাকে ভালবাসি।

তোমার বুড়ী বউ এথেল

প্রিয়তম, ১লা অক্টোবর, ১৯৫১

সপ্তাহের শেষ দিনটা চলে গেল। তবু তোমার কোন খবর নেই। অবশ্য, তুমি সেই যে কার্ডটা পাঠিয়েছিলে, তাই দিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিলাম। এমন সময় দেখ কাণ্ড! বিকেলবেলায় একগাদা অভিনন্দন—একেই বলে কপাল। সকালে যখন ঘুম ভেঙে উঠি, আমার হৃদয়ে থাকো তুমি। তুমি থাকো বলেই আমার সমস্ত অন্তর মধুময় হয়ে ওঠে। রোজ রাত হলেই আমি নিজেকে সঁপে দিই তোমার হাতে। আর সারাটা দিন আমার হৃদয়ে গুন্ গুন্ করে গানের একটি কলি: 'আমাকে ভালবাসে একজনাই।'

২রা অক্টোবর, ১৯৫১

প্রিয় আমার, 'ন্যাশনাল গার্ডিয়ান' পড়লাম। লেখাগুলো চমৎকার হয়েছে। আমরা যে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পাবো—এ বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে গেল। দল বটে ডজার্স! সমস্তক্ষণ বসে উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁত দিয়ে দশ আঙুলের নখ খুঁটেছি। ডজার্স পক্ষে দশ গোল, বিপক্ষে গোল্লা—একেবারে যাকে বলে গোহারা। ওদের এই অদম্য মনোবলের জন্যেই লোকে ডজার্স বলতে অজ্ঞান। ওদের সব চেয়ে বড় গুণ হল এই যে, নিজেদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য ওরা ঘুচিয়ে দিয়েছে। ইহুদী নববর্ষের এই দিনাবসানে আমাদের জন্যে, আমাদের দুই শিশুর জন্যে আমি কামনা করি—শেষ হোক, ভয় আর যন্ত্রণার পালা শেষ হোক।

এখানকার এই কাটখোট্টা আবহাওয়ার মধ্যে আজ ইহুদী প্রার্থনাসভায় যখন বেজে উঠছিল শিঙা, তখন এমন একটা অনুভূতি হচ্ছিল কি বলব। এক সুপ্রাচীন জাতির আমি বংশধর; মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে তাদের দান চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। সেই পূর্বপুরুষদের জন্যে আমি গর্বিত। চিরদিন তাদের সঙ্গে চিহ্নিত হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

প্রিয় আমার, আজকের মত বিদায়; তোমার বাহুলতায় আমার সমস্ত স্বপ্ন মঞ্জরিত হবে। ভালবাসা।

এথেল

প্রিয়তম জুলি, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫১

আমি এমন ক্ষুধিত হয়ে উঠব কখনও ভাবিনি। আমাকে পেয়ে বসেছে অসহ্য বাসনা। মৃত্যুকে এক গণ্ডূষে পান করব বলে গলা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। না তা নয়। আসলে মৃত্যু যতই ছায়া ফেলে, ততই আমার মধ্যে জীবনের উদগ্র শিখা লেলিহান

হয়ে ওঠে—জয়ের জন্যে, জীবনের জন্যে ততই আমি নতুন করে প্রেরণা পাই।

প্রিয় আমার, তোমাকে আর ছেলে দুটোকে ছেড়ে বেদনায় মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে উঠছে আমার হৃদয়। প্রত্যেক মা-র মধ্যে যে বাসনাগুলো থাকে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে কামনাগুলো থাকে—মন থেকে সেই কামনা-বাসনাগুলো সরিয়ে রাখতে ক্রমেই কষ্ট হচ্ছে। আজও আশায় আশায় আছি—কিন্তু ক্রমেই যেন ভুলতে বসেছি সে আশা যেকোন দিন দপ্‌ করে নিভে যেতে পারে।

শুধু তুমি আমায় ভালোবেসো, প্রিয়তম আমার; আমি তোমার সহধর্মিনী।

তোমার অনুরাগিনী এথেল

প্রিয়তমা, ৭ই অক্টোবর, ১৯৫১

ক্রমেই এই একঘেয়ে জীবন অসহ্য ঠেকছে। বই খুলে বসি কিন্তু একটানা বেশীক্ষণ মন বসে না। তাস খেলতেও আর তত ভাল লাগে না। শুধু সোয়াস্তি পাই যখন তোমাকে চিঠি লিখি, দেয়ালের গায়ে তোমার মিষ্টি মুখের দিকে তাকাই, ডাকি 'হে সুন্দরী!' আর দূরে থেকে তোমার দিকে ছুঁড়ে দিই একটি ব্যাকুল চুম্বন। আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই তোমার মুখ—তোমার সেলের গরাদগুলোর পেছন থেকে তুমি যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছো। অন্তত আর কয়েকটি দিন পরই আমরা মুঠোর মধ্যে পাবো একটি ভাঙা প্রহর—বুধবারের একটি ঘণ্টা।

বাড়ি থেকে কেউ দেখা করতে আসেনি। ম্যানিও নয়। মনটা খারাপ হওয়ার আরও একটা কারণ আছে—ছেলেদুটোকে এর মধ্যে একটিও চিঠি লিখিনি, ওদের কি কথা লিখব ভেবে পাচ্ছি না। দুনিয়ার যিনি মালিক তিনি জানেন ওরা আমার হৃদয়ের

কতখানি জুড়ে আছে—মাইকের ইস্কুলের খবর, বাড়ির খবর, ওরা কেমন আছে জানতে ইচ্ছে করে।

কাগজে দেখলাম: নিউ ইয়র্কের বিচারকের আসনে মনোনীত এক বিপক্ষীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কের বার এসোসিয়েশন নাকি শীগ্‌গিরই প্রতিবাদের ঝড় তুলবে; তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাকি সম্প্রতি এক বিখ্যাত মামলায় অসদাচরণ করেছে। বোঝাই যায়, ব্যক্তিটি সেপোল ছাড়া কেউ নয় এবং আমার বিশ্বাস এখানে আমাদেরই মামলার কথা বলা হচ্ছে।

কিবা আসে যায়, এথেল—আমি সারাক্ষণ ভাবি যে জীবন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি সেই জীবনের কথা। আমি ফিরে চাই সেই জীবন। কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তার মুখ ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো—সেই ভবিষ্যতেই আছে আমাদের বাঞ্ছিত মুক্তি। তোমাকে ভালবাসি।

জুলি

প্রিয়তম,

৭ই অক্টোবর, ১৯৫১

বলেছিলাম সকাল ছ'টায় ডেকে দিতে। ডেকে দিয়েছিল, কিন্তু সাতটার আগে বিছানা ছেড়ে নড়িনি। বোধহয় আমি এখানে আর একটি দিনেরও মুখদর্শন করতে চাইনি। কিন্তু এখন আমি কথা বলছি তোমার সঙ্গে; বাইরেটা এরই মধ্যে ফর্সা হয়ে উঠেছে। রাত্তিরে ঘরে তালাবন্ধ হবার আগে বাইরে রুটির টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলাম। সকালে দেখি পাখীর দল রুটির টুকরোগুলো নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওদের সুন্দর কাকলি শুনে আমার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে।

ছেলেদের কাছে একটি চিঠি লিখতে সবে শুরু করেছি। কালকের মধ্যে ডাকে দেবোই দেবো। বৃষ্টি দেখে রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের বৃষ্টির ওপর লেখা কবিতাটা মনে পড়ে গেল—কয়েকটা লাইন ওদের

চিঠির মধ্যে লাগিয়ে দিলাম। আর সেই সঙ্গে মাইকেলকে বলেছি ও যেন লাইব্রেরী থেকে বই এনে ষ্টিভেনসনের কবিতাগুলো পড়ে নেয়। তোমাকে দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছি। ভালবাসা নিও, প্রিয়তম।

এথেল

আশ্চর্য এথেল,

১১ই অক্টোবর, ১৯৫১

কাল আমি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তোমাকে যখন দেখি তখন স্বভাবতই আমি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। তাছাড়া আমাদের উকিল তার লেখা যে আশ্চর্য জবানবন্দী পড়ে শোনাল, তাতেও খুব মেতে উঠেছিলাম।

শুনে খুব ভাল লাগল আমাদের সমর্থনে বহু সাচ্চা মানুষ এগিয়ে আসছেন ; আমাদের পক্ষ থেকে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে, সেই কমিটি ক্রমেই ফুলেফেঁপে উঠছে। প্রিয়তমা সহধর্মিণী আমার, সাহসে বুক বাঁধো। আমাদের মুক্তির জন্যে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হচ্ছে। কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, কবে তোমাকে নতুন অবস্থার আরও সব খবর দিতে পারব—সেই আশায় পথ চেয়ে আছি।

তোমার চিরদিনের জুলি

প্রিয়তম জুলি,

১১ই অক্টোবর, ১৯৫১

কাল তোমার সঙ্গে আর ম্যানির সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ কিছুতেই ভুলতে পারছি না। জুরীদের রায় ছাড়া আমরা মুক্তি পেতে পারব না—একথা শুনে অবধি সত্যি দমে গিয়েছিলাম। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক বেশী মাটিতে পা রেখে ভাবতে পারছি। ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না বলে, জেলের ভাষায়, 'ঠিক

মনে লাগছে না'। তাই এখনও বোকার মত জেলে বসে স্বপ্ন দেখছি।

দুজনে বাহুতে বাহু মিলিয়ে আমরা কাঠগড়ার বাইরে গিয়েছি, আর আমাদের দেখেই ছেলেরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো—কবে সফল হবে আমার সেই দূরন্ত বাসনা! আমাকে পাগল করে সেই ছবি। যত জোরই লাগুক, মন থেকে দূরে টেনে সরিয়ে দিতে হবে এই ছবি। আরও নতুন নতুন লাঞ্ছনার জন্যে তৈরী হতে হবে। রাজনৈতিক চক্রান্তজাল কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে না পারলে এ থেকে মুক্তি নেই। এই পর্যন্ত 'মন তো চাইছে, দেহ সাধে বাদ'। 'চাই ধৈর্য আর সহনশীলতা'—বুচ লাগাডিয়া বলতেন। কিন্তু বড় দুঃখ, বড় জ্বালা আমাদের চারপাশে। তুমি নাও আমার হৃদয়-উজাড়-করা ভালবাসা

একান্ত তোমারই এথেল

প্রিয়তমা, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫১

আমার বোন এথেল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে কথা হল। সব চেয়ে আনন্দের খবর এই যে বাড়ির গোলমাল মিটে গেছে! এখন আবার সকলের সংগে সকলের আগের চেয়েও বেশী ভাব। এতদিনে মা আবার মনে শান্তি ফিরে পেয়েছেন। বন্ধুবান্ধবেরা আবার এখন বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছে; নিজে থেকেই খোঁজ খবর নিচ্ছে।

আমার বোন এথেল তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছে কিনা জানি না। ঘটনাটা মাইকেলকে নিয়ে। মাইকেল একদিন একটি ছেলের বাড়িতে গিয়ে তার মাকে আমাদের দুজনের কথা বলে। শুনেই সে ভদ্রমহিলা মাইকেলকে তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বার করে দেন। ঘটনাটায় মাইকেলের মনে খুব লেগেছিল। বাড়ি এসে

ও কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাড়ির লোকজন ওকে বোঝায়ঃ কিছু কিছু লোক আছে, যারা অজ্ঞ এবং অন্ধ। তাতে মাইকেল আশ্বস্ত হয় এবং খানিক পরেই তার মনমরা ভাব কেটে যায়।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে মাইকেলের ইস্কুলে মন বসেছে। যিনি ওদের পড়ান, মাইকেল তাঁকে খুব পছন্দ করে। ইস্কুলে যে পড়া দেয়, তা সে বেশ খুশী হয়ে করে। এখন যখন একটা কমিটি তৈরি হচ্ছে, তখন বললে নিশ্চয়ই তারা ছেলেদুটোর ভার নিতে রাজী হবে। বেশ কিছু লোককে ওদের ব্যাপারে আগ্রহ নিতে দেখলে ওরা অনেকখানি ঘা সামলে উঠবে।

এ সপ্তাহের 'গার্ডিয়ান' দেখব বলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এ সংখ্যায় প্রস্তাবিত কমিটির কথা থাকবে। ফাঁসীর সেলে তোমার দেড় বছর হয়ে গেল। বাকি ছ'মাসে সুদিন আসবে।

একান্ত তোমার জুলি

প্রিয় আমার, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫১

তোমার বোন এথেলের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল; কিন্তু আজ সারা দিনের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগল তোমার লেখা চিঠিখানা। নতুন বিয়ে-হওয়া বর-বউ নই আমরা। বুড়ো হতে চললাম। সেদিক থেকে ব্যাপারটা পুরনো হয়ে যাবার কথা; কিন্তু তবু যখনই তুমি তোমার ভালবাসা জানিয়ে চিঠি লেখো, গর্বে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, আনন্দে আত্মহারা হই।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৫১

মাইকেলের কথা মনে করে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। একরত্তি একটুখানি ছেলে তাকেও সইতে হচ্ছে বর্বর নিষ্ঠুরতা। যে কারো ক্ষতি করেনি, সেই অসহায় শিশুকে যখন কেউ পশুর মত যন্ত্রণা দেয়,

তখন সেই অমানুষতা দেখে আমরা শিউরে উঠি। যখন দেখি মানুষের সামান্যতম অধিকারগুলোকে পর্যন্ত পদদলিত করে উত্তাল হৃদয়হীনতা আজ আস্তে আস্তে গোটা দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, খুব বেশি অবাক হই না। ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রিয়তমা এথেল, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৫১

মাইকেলের সঙ্গে কবে দেখা হবে, সেই আশায় আমি পথ চেয়ে বসে আছি। ওর কাছে শুনতে চাই ওর নবলব্ধ বন্ধুদের কথা। এবার অবশ্য খালি হাতেই ওদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। তার বদলে এবার নিয়ে যাব ঝুড়ি। একটা কথা ভাবছি—ওয়ার্ডেনকে বলে দেখলে হয়, আমাদের উকিল যখন সঙ্গে থাকছে তখন ছেলেদের সঙ্গে আমাদের দুজনকে একত্রে দেখা করতে দেওয়া হোক।

দেখা হবার পর 'গার্ডিয়ানে'র পরের সংখ্যার জন্যে আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করব—আশা করছি পাঠকদের লেখা আরও চিঠি বেরোবে।

মামলা শুরু হওয়ার আগে, মামলা চলতে থাকার সময় এবং শেষ হয়ে যাবার পর আমরা যা বলেছি তাই ঘটছে। না ঘটে পারে না। যত যাই হোক, আসলে চূড়ান্ত আদালত এবং চূড়ান্ত বিচারক হল আমেরিকার জনসাধারণ। আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের জীবন—সব কিছুর রক্ষাকর্তা তারাই।

সুখী হওয়া সম্ভব কিনা জানি না, তবু আজ এ অবস্থাতেও আমি সুখী। আমরা দ্বিধায় দুলিনি, যতটা আশা করেছিলাম ততটা পথই উত্তীর্ণ হয়েছি। প্রিয়তমা, শক্ত ধাতু দিয়ে আমরা গড়া।

তোমারই জুলি

প্রিয়তম,　　　　　　　　　　　　　১৮ই অক্টোবর, ১৯৫১

দুদিন আগের কথা। গরাদের ফাঁক দিয়ে সেদিন আমি প্রাণ ভরে তোমাকে দেখেছি। সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যাটার কথা মনে পড়ে গিয়ে কি ভাল যে লাগল—সেই যখন জুরীর দল আমাদের ভাগ্য নির্ণয় করছিল আর আমরা কিছুতেই আশা ছাড়িনি। তারপর কত দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথে আমাদের যাত্রা। ব্যথায় বিদীর্ণ হয়েছি, যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছি, তবু কেন যেন এই বিশ্বাস আমি কখনও হারাইনি: গর্বে মাথা উঁচু করে শুধু মহৎ মানুষেরাই এই দারুণ কণ্টকিত পথ দিয়ে যায়।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৫১

সোমবার ছেলেরা আসছে কিনা বুঝতে পারছি না। বাড়ি থেকে এখনও কোন খবর নেই। আগে যে রকম অস্থির হতাম, এখন আর অতটা অস্থির হই না। একেকটা সময় আসে যখন কোন ভাবান্তর হয় না—আনন্দ আর বিষাদের মাঝামাঝি ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে থাকা একটা অবস্থা। আসলে কেমন একটা গা-এলানো ক্লান্ত হতাশা আমাকে পেয়ে বসে। আর তারপরই আরও তীব্র, আরও বেদনার্ত আশাহীনতায় দম বন্ধ হয়ে আসে। মন যাতে শান্ত হয় তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে আরেকবার লড়াইয়ে নামি।

প্রিয়তম, 'গার্ডিয়ান'-এর লেখাগুলো আবার পড়ছি। এক আশা হচ্ছে তবু জয় আমাদের হবেই, ছাড়া আমরা পাবোই—এছাড়া অন্য আর কি বলব। ভয় যে পাই না তা নয়। ভাবতেই পারি না। ভালবাসা।

এথেল

প্রিয়তমা,　　　　　　　　　　　　　　　　　২১শে অক্টোবর, ১৯৫১

যা হোক, কাল ছেলেদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে। মাইকের ব্যাপারটা এলোমেলোভাবে সবিস্তারে জানিয়ে লেনা বোধ হয় তোমাকে চিঠি লিখেছে। যা ভয় করেছিলাম, জিনিসটা হয়েছে তার চেয়েও খারাপ। মাইক এবং সমাজকর্মীটিকে নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আশা করছি সে সম্পর্কে ম্যানির সঙ্গে কথা বলতে পারব।

আমার বোনটির কাছে কি তুমি শুনেছো রবী কাদের ভালবাসে? ওর সেই তালিকার মধ্যে কিন্তু আমরা নেই। যখন ওকে জিজ্ঞেস করা হল বাপি আর মা-মণির কথা, ও জবাব দিল: 'কেন, ওরা বাড়ি আসে না কেন?' লেনাকে রবী বলেছিল, আমাদের যেন লেনা বাড়িতে নিয়ে যায়। যখন ওকে বলা হল জেলে আমাদের সঙ্গে ওকে দেখা করতে আসতে হবে—রবী তো বেজায় খুশী। ছেলেদের কষ্টের কথা ভেবে একেই শান্তি পাই না, তার ওপর তুমি কষ্ট পাচ্ছো ভেবে আমার যন্ত্রণার অন্ত নেই।

হে ভালোমানুষের দল, ব্যগ্রতা করে বলছি—তোমরা আছো, আমরা আছি, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করো। এই নৃশংস চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে ফেল। আমি জানি আমরা ছাড়া পাবো। সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুক্তির দিন আমি ঘনিয়ে আনতে চাই।

তোমার প্রেমমুগ্ধ জুলি

প্রিয়তম আমার,　　　　　　　　　　　　　　　২২শে অক্টোবর, ১৯৫১

আজ রাত্রে আমি কেঁদে ভাসিয়েছি। কান্না আরও তোলা আছে। ছেলেদের সঙ্গে দেখা করে যখন ফিরে এলাম, মনে হল সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজকের মত আর কোনদিন নিজেকে এত অসুখী মনে হয়নি।

ছেলেদের দেখব বলে যতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম, ততক্ষণ একটা নির্লিপ্ততার ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে ছিল। আর এখন মনে মনে যতই ভাবি না কেন রবীর মারকুটে ভাব আর মাইকেলের দুশ্চিন্তার বাতিক সে অবস্থাটার ওপর আমার কোনই হাত ছিল না।—তবু বার বার মনে হচ্ছে, হারটা আমারই।

প্রিয়তম, বুধবার যে পর্যন্ত না আমি আমার আর্ত বেদনা আর ভগ্ন আশার ডালি তোমার কাছে উজাড় করে দিচ্ছি, সে পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। প্রিয়তম, তোমাকে ভালবাসি।

তোমার দুঃখে ম্রিয়মান স্ত্রী এথেল

প্রিয়তম জুলি, ২২শে অক্টোবর, ১৯৫১

ছেলেদের সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, বুদ্ধি থাকলে কেউ তা করে না। গা জ্বলে যায় ভাবলে। প্রিয়তম, দ্বিধাহীন ভাষায় এবার আমাদের কথাগুলো সোজাসুজি জানিয়ে দিতে হবে। আর দেরি করার মানে হয় না। যা আমি জানি, ওরা জানে না—ওদের কাছে খুলে বলতে হবে। একমাত্র তাহলেই ছেলেদুটোর দেহমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠার আশা থাকে। এত কথা আমি জানি যে তার ভারে আমি অস্থির হয়ে পড়ি—কিছুতেই আমি নিজের কাছ থেকে সরিয়ে ভাষায় তাকে রূপ দিতে পারি না। ততদিন প্রিয় আমার, এসো দুঃখের বোঝা ভাগ করে নিই। তোমার জন্যে বড়ই মন কেমন করে, আমি তোমাকে একান্তই চাই। হায় ভগবান, আমি এত অসুখী! ভালবাসা নিও।

এথেল

প্রিয়তমা স্ত্রী আমার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫১

তোমার চিঠি না পেলে আমার ছটফট করে দিন কাটে। আমি জানি সারাক্ষণ তুমি শুধু একটি কথাই ভাবছ—ছেলেত্বটো শরীরে আর মনে কি কষ্টই না পাচ্ছে। ত্বজনে মিলে আমরা ওদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্রটা তৈরি করেছি একটুও দেরী না করে এখুনি তা কাজে লাগাতে হবে। ওদের মানুষ করার জন্যে একজন বিশেষ সমাজকর্মীর সাহায্য দরকার।

এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার আগেই হয়ত আমরা আপিল আদালত থেকে নথিপত্র পেয়ে যাবো! তুমি সেগুলো যদি খুঁটিয়ে পড়ে কিছুটা মতামত লিখে রাখো ভাল হয়। মুখে মুখে সওয়াল জবাব করার সময় তা থেকে ব্যবহারযোগ্য কিছু কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

নিরপরাধ মানুষের পক্ষে মাথার ওপর মৃত্যুর খাঁড়া নিয়ে বসে থাকা কিছুতেই ভেঙে না পড়া—সহজ কথা নয়। কিন্তু প্রিয়তমা তার নীচে মাথা পেতে দেব না বলেই তো আজ আমরা এখানে। মানুষের মর্যাদা আর স্বাধীনতার জন্যে, শান্তি আর সত্যিকার ন্যায়বিচারের জন্যে প্রগতির যে পতাকাবাহীরা লড়ছে, তাদের সকলের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো।

'সাহস, বিশ্বাস এবং লক্ষ্য'—প্রিয়তমা, আমাদের সেই আদর্শ মনে রেখো।

তোমার প্রেমমুগ্ধ স্বামী জুলি

প্রিয়তম, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫১

শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল, আমি ধৈর্য রাখতে পারিনি। তার জন্যে সত্যিই ত্বঃখিত। তার আগে কদিন একটানা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে মগজের ভেতরটা দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। তার ঠিক

পরই তোমার সঙ্গে দেখা। ইদানিং আমি ডাকযোগে যেভাবে কপাল চাপড়াচ্ছি, তাতে হয়ত আমি তোমার কাছে দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছি। দোহাই তোমার, অরেকটুকু ধৈর্য ধরো। চিন্তায় চিন্তায় আমার খানিকটা মাথার ঠিক নেই—আদালতে ছেলেদের হাতে তাদের বাঞ্ছিত দিনটি তুলে দেবার জন্যে আমি সংকল্পবদ্ধ। (যা দেখছি বেরোব উকিল হয়ে ; আইনের নথিপত্রগুলো আমার হাড়ে-মজ্জায় মিশে যাচ্ছে।) ভালবাসা নিও।

এথেল

জুলি প্রিয়তম, ১লা নভেম্বর, ১৯৫১

বুধবারের পর থেকে আনন্দে মাটিতে আমার পা পড়ছে না। সেই যে আমরা বসে বসে মধুর আলাপ করলাম তার পর থেকে। প্রিয় আমার, সুখে নিদ্রা যাও। তোমার প্রেম আমার দুর্গ।

আশা করছি এ সপ্তাহের শেষে মন শান্ত করে মাইকেল আর রবীকে কয়েকছত্র চিঠি লিখতে পারব। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পাঠকদের কাছ থেকে প্রচুর চিঠি এসেছে, আমাদের ছেলেদের তারা সাহায্য করতে চায়। 'অপরিচিত' মানুষের প্রতি আমি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করছি। আমার নবলব্ধ ভাইবোনদের দিকে আমি মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে আছি। তীব্র আবেগে আজ আমার বাক্রুদ্ধ। তোমাকে ভালবাসি।

এথেল

প্রিয়তমা, ১লা নভেম্বর, ১৯৫১

তোমাকে আজ হাসিখুশি দেখে দারুণ ভাল লাগল। যখন তোমাকে দেখি মনের মধ্যে জোর পাই, আনন্দে মেতে উঠি! তারপর

আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত আরও একটা সপ্তাহ হাসিমুখেই ঠেলে নিয়ে যাই।

নিরবধি কাল যেন বুকে হেঁটে চলেছে আর বস্তু-বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে আমরা যেন দিন কাটাচ্ছি অতলস্পর্শ কোন খাদে। সম্পর্ক শুধু তোমার সঙ্গে, ম্যানির সঙ্গে আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে—এই সম্পর্কটুকুই বার বার টেনে হিঁচড়ে আমাকে জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনে।

ছেলেদের ব্যাপারে কতটা কি কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে জানতে পারলে আমি ঢের বেশি খুশি হবো। তাছাড়া কমিটির কাছ থেকে যদি ভাল খবর-টবর আসে তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের মামলাটা সম্পর্কে যার মারফৎ সত্যিকার ঘটনাগুলো পেশ করা হচ্ছে, আমাদের দরকার সেই জীবন্ত জিনিষটার অঙ্গ হওয়া।

আরও একটা দিন, সপ্তাহ, মাস—দেরি নেই আর দেরি নেই—এ জিনিষ চিরদিন চলতে পারে না। যত দিনই চলুক, আমার সন্দেহ নেই আমরা সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ প্রতিপন্ন হবো। আমি ভাবি, আমি স্বপ্ন দেখি—সত্যি, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই তোমাকে বাড়ি নিয়ে চলেছি—আর তোমাকে পেয়েছি আমি সম্পূর্ণ আমার দখলে। প্রিয়তমা, সেই তো জীবন, বলবর্ধক, কল্যানী জীবন। আমরা ঠিক দেখে যাবো সেই দিন। ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ১১ই নভেম্বর, ১৯৫১

এ সপ্তাহের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা পড়লাম। 'চিঠিপত্রে'র স্তম্ভে বিভিন্ন পত্রলেখক যেভাবে গুণের পরাকাষ্ঠাসূচক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তাতে লজ্জা পেলাম। এ থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তা এই যে, চিঠিগুলো যাঁরা লিখেছেন এবং শহরে আর যে হাজার হাজার

মানুষ আছেন আমরা তাঁদেরই মত আটপৌরে সাধারণ মানুষ। অনেকদিন থেকেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের মিল রয়েছে। আমাদের ভেতর দিয়ে তাঁরা নিজেদেরই খানিকটা খুঁজে পান। তাঁরাও একই সর্বনাশের সম্মুখীন—এই কথা তাঁদের মনে জাগে।

একটি ১৬—পেজী বই বেরিয়েছে। বলতে গেলে সত্যিকার মুখপাত হল এই বই দিয়ে। আমরা স্বচ্ছন্দে ভেবে নিতে পারি, এবার আমাদের সমর্থনে আন্দোলনের ঢেউ ক্রমেই উত্তাল হবে। সমস্ত জটিল জাল ছিন্ন করে বিজয়গর্বে আমরা বেরিয়ে আসব—আমার মধ্যে এই সংকল্প ক্রমেই জোর বাঁধছে।

আজ যুদ্ধশান্তির স্মৃতিবার্ষিকী। যুদ্ধে যারা জীবন দিল, তাদের কথা আজ প্রত্যেককে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে—যাতে সবাই ভাল বুঝতে পারে বিশ্বশান্তি কেন দরকার। যুদ্ধবাজদের নিখিল বিশ্ব দাবা-খেলায় আমরা দুজনে সামান্য হলেও চিত্তবিক্ষেপের কারণ তো বটে।

আজ সোমবার। দিন কাবার হয়ে এখন রাত্তির। মধ্যে আর একটা দিন, তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দিন দিন তোমাকে ভাল লাগছে—একদিন মালা বদল করে নেবো, কি বলো?

একান্ত তোমার জুলি

সুপ্রভাত প্রিয়তম, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫১

এইমাত্র তৃপ্তি করে সকালের খাবার খেলাম। এখন সবে সাতটা তিরিশ। কিন্তু এরই মধ্যে জেলখানার তামাম জেনানা-মহল জুড়ে আমাদের হাসির গমক ছড়িয়ে পড়েছে। সকালে উঠেই যখন একটি মিষ্টিমত মেয়েকে* হাতের কাছে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে কথা

*জেলখানার একজন মেট্রন

বলে হাল্কা হওয়া যায়, হাসি ঠাট্টা করে সহজ হওয়া যায়—কি ভাল যে লাগে। এখানে অমন মেয়ে আর একজনই আছে। ওদের দুজনের কাছে আমি সত্যিই ঋণী।

তোমার শেষ চিঠির প্রত্যেকটি কথা আমি তারিয়ে তারিয়ে পড়েছি। ভালবাসা জেনো।

এথেল

প্রিয়তম আমার, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫১

দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় নিয়ে তুমি চলে যেতেই আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। তারপর সারা বিকেল আর সারা সন্ধ্যে একবার আশঙ্কায় দুলেছি আর তার পরক্ষণেই আবার সংকল্প নিয়েছি মন শক্ত করব। আমার মাথা ধরে ছিঁড়ে যাচ্ছিল পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম, যখন ঘুম ভাঙ্গলো, খুব ফুর্তি হল—আবার আমি শুধু মাত্র মনের জোরে এবং বুদ্ধির জোরে অবস্থার মোড় ফেরাতে পেরেছি। এখন আমি সিভিক্স্ কলেজের (যাকে তুমি বল সি-সি*) নামকরা ছাত্রীর মতই হাত-পা ছড়িয়ে বসে আরাম করছি। ভালবাসা নিও।

এথেল

প্রিয়তম জুলি, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫১

শীতের আকাশ। কনকনে বাতাস বইছে। তারই মধ্যে উঠোনে জোরে জোরে পা ফেলে আমি হাঁটছি। যেন আমি মাটিতে পা ঘষে ঘষে ক্রমবর্ধমান আতঙ্ককে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে চাইছি।

*কন্‌ডেম্‌ড সেল—ফাঁসীর সেল

মর্যাদাবান মানুষের দুর্জয় সাহসকে যারা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে আমি যেন তাদের হাত আমার পায়ের নিচে পিষে ফেলতে চেয়েছি। যে পরাক্রান্ত নির্জনতার সঙ্গে আমার নিরন্তর নিদারুণ লড়াই, সেই একাকিত্ব বিনা বাধায় আজ আমাকে পেয়ে বসল। আমার সর্বাঙ্গে তার দাঁত গভীর হয়ে কেটে বসল। আমি যন্ত্রণায় না কেঁদে পারলাম না। হায়, কবে আমি সেই সুখ আনন্দ ভাগ করে নেবো, যে সুখ যে কোন পুরুষ আর যে কোন রমণীর নাগালের মধ্যে।

'ভদ্রলোকের চুক্তি' বইটা পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে মনে হল কিভাবে আমি একদিন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম ভাববিনিময়ের জন্যে, অন্য মানুষের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক পাতাবার জন্যে।

আজ সোমবার। এখন সকাল। রবিবারের একঘেয়েমি ঘুচলো। আমার সব সময় বিষম তাড়া অন্য কোথাও যাবো বলে—একটি দিনের সঙ্গে তার পরের দিনের দুরন্ত ব্যবধান আমাকে অস্থির করে তোলে। প্রিয়তম, কোথায় সেই মন্ত্র যার জোরে আমার দুঃখের রাত্রি শেষ করে এখুনি সুখের দিন ফিরে পাবো?

ভালবাসা নিও। সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে চুম্বন করছি।

এথেল

আপীল-নিম্ন আদালতে

মধুমতী, ২২শে নভেম্বর, ১৯৫১

ম্যানির সঙ্গে সলাপরামর্শের পালা চুকে গেল। এখন কি মনে করছ তুমি? বাড়ি যাওয়া ছাড়া আর কিছুই আমাদের চাইবার নেই। আমাদের তরফে সোৎসাহে কাজ চলছে, সেই সঙ্গে আরও একটা ভাল খবর—বাড়ির ঝামেলা মিটেছে। মনে হচ্ছে, এই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে আবার আমি যেন সার্থক জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল তোমারও যেন তেমনি একটা অনুভূতি হচ্ছে। একেতো আমরা নিরপরাধ, তার ওপর নিরপেক্ষভাবে কেউ যদি একবার আমাদের জবানবন্দীটা পড়েও দেখে —তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা না করে সে পারে না।

খেতে বসে মুর্গীর মাংস দেখে মনে পড়ে গেল আজ ভগবানকে ধন্যবাদ জানাবার দিন। আমরা যে আজও বেঁচে থেকে ন্যায়ের জন্যে, শক্তির জন্যে, মহত্তর জীবনের জন্যে লড়তে পারছি, তার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার বৈকি। এথেল, প্রিয়তমা আমার, এই দুর্বহ বোঝা বইবার শক্তি চাই আমরা। আমার মনের জোর তোমার প্রতি আমার ভালবাসা—এই লোহার গরাদগুলোর চেয়ে অনমনীয়। তুমি চিরদিন আমার, একমাত্র মৃত্যুই আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

তোমারই জুলি

প্রিয়তমা এথেল আমার,　　　　　　　　২৯শে নভেম্বর, ১৯৫১

খুব সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বই: 'ডজনদরে শস্তা'। পড়লে সময় কাটে, কিন্তু সব চেয়ে মন খুশী হয় এক বাজি দাবা খেললে। আমার দাবাখেলাকে পলায়নী বৃত্তি বলে মনে হতে পারে। যা কিছুই আমাদের কারাবাসের যন্ত্রণা কমিয়ে দেয় তার সব কিছুরই দাম আছে আমাদের কাছে।

ক্যাল্-এর সঙ্গে কাল পুরো তিনঘণ্টা খেলেও চাল মাৎ হয়ে গেল। একেবারে শেষ চাল পর্যন্ত খেলাটা দারুণ জমেছিল। যাহোক আজ রাত্তিরে পর পর দুবারই অল্প সময়ের মধ্যে আমি ওকে হারিয়েছি। মোটামুটি হিসেবে আমরা সমান। ওর সঙ্গে খেলতে খুবই ভাল লাগে। হলে হবে কি, শীগগিরই ও গাদা গাদা আইনের কাগজ পাবে। আর মাঝের থেকে আমাকে একজন খেলার সাথী হারাতে হবে।

আমাদের মামলার ব্যাপারে যে চটি বইটা বেরিয়েছে, শীগগিরই সেটা আমরা পেয়ে যাবো বলে আশা করছি।

আমাদের বহু কিছু আজ বিপন্ন, দেশে ন্যায়বিচার ডুবতে বসেছে দেশের মানুষের কাছে সে বার্তা পৌঁছে দেবার জন্যে বিরাট প্রচেষ্টা চাই।

তুমি কি টের পাও দিনের মধ্যে কত বার যে আমি টেবিলে বসে দেয়ালের গায়ে তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি, তোমার সঙ্গে কথা বলি? সত্যি প্রিয়তমা—ভাবনা আমারও হয়, কখনও কখনও সন্দেহ জাগে কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কেননা আমাদের একটি মাত্রই ভবিষ্যৎ—আমরা বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরে যাবো। আমাদের অপরাধ না থাকাই আমাদের মোক্ষম অস্ত্র। সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে ভালবাসি।

জুলি

পরম প্রিয় আমার, ২৯শে নভেম্বর ১৯৫১

তুমি চলে যাবার পরই আমাকে ছেঁকে ধরল একাকিত্ব। আমার বুকের মধ্যে থেমে থেমে বাজতে লাগল প্রশ্ন : মানুষের হৃদয় যন্ত্র কতটা সহ্য করবার পর চৌচির হয়ে ফাটে? সহজাত বৃত্তিগুলো মুক্তির পথ না পেয়ে কতদূর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে থাকতে পারে? কিসে সেই বঞ্চিত মুক্তি মিলবে? তোমার ভাবনা আর ছেলেদের ভাবনা ছিল বিকট যন্ত্রণার মত। কিন্তু আজ রাত্রে ঝড় শান্ত। এখন আমাকে ঘিরে শান্তি—

৩০শে নভেম্বর ১৯৫১

প্রিয় ভেবো না—আমার শরীর ঠিক আছে। গুমোট ঘর পশমের মোজা এবং রবারের জিনিস—আমার অভাব নেই। ওসিনিং অঞ্চলের শীত সহ্য করার জন্যে আমি আপাদমস্তক তৈরি। এখানে যত দিন যাচ্ছে ততই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, জেলখানা বাসিন্দা হিসেবে যুৎ করতে হলে অনেকদিন ধরে তালিম নেওয়া দরকার! কিন্তু তার জন্যে আবার মোটা টাকা লাগে। 'জোন্স-দের সঙ্গে সমান তালে চলো'—এমন কি সিং-সিং মৃত্যুপুরীতেও এই মহৎ ধারণা না হয়ে পারে না।

তোমার সঙ্গে কথা বলে কি খুশী যে হই। শুধু ভাবি, হল্‌টা পেরোলেই যখন তোমাকে পাওয়া যায়, এই অখদ্যে কাগজ-পেন্সিল-গুলোয় কি কাজ আমার? একান্ত ভালবাসা।

এথেল

প্রিয়তম আমার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫১

উপহার হিসেবে ছেলেদের আংটি দিতে চেয়েছো তুমি। তাতে আমারও খুব সখ। তুমি ওদের দেবে আর আমি দেখব ওদের আঙুলে

আমাদের ভালবাসার অভিজ্ঞান। ছেলেদের কথা, আমার মার কথা এবং আরও পাঁচজনের কথা তুমি কতই না ভাবো—আমি তোমার জন্যে আমার উপহার জমিয়ে রাখবো। যতদিন না আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরি, যতদিন না আবার বেঁচে উঠি—ততদিন তোমার উপহারটা তোলা থাকল। আমি বেজায় আশাবাদী।

চিরদিন তোমার জুলি

প্রেয়সী আমার,

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৫১

আমার বাড়ির লোকজনেরা যখন অবিচল সাহসের জন্যে আমাদের প্রশংসা করে, তখন আমার কেমন লজ্জা করে, নিজেকে ছোট মনে হয়। কিন্তু সেইসঙ্গে আমার নিজেদের জন্যে গর্ব অনুভব না করে পারি না।

লেনা বলছিল পাড়ার লোকেরা ক্রমেই নানাভাবে জানতে আরম্ভ করেছে যে তারা আমাদের বন্ধু। মা দিন দিন ভাল লোকেদের সাহায্য অনুভব করতে পারছেন। ছেলেরা যাতে ছুটিটা উপভোগ করতে পারে তার অনেক প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে। নতুন নতুন লোক এগিয়ে আসছে। বাচ্চা দুটোকে তারা নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যায়, কখনও কখনও দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়। পিয়ানো শেখার জন্যে মাইকেল আবার গানের ইস্কুলে যেতে শুরু করেছে, ফলে তার বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার একটা সুযোগ পাবে।

কমিটির জবর খবর—কাজ হৈ হৈ করে এগিয়ে চলেছে।

প্রতিশ্রুত দিন আর দূরে নয়। জয় হোক সেই দিনের!

একান্তই তোমার জুলি

প্রিয়তমা,   ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫১

শুক্রবার ছেলেদের সঙ্গে দেখা হবার দিন। অনেকগুলো কাজ দুজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। যদি দেখা যায় রবী চাইছে বেশীর ভাগ সময় ওর দিকেই নজর দেওয়া হোক, তুমি ওকে নিয়েই থেকো। আর সেটা ওর দিক থেকে নেহাৎ দরকারও বটে; আমি মাইক্‌কে সামলাবো। গোড়ায় ম্যানির কাছ থেকে আমি মোদ্দা ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে পারব। মনে রেখো এথেল, সময় খুবই সংক্ষেপ। হাতী ঘোড়া কিছু আশা করে বসো না। আমার বলবার কথা হল, এমনভাবে নিজেকে তৈরী করে নিয়ে যেও, যাতে বড় রকমের আশা ভঙ্গ না হয়।

একথা আমাদের জোর দিয়ে বলতে হবে যে, এই ভয়ঙ্কর অবস্থা শুধু দুদিনের; এটা চুকে গেলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাবো। মাইক্‌কে একবার বলে দেখবে ও যেন বাড়িতে বসে ছবি আঁকে আর মাঝে মাঝে নমুনা হিসেবে আমাদের কাছে পাঠায়। যাতে আগের মত ও আমাদের চিঠি লেখে তারও চেষ্টা করো। ভালবাসা নিও।

জুলি

প্রিয়তম,   ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫১

এ চিঠিটা ভাসা-ভাসা ধরণের হলেও আমি তোমাকে জানাতে চাই তোমার সঙ্গে কথা হবার পর আমি কতদূর কি করেছি। ১৯শে তারিখে ছেলেদের যেন নিয়ে আসে—একথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি ম্যানিকে চিঠি লিখে দিয়েছি। ট্রেন ধরতে যাতে বৃথা সময় নষ্ট না হয়, তারও কায়দাকৌশল বলে দিয়েছি। লিখেছি সোজা ট্যাক্সি নিয়ে যেন ম্যানি বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। তাতে সবাইকে তুলে নিয়ে সটান ষ্টেশনে যাবে। তাড়াহুড়া করে বাড়িতে ভরপেট খাইয়ে

নেবার বদলে ম্যানি যেন রাস্তায় বেরিয়ে ছেলেদের হাতে রুটি মাখন আর ফল দেয়। আমি ওকে লিখেছি, মনে করে যেন ও এখানে পৌঁছুবার আগে ওসিনিং থেকে দুধ কিনে নেয়।

দোকানটা উঠে যাবার কথাও ওকে লিখেছি আর বলেছি ফুঁকো টাকাটা থেকে যেন এই ধরণের কিছু কিছু জিনিষ কেনা হয়—রেকর্ড, বই ইত্যাদি। আর সেই সঙ্গে ছেলেদের জন্যে চানুকা-র পার্বণী। ভালবাসা।

এথেল

প্রিয়তম, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫১

উঠোনে যেমন চাপ চাপ বরফ জমেছে, সারা সপ্তাহ ধরে আমার মনের অবস্থাটাও হয়েছিল তেমনি। তোমার চিঠি পেলাম। আবেগের উত্তাপ দিয়ে লেখা প্রতিটি ছত্র। তার ছোঁয়ায় আজ বিগলিত আমার মন। এখন বুঝছি আমার হৃদয়ের ওপর কঠিন চড়া পড়ে গিয়েছিল।

সপ্তাহের শেষ আজ। কেউ দেখা করতে আসেনি। সারাটা দিন কাটছে একা-একা। তবু ভালো, বরফের ঝড় থেমে গিয়ে আকাশে রোদ হেসেছে। আমার ফাঁসীর সেল্‌টা ঝেঁটিয়ে যেখানে যতগুলো ধোকড়া ছিল গায়ে দিয়ে বরফের মধ্যে সাহসে বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। মিলিটারী কোট আর কাঁধ-উঁচু টুপিতে আমাকে দেখাচ্ছিল গোলগাল বেঁটেখাটো পুলিশের মত। পা টেনে টেনে চলতে লাগলাম। গেলে দেখা যাবে উঠোনে এমন জায়গা নেই বললেই হয়, যেখানে আমার পদচিহ্ন না পড়েছে।

যখন তোমার ভাবনা আর আমার ভাবনা মিলে যায় কি ভালো যে লাগে। আমি মনে মনে ছকে রেখেছিলাম রবীর জন্যে যতটা পারা

যায় বেশী সময় দেবো, যতটা ওর দরকার ততটা নজর ওর দিকে দেবো—তাই বলে মাইকেলকে একেবারে বঞ্চিত করব না। যদি দেখি রবী আরও বেশী আমাকে চাইছে, তাহলে মাইকেলের অভাব পূরণ করার ভার তোমার ওপর ছেড়ে দেবো। কিন্তু আমার সেই মনের কথা তুমি কি করে জানলে ?

তুমি ঠিকই বলেছ। হাতে আমাদের অল্প সময়; তার মধ্যে যে সব জিনিষ হওয়া সম্ভব নয়, তা চাপাবার চেষ্টা না করাই ভাল। তাহলেই আমি ঢের লাভবান হতে পারব এবং ছেলেদেরও তার দরুণ ভুগতে হবে না। তবে মুখে বলতে যত সহজ, কাজে করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যতদিন না ওদের চোখে দেখতে পাচ্ছি মন ক্রমেই উতলা হয়ে থাকবে। ভালবাসা নাও।

এথেল

প্রাণাধিক এথেল, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫১

গত মঙ্গলবার দিন চানুকা-র প্রার্থনার দিন। অনেক পুরণো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। ঠিক দু'বছর আগে বাড়ি বসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামোফোনে একই রেকর্ড বাজিয়ে আমরা দীপান্বিতার উৎসব করেছিলাম। তুমি অনেক বেছে বেছে খেলনা আর উপহার কিনেছিলে আর কত যে আয়োজন করেছিলে মনে পড়ে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা উৎপীড়ন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করে জয়ী হয়েছিলেন—তার স্মৃতি বহন করছে এই উৎসব। এ উৎসব আমাদের ঐতিহ্যের শক্ত একটা খুঁটি, নিজেদের মুক্তি অর্জনের সংকল্পে যা আমাদের দুর্জয় শক্তি যোগায়।

১৯৫২ আমাদের দ্বারে। শুভ বর্ষফল হাতে নিয়ে আসছে নতুন বছর। তুমিই আমার জীবনতৃষ্ণা, প্রিয়তমা। একদিন এই দুঃখের রাত্রি শেষ হবেই। ঝড়ের বেগে আসুক, আসুক সেইদিন।

তোমারই জুলি

প্রিয়তম আমার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫১

উৎসবের দিন সারে সারে যখন বাতি জ্বলছিল, তারে তারে কাঁপছিল সুরের মূর্ছনা—আমি জানি তখন তোমার আমার ভাবনা দুজনের মাঝখানে বিচ্ছেদের পাঁচিল-তোলা দূরত্বে গায়ে মাথা ঠুকছিল। গানগুলোর মধ্যে সে কি নাটকীয় তীব্র আবেগ, সে কি মাধুর্য! ইস্রাইলের মানুষের বিরাট সৃজনী-ক্ষমতা আর তাদের মুক্তি সংগ্রামের শক্তির পরিচয় আছে এই গানে। শুনতে শুনতে আনন্দে আর গর্বে আমার মন ভরে উঠল।

চোখের জল উথ্‌লে পড়লেও সেলে ফিরে এসে লেনা, এথেল আর তাদের পরিবারের কাছ থেকে যখন অভিনন্দন-জানানো কার্ড পেলাম, তখন আনন্দের অবধি রইল না।

চিরদিন তোমারই এথেল

প্রিয়তমা বধূ আমার, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫১

এ চিঠি যখন তুমি পাবে, একটি বছর তখন অতিক্রান্ত—যে বছরটা ছিল আমাদের কাছে দারুণ দুঃসময়। আমার সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ এগিয়েছে। তবে তার পরিমাণ খুবই কম, গতিও আদৌ দ্রুত নয়। আমি বাস্তববাদী, তাই বুঝি কাজটা সহজ নয়। বিচারবিভাগ আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে যে নিশ্চেষ্টতার ভাব এনে দিয়েছে, তা কাটিয়ে তুলতে বিরাট প্রচেষ্টার দরকার। প্রিয়তমা, নতুন বছর তোমাকে দিক সাহস, দিক আরও আত্মবিশ্বাস আর স্বচ্ছ দৃষ্টি।

বোনটির কাছে শুনলাম ছুটিতে ছেলেদের দেখতে অনেকেই এসেছিল। ভাল ভাল অনেক উপহার পেয়েছে, আদর পেয়েছে আর ওরা সঙ্গ পেয়েছে হৃদয়বান অনেক মানুষের। ছুটিটা খুব মজায়

কেটেছে ওদের। অনেকেই এগিয়ে আসছে, হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতে চাইছে। শুনে কি ভাল যে লাগল।

প্রিয়তমা, ছেলেরা এতদিন যা কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে আমরা তাদের দেব। আবারও বলছি, আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। আগামী বছর তুমি হবে আমার শক্ত নির্ভর, আমার প্রেরণা হবে তুমি—জীবনে যা কিছু সুন্দর বলে জানি, তুমি হবে তাই। তোমাকে দিলাম আমার হৃদয়!

জুলি

১৯৫২-শুভকামনা—ভালবাসা—সুখ—স্বাধীনতা—শান্তি!

প্রিয়তমা এথেল, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৫২

আশ্চর্য ছুটি বোন আমার! ওদের পেয়ে কত সুখী আমি। আমাদের তু'জনের প্রতি ওদের অশেষ অনুরাগ। অবিরাম ওরা আমাদের জন্যে খাটছে। লেনা একগাদা খবর দিল, তুমি ভাল আছো, কমিটির কাজ জোরসে চলেছে, আপিসে সব সময় লোক গম গম করছে।

সারা তুনিয়া থেকে বিপুল সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। জনমত সংগ্রহের আন্দোলনে যে যথেষ্ট ফল হচ্ছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখলেই তা বোঝা যায়। রবিবারের 'ডেলি নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ, অসামীপক্ষের উকিল ৮২-পৃষ্ঠার এক বিবরণী আদালতে পেশ করছেন। আমার ধারণা তু'সপ্তাহের মধ্যেই জেরা শুরু হবে। অবশ্য এই বিশেষ কোর্ট সম্পর্কেই একথা বলা চলে। আমাদের জবানবন্দীতে অনেক সারালো কথা এবং আইনের দিক থেকে অনেক ধারালো যুক্তি আছে, যার দরুণ খুব আশা জাগে। কিন্তু আমাদের মামলাটা আবার এমন প্রকৃতির যে তার ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জোর করে বলা যায় না।

লেনার মুখ থেকে মাইকেল আর রবীর খবর শুনলাম। গত মাসে

ওদের মানসিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। চির অম্লান ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৫২

বৃহস্পতিবারের 'ল জার্নাল'-এ প্রকাশ প্রাদেশিক আপীল আদালতে আমাদেরটা নিয়ে এই তৃতীয় মামলার শুনানী হবে। খুব সম্ভব আসছে সপ্তাহের মধ্যে আসামীপক্ষের জবাবের চুম্বক পেশ করা হবে। তাহলেই প্রথম দফা চুকবে। জজ তিনজন যখন আপীলের বিচারে বসবে—প্রিয়তমা, তখন দাঁতে দাঁত দিয়ে আমাদের নতুন কষ্ট সইতে হবে। এখন আমাদের দরকার একটা ভাল রকমের ঝাঁকুনি।

তাছাড়া, বিরুদ্ধ রায়ের জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে। কেননা যে-প্রকৃতির মামলা আমাদের, তাতে এটা ধরে নেওয়া যায় না যে আইনকানুন, সত্যিকার ঘটনা এবং সুবিচার দিয়েই সব কিছু শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হবে। তা সত্ত্বেও, আমরা অব্যহতি পাবো—এ বিশ্বাস আমার আছে।

টেবিলটার জোড়ের মুখে সুতোয় ঝুলছে চার টুকরো ইহুদী সালামী*। সারা সেল জুড়ে ভুর ভুর করছে তার মিষ্টি গন্ধ। প্রথমটা থেকে ইঞ্চিখানেক পড়ে আছে। গণ্ডেপিণ্ডে খেয়েও মন ছোঁক ছোঁক করছে সেটা খেয়ে শেষ করার জন্যে। বলা ভাল, খাওয়ার ব্যাপারে এখন আর ধরা-বাঁধা করছি না। কিন্তু তাই বলে দিনে আধখানার বেশী কখনই নয়। এই সঙ্গে যদি কিছু পাষ্ট্রামি‡ পাওয়া যেত খুব চমৎকার হত নয়? তার চেয়েও ভাল হত কাৎস্-এর হোটেলে বসে যদি খেতে পারতাম। আচ্ছা কথা রইল—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে। ভালবাসা জেনো।

জুলি

* মাংসের পুর দেওয়া খাবার

‡ ময়দার তৈরি ইহুদী খাবার

প্রিয়তমা বধূ আমার, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৫২

মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। আইন-সংক্রান্ত আলোচনাতেই সমস্ত সময় কেটে গেল। দুজনে যে একটু কথা বলব—তেমন ফুরসৎ পেলাম না। আমার কাঠখোট্টা ব্যবহারে আমাকে বোধহয় তুমি ভুল বুঝছো। উকিল না আসা পর্যন্ত আমি দারুণ উৎকণ্ঠায় ছিলাম। উকিল এসে গেলে পর তার মুখে শুধুমাত্র মামলাসংক্রান্ত যুক্তি-পরামর্শ শোনবার ব্যাপারে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে অন্য কোন দিকে মনই ছিল না প্রিয়তমা, আশা করি তুমি আমার অবস্থাটা বুঝবে। আমি জানি তোমার নিশ্চয় মনে হয়েছে তোমার দিকটা আমি তেমন দেখিনি। কথাটা কিছুটা সত্য। তাড়াতাড়ি তুমি লিখে জানাও যে, আমাকে ক্ষমা করেছো। তোমাকে আমি কি যে ভালবাসি—তোমার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে, তোমাকে অযথা ব্যাথা দিতে আমি চাই না।

প্রচুর লোক আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে। খবরটা শুনে দারুণ ফুর্তি হচ্ছে। চটি বইটা যারাই পড়বে তাদেরই কাছে মুহূর্তে আমাদের মামলার স্বরূপ ধরা পড়বে এবং এ ব্যাপারে তারা যা-হোক কিছু করতে চাইবে। প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, আমরা একা নই, তাই সুবিচার পাবার আগের চেয়ে সম্ভাবনাও বেড়েছে।

সমস্ত মিলিয়ে মন খুব ভাল। সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে ভালবাসি।

জুলি

প্রিয়তম আমার, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৫২

ম্যানি চলে যাবার পর থেকে কেমন একটা মানসিক অশান্তির মধ্যে আছি, বিশেষ করে প্রিয়তম, যখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম, অনেক কথা বলার ছিল। জুলি প্রিয়তম, আমি

রাগ করব কি দুঃখে? তবে হ্যাঁ, রাগ করেছি—আমি দারুণ রাগে ফেটে পড়ছি আমাদের অসহায়তার জন্যে, জোর করে আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছে বলে। আমাদের এত কষ্ট সইতে হচ্ছে—এই অবিচারের জন্যে সঙ্গত কারণেই ঘৃণায় জ্বলে উঠছি।

প্রিয়তম, এটা তুমি ধরেই নিতে পারো যে মাঝে মাঝে আমি মন খারাপ করব। সেদিন এমন হয়নি যে তোমার সাময়িক রুক্ষ মেজাজের ফলে আমি চুপ্‌সে গিয়েছিলাম কিম্বা রাত্তিরে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। তবে এটা ঠিক এই ধরণের ব্যবহারের ফলে মনে হয় তুমি যেন ঠিক মেনে নিতে পারো না যে বোকার মত আচরণ করবার আমার অধিকার আছে।

যত যাই হোক, প্রিয় আমার—তোমাকে আমি আমার আপন জীবনেরই মত ভালবাসি। আমার উজাড় করা ভালবাসা নাও।

তোমারই এথেল

প্রিয়তমা আমার, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫২

বোন দেখা করতে এসেছিল। কথা বলে খুব ভাল লাগল। দেখে অবাক হতে হয় মানুষ কিভাবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নিজেকে বদ্‌লায়। আমার বিশ্বাস নিজেদের কাজের বহর দেখে আমার বোনেরা নিজেরাই খুব অবাক হয়ে যায়। কারণ খুবই পরিষ্কার; ওরা নির্ভেজাল ভালোমানুষ, আমাদের লড়াইটা ন্যায্য এবং একই পরিবারের লোক হিসেবে এর সঙ্গে ওদের রক্তের সম্বন্ধ। সত্য, প্রিয়তমা—ওরা দুজন যা করছে, তাতে তোমার নিজের পরিবারের নির্লজ্জ আচরণের গ্লানি ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করলেও ওরা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। তারই জন্যে মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই ওরা অনেক ভালো।

প্রিয়তমা এথেল, এত একা একা লাগে আমার!—সে দিন কবে? আর কত দেরি? শরীরে আর মনে আর কত সহ্য হয়? একমাত্র সান্ত্বনা এই যে আমাদের বাড়ি ফেরবার পরম লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। হে অনন্যা, আমাকে শক্তি দাও।

তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি।

জুলি

প্রিয়তমা বধূ আমার, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

রোজ বিকেল হলেই উঠোনে বেড়াতে যাই। আজ এইমাত্র বেড়িয়ে ফিরছি। বাতাসে কেমন একটা চনমনে ফূর্তির ভাব। বাধাবন্ধহীন সমুদ্রের লবণাক্ত হওয়ায় মাছের আঁশটে গন্ধ। যখন সে হাওয়া গায়ে লাগে নিজেকে নিত্য ধাবমান কোন দূর-বিস্তৃত বেগাত নদীর মত মনে হয়। সে এক অশ্চর্য অনুভূতি।

সে হাওয়া বয়ে আনে জীবনের দ্বিধাহীন আশ্বাস, নতুন মহত্তর ফলবান প্রতিশ্রুতি। রোদ্দুরের উত্তপ্ত ঝাঁঝ আমাকে বলে দেয় অদূরে বসন্ত। আকাশে বাতাসে ঐ আসে ঐ আসে ভাব। আর আমরা উন্মুখ হয়ে আছি এক আগন্তুক নতুন সকালের জন্যে।

উঠোনে দ্রুত পা ফেলে আমি হাঁটি। দূর দিগন্তে গুনগুনিয়ে ওঠে এরোপ্লেন, সিন্ধু-শকুনেরা পাখায় ভর দিয়ে ভেসে বেড়ায়, চক্রাকারে ঘোরে টুনটুনি পাখী—আমি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকি সেই দিকে আর মনে মনে একটি ছবির কথা ভাবি: তুমি আর আমি হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে হাঁটছি। তোমাকে পেয়েছি তাই আনন্দে মাটিতে পা পড়ছে না আমার। প্রিয়তমা তুমি আমার। চিরদিন আমি তোমার।

জুলি

প্রিয়তমা আমার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

তুমি আমার চিরদিনের মধুর প্রেয়সী। আজ এবং প্রত্যেকটি দিন। তোমার শক্তি আমাকে শক্ত করে দেয়। বাড়ির এবং কমিটির সুখবরে আমি উৎসাহ পাই। তারই জোরে আমি ক্যালেণ্ডারের পাতায় একটি করে দিন পেছনে ফেলে আসি। আমি জানি আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি সেই দিনের দিকে যেদিন আইনের চোখে সুবিচার পাবো।

প্রিয়তমা, তোমার কবিতার বাঞ্ছিত ফল ফলেছে। আমাদের প্রস্তাব: যে সময়টুকু তুমি হাতে পাবে, বসে বসে ব্যঙ্গ করে আরও বেশী কবিতা লেখো—তাতে আমরা খুব মজা পাবো। 'সি-সি'* আবহাওয়ায় মোদ্দা কথাটা তুমি ধরতে পেরেছো। আর তার বখশিস হিসেবে তোমাকে 'সিং-সিং ম্যানর'-এর রাজকবির আসনে বসানো হল।

ল্যামণ্ট-এর✲ বই পড়ছি। পড়াটা যদিও খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে, তাহলেও প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা পড়তে ভাল লাগছে। লেখাটা একদিকে যেমন খুব চিত্রগ্রাহী তেমনি চিন্তার প্রচুর খোরাক আছে। বইটা সত্যিই খুব মূল্যবান। পড়লে তোমারও ভাল লাগবে।

আমার কাছে বই আছে প্রচুর। কিন্তু মন চলতে চাইছে না। দুশ্চিন্তাগুলো এমনভাবে চেপে বসে আছে যে, সেগুলো তাড়িয়ে বই-পত্রে মন বসাতে পারছি না। তোমাকে সাদর চুম্বন করছি।

জুলি

প্রিয়তম আমার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

তোমার সুচিন্তিত চিঠির জন্যে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। যার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে প্রেমিকের উদ্বেগ, স্বামীর অচঞ্চল ভালবাসা

* ফাঁসীর সেল

✲ করলিস্ ল্যামণ্ট-এর লেখা বই 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মাইণ্ড'

—সে উক্তিকে আমার পক্ষে ভুল বোঝা কেমন করে সম্ভব। প্রিয় আমার, তুমি কি জানো না আমাদের মিলনের ভিত্তি কত দৃঢ় ?

সকাল সাড়ে ৭টা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী

প্রিয়তম, কাল রাত্রি ১০টায় শুনলাম সেই হৃদয়-বিদারক খবর।*

বর্তমানে এর সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা মুস্কিল। এখনও বিস্তারিত কিছুই জানি না। কিন্তু গা শিউরে ওঠে যখন দেখি সরকার আমাদের প্রাণ নেবার জন্যে কি ভয়ঙ্কর ভাবে তাড়া করছে। এতদিন ধরে আমরা সমানে বলে এসেছি আমাদের মামলার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—এ কথা যে কত সত্যি হাতে হাতে তা প্রমাণ হয়ে গেল।

ছেলেদের জন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ওরা বড় হয়েছে ; খবরটা ঠিক ওদের কানে যাবে। যখন মনে মনে ওদের বিভীষিকার কথা ভাবি, কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না—চোখে অন্ধকার দেখি। আমার যত চিন্তা ওদেরই জন্যে ; খবরটা পাবার পর ওদের কি অবস্থা জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছি।

প্রিয়তম, তোমাকে যদি সত্যিকার সান্ত্বনা দিতে পারতাম। তোমাকে আমি কত যে ভালবাসি।

চিঠি ডাকে দেবার ঘণ্টা পড়ছে। প্রিয়তম, মন যেন না ভাঙে। এখনও অনেক কিছু করবার আছে।

তোমার অনুরক্ত স্ত্রী এথেল

*প্রাদেশিক আপীল আদালত আপীল নাকচ করে

প্রিয়তমা এথেল, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

স্পষ্টই তাড়াহুড়ো করে যে রকম নিষ্ঠুরভাবে আমাদের দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে, তার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারিনি। অনেক ভেবে মনে মনে একটা মতলব ভেঁজেছি। আশা করি পেশকার মশাই বিচারপতি ফ্র্যাঙ্ক-এর এককপি অভিমত আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

ফ্রাঙ্ক-এর বক্তব্য আগাগোড়া খুঁটিয়ে পড়তে চাই। তার মধ্যে কোথায় কোথায় সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে, ইচ্ছেমত ঘটনা চেপে যাওয়া হয়েছে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে আমি খুজে বার করব। আমি দেখাব কিভাবে হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি বীর সাজতে চেয়েছেন এবং কি ভাবে বিচারকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মত প্রকাশ পেয়েছে।

একজন তথাকথিত 'উদারপন্থী গণ্যমান্য ভদ্রলোক' প্রবঞ্চনা এবং মিথ্যে বাক্‌চাতুরী দিয়ে এই রাজনৈতিক জালিয়াতি টিকিয়ে রাখছেন—এটা যারা ভিন্ন মত পোষণ করে তাদের ভয় দেখিয়ে দলে টানবার উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন বলি দেওয়া হচ্ছে—আমার চোখে ঢাকা থাকছে না। কথার ধূম্রজাল দিয়ে এই সত্যটাকেই তিনি ঢাকতে চাইছেন।

আমাদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা আছে—এই স্বৈরাচারী পদ্ধতির মুখোস খুলে দেওয়া। আজ আমাদের সমস্ত শক্তি এই কাজে নিয়োজিত করতে হবে। প্রিয়তমা, আমার দৃঢ় ধারণা—তোমার প্রতিভা এক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে। লড়াই জিততে এবার আমরা শহরে চললাম।

চূড়ান্ত বিচারের দিন ঘনিয়ে আসছে। যেভাবে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে তাতে আমাদের মৃত্যুরও আর বেশি দেরী নেই। জীবনে আর সব কিছুর চেয়ে তাই তোমার মূল্য আমার কাছে আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। আমার নিজের রক্তমাংসের এই দেহটাও তার

কাছে তুচ্ছ। আমি পরিপূর্ণভাবে বেঁচেছি ; আমার সে জীবন কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। চিরদিন তোমার—

জুলি

প্রিয়তম, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

আমি মনে করি না এ সময় জন্মদিনে উৎসব করবার মত কারো মনের অবস্থা আছে। তবু এটা দেখা দরকার যে, এমন কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় যাতে ছেলেদের জীবন নিরানন্দ হয়ে ওঠে।

একগাদা লোক ডেকে বড় করে অনুষ্ঠান করা হোক—এ আমি আদৌ চাই না। সে রকম কোন অনুষ্ঠান হলে লোকে আসবে, কিন্তু যে হাসি তাদের মনের কোণে নেই সে হাসি শুকনো ঠোঁটের কোণে জোর করে ফুটিয়ে তুলবার বৃথা চেষ্টা করবে। কাজেই তার চেয়ে মাইক ওার জন দুই বাচ্চা বন্ধুকে ডেকে এনে জন্মদিনের কেক ভাগ করে খাক এবং একটু হাসি-আনন্দ করুক। মাইকেল আর রবীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটু ভালমন্দ খাওয়ানো হোক। লেনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব ভাবছি। ওকে বলব যেন বাড়িতে একটা সত্যিকারের আনন্দের আবহাওয়া বজায় থাকে—কেননা শিশুদের পক্ষে সব চেয়ে মারাত্মক হল দম-বন্ধ-করা বিষণ্ণতার আবহাওয়া।

তোমার জন্যে মন আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে। প্রিয়তম, শুধু যদি আমরা পরস্পরকে কাছে পেতাম। তোমাকে কি যে ভালবাসি।

তোমার অনুরক্ত এথেল

আবেদন-জনসাধারণে

প্রিয়তমা বধূ, ২রা মার্চ, ১৯৫২

উচ্চতর কোর্টের বিচারকেরা বিকট উত্তেজনা এবং রাজনীতির ঊর্ধ্বে—এ ধারণা অতীতে যদি কিছুমাত্রও থেকে থাকে, আজ সে ভুল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে গেছে।

ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের বুঝতে হবে—জনসাধারণই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। যদিও মাথার ওপর আজ আসন্ন মৃত্যুর উলঙ্গ বিভীষিকা—তবু কথাটা সত্যি। একমাত্র তারাই পারে আইনের নামে এই নিষ্ঠুর নরবলি বন্ধ করতে।

বিচারক ফ্র্যাঙ্ক যেভাবে আইনের ব্যাখ্যা দিয়েছে তাতে ঘোর বিপদ দেখা দেবে। যারাই প্রগতিশীল, যারাই ভিন্ন মতের লোক—এবং সেইসঙ্গে অন্যেরাও—বিপদে পড়বেন। আমার দৃঢ় ধারণা, এদেশের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে এই ব্যবস্থা বাতিল করে দেবে।

আমি আশা করছি, আজ এই শেষ সময়ে জনসাধারণের সামনে আমাদের মামলা পেশ করার যে আন্দোলন তার বেগ ক্রমেই বাড়বে, এবং মিটিং* হয়ে যাবার পর আমরা রীতিমত এগোতে শুরু করব।

এটা ঠিক যে, আমাদের যা করণীয় তা আমাদের করে যেতে হবে। সেইজন্যেই তো আমি বিচারকের রায়ের কপির জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছি। পেলেই কাজ শুরু করবো। ম্যানিকেও বলব—দলিল-গুলো ছাপা হলে আমরা প্রত্যেকে যেন এক কপি করে পাই।

* ১৯৫২ সালের ১২ই মার্চ রোজেনবার্গ মামলা পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে নিউ ইয়র্ক শহরে পিথিয়ান টেম্পল-এ অনুষ্ঠিত প্রথম বিরাট জনসভা।

তুমি প্রস্তাব করেছো ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার দিনেই যেন উকিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার ব্যবস্থা হয়। খুব চমৎকার প্রস্তাব। তবে নির্ভর করছে উকিল এখন দেখা করবার সময় করে উঠতে পারবে কিনা। তার ঘাড়ে এখন আইনসংক্রান্ত বিস্তর কাজ। বুধবার দেখা হচ্ছে। ভালবাসা।

জুলি

পুনশ্চ।—গান গাও আর মনে ফুর্তি আনো; প্রেয়সী আমার, ভবিষ্যতের কোলে আছে অযুত সম্ভাবনা। তুমি তো জানো—'সাহস, আত্মবিশ্বাস আর নিশানা।'

প্রেয়সী বধূ আমার, ৬ই মার্চ, ১৯৫২

বুধবার বিকেলে মাইকেলের ছবি পেলাম। প্রিয়তমা ছবিটা কি সুন্দর—অবিকল আমাদের ছেলে মাইক। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি। ছবিটার মধ্যে কি যেন আছে, দেখেই তোমার কথা মনে পড়ে যায়। রাত্রে মাইকেলকে জন্মদিনের যে কার্ড পাঠাচ্ছি, তাতে লিখেছি আমাকে পাঠানো ওর ছবি পেয়ে বেজায় খুশী হয়েছি। রবীকেও চিঠি দিয়েছি। এমনভাবে লিখেছি, যাতে ওরা পড়ে ফুর্তি পায়। তোমার কি মনে হয় মা-মনি, আমাদের ছেলে দিন দিন দেখতে সুন্দর হচ্ছে? ঠিক ওর বাপের মত!

এথেল, বুধবার দিন আমাদের দেখা হয়ে খুব ভাল হয়েছে। আমার বিশ্বাস, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আমরা চালিয়ে যেতে পারব। আমি শুধু সেই উদ্দেশ্যেই আপীল আদালতে রায় এবং তদন্ত-কার্যের বিবরণী চাই। যারা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আমাদের ফাঁসাতে চেয়েছে, তাদের বক্তব্যের মধ্যেকার উল্টো-পাল্টা কথাগুলো ধরিয়ে দিয়ে আমাদের উকিলকে আমরা সাহায্য করতে পারি। নিজেদের জীবনের জন্যে যে লড়াই আমরা করছি, সক্রিয়ভাবে অংশ নিলে

আমরা মনেও অনেক জোর পাবো। এ লড়াই অবশ্যই একা আমাদের নয়—আমেরিকার জনসাধারণের কাছেও এর তাৎপর্য বিরাট।

আমরা কখনই আর সকলের কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখিনি। আমরা সহজ পাত্র নই—এটা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিতে চাই। তোমার ভালবাসা যেমন আমাকে শক্তি দিয়েছে, আমি আশা করি তুমিও আমার ভালবাসা থেকে তেমনি শক্তি পাবে, চেষ্টা করে দেখ, প্রিয়তমা।

তোমার ভক্ত জুলি

বধু আমার, ১৬ই মার্চ, ১৯৫২

আমার বোনেরা খুব ভাল ভাল খবর এনেছে। পিথিয়ান টেম্পল্-এ সভা হয়েছে বিরাট। অন্যান্য কাজও চলছে পুরোদমে। আশা করা যায়, যারা অ-দলীয় উদারপন্থী এবং রক্ষণশীল—তাঁরাও আমাদের মামলার ব্যাপারে অংশ নেবেন। যাঁরাই মাথা উঁচু করে চলতে চান, তাঁদের মত যাই হোক না কেন—এই মামলার আজ তাঁদের প্রত্যেকেরই অধিকার, নিরাপত্তা এবং এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপদাপন্ন।

ইহুদী-বিদ্বেষ দিয়ে এই মামলাটিকে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালানো দরকার। আমরা নির্দোষ, তবু বে-আইনীভাবে আমাদের দণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর সেই দণ্ডাদেশ দেখিয়ে ওরা বলে, দেখেছ তো, ইহুদীরাই যত নষ্টের গোড়া। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমাদের সামনে বাধাবিপত্তি অনেক। তা হলেও সে বাধা আমরা জয় করতে পারব—এখনও এ বিশ্বাস আছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমাদের পরিবার এ আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

এথেল, আমরা সবে লড়তে শুরু করেছি। ভবিষ্যতের দিকে তাকাও। চিরদিন তোমার বিশ্বস্ত জুলি

প্রিয়তমা আমার, ২৭শে মার্চ, ১৯৫২

জীবনের বর্তিকা, হৃদয়ের গোলাপ আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে প্রিয় তুমি, আমার প্রেয়সী—যাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। যখন তোমার সুন্দর বাঙ্ময় মুখের দিকে তাকাই, বুঝতে পারি আমরা এক। এখানকার এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও কিভাবে আমরা দিন দিন পরস্পরের টানে বাঁধা পড়েছি—ভাবলে নিজেরই অবাক লাগে।

আমাদের দু'জনের দেহ দু'জায়গায় থাকলেও আমরা ভালবাসা থেকে, পরিপূর্ণ মিলন থেকে কখনই বঞ্চিত হব না—এ বিশ্বাস আমার আছে। কিছুটা সময়ের জন্যে, প্রিয়তমা যার যার কক্ষে চোখে বিভীষিকা নিয়ে অবশ্যই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

আমার এথেল যেমন ছিল যেন তেমনি থাকে। আমি তোমাকে তোমার স্বরূপে পেতে চাই।

তোমার প্রেমমুগ্ধ স্বামী জুলি

প্রিয় আমার, ৩১শে মার্চ, ১৯৫২

আমি ভাবি: তুমি কি অসাধারণ মানুষ তা কি তুমি জানো? সামান্য একটু সময় তোমাকে চোখে দেখে, তোমার কথা শুনে কেন যে আমার মন এত ভাল হয়ে যায় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।

আদৎ কথা বলি:

বুধবার বিকেলে তোমার বোন এথেলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে মাইকেলও দু'ছত্র নিজের হাতে লিখেছে। 'প্রিয় মা-মণি, আমার জন্মদিনের পার্টি হয়ে গেল ৯ই মার্চ, ১৯৫২। দিনটা খুব আনন্দে কেটেছে। এথেল পিসি, লেনা পিসি, সবাই সপরিবারে এসেছিলেন। আর এসেছিলেন অ—। এথেল পিসি জন্মদিনের কেক এবং মিঠাই এনেছিলেন। আমরা সকলে মিলে খেললাম বাজনা

থামলেই চোয়ারে বসবার খেলা। আমি পিয়ানো বাজিয়েছিলাম। তোমার কার্ড পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। ভালবাসা নিও। মাইকেল আর রবার্ট।' মাইকেলের সুন্দর হাতের লেখা ও ভুল বানানের চিঠি দেখতে হলে এখনও পুরো এক সপ্তাহ ধৈর্য ধরে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

পার্টিটার কথাই এথেল বেশী করে লিখেছে। ও আর লেনা কেক, মিঠাই, মোমবাতি, গামছা, চকোলেট, পার্টিতে পরবার টুপি এবং আইস্‌ক্রিম নিয়ে শহরে গিয়েছিল। মাইকেলকে ওরা ভেতরে পরার পুরোহাত জামা, খেলার শার্ট আর লম্বা প্যান্ট কিনে দিয়েছে। মাইকেলের বন্ধু মাইকেলকে দিয়েছে এক রকমের ষ্টেন্সিল আর গালার সেট, রবীকে দিয়েছে এক সেট কাপড় বোনা—রবী সেটা ছেলেটির মার সাহায্যে চালিয়ে ভারি খুশী।

প্রিয়তম, আমাকে তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করো না। আমি একান্তভাবে তোমার সাহায্য আর সমর্থন প্রত্যাশা করি। এই নিঃসঙ্গতা মর্মান্তিক। আমার সমস্ত ভালবাসা।

এথেল

প্রিয়তম, ২রা এপ্রিল, ১৯৫২

যখন তোমার সঙ্গ পাই, আমার সুখের অন্ত থাকে না। সমস্ত হাওয়াটাই যেন বদলে যায়। বুক-চাপা গুমোট আর থাকে না। বাঁচবার সংকল্প, কাজ করার ইচ্ছে সংগ্রামের প্রেরণা আবার ফিরে পাই।

প্রিয়তম, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫২

আজ সকালে ছেলেদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। ওদের বুঝিয়ে লিখেছি কেন দেখা করার ব্যাপারে দেরি হচ্ছে। সেই সঙ্গে বার

বার জানিয়েছি আমাদের ভালবাসা। ওরা আমাকে ঈষ্টার উপলক্ষে ভারি চমৎকার একটা কার্ড পাঠিয়েছে।

এথেলের কাছ থেকেও একটা চিঠি পেয়েছি। এক জায়গায় ও লিখেছে: 'যাই হোক, ছেলেরা এখন বেশ ভালই আছে। কিন্তু মাইকেল রাত্রে যখনই পায়খানায় যায় মাকে ডেকে তোলে। শোবার ঘর আর কলঘরের মাঝখানে দেওয়ালের ফুটোয় রাতভর একটা ছোট বাতি জ্বলে। মাইকেলকে তুমি একবার বলে দেখতে পারো একবার জাগিয়ে দিলে ঠাকুমার চোখে আবার ঘুম আসা খুবই শক্ত।'

এথেল কিম্বা ডেভের সঙ্গে সপ্তাহের শেষে যখন দেখা হবে, প্রিয়তম, শান্ত থেকো; দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা, দৃঢ়তার যেন অভাব না হয়। কেমন করে নিজেকে তুমি ঠিক রাখবে তুমিই তা ভাল জানো। বিষয়টার ওপর আমি খুব বেশী জোর দিতে চাই—কি ভাবে দেবো বুঝে উঠতে পারছিনা। ভালবাসা।

এথেল

প্রিয়তমা এথেল আমার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৫২

প্রদেশিক আপীল আদালতের একেবারে সম্প্রতিকার রায়ে* এমন সব যুক্তি দেওয়া আছে, যার জোরে নিশ্চয়ই আমরা পুনর্বিচার আশা করতে পারি। তাছাড়া বিচারপতি ফ্র্যাঙ্ক যখন স্বীকার

* যখন এই কথা তোলা হয় যে, প্রাণদণ্ড হল 'নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক শাস্তি'—বিচারপতি ফ্র্যাঙ্ক সেই প্রসঙ্গে কুইবিন মামলার নজির দেন, সেখানেও এটা একটা বিতর্কের বিষয় ছিল। বিচারপতি ফ্র্যাঙ্ক বলেন: 'যখন সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়টার ওপর বিশেষভাবে আলোচনা করেনি, তখন সুপ্রীম কোর্ট এই মামলায় আমাদের ঐ বিশেষ দণ্ডাদেশ সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা করে দেখতে পারে।'

করেছেন এর মধ্যে বিতর্কমূলক আইনের প্রশ্ন আছে, তখন তা থেকে আমরা দুটি বিষয়ের জবাব পেয়ে যাই। আমাদের যুক্তি দুটো এর ফলে নষ্ট তো হয়ই না, বরং তার জোর বেড়ে যায়। আমার দেখে মনে হচ্ছে কোর্টে যেন এই প্রথম আমরা একটু ফাঁক পেয়েছি।

যতদিন না সুপ্রীম কোর্টে আমাদের মামলা উঠছে, ততদিন যাতে কোর্টের দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখা হয়—তার ব্যবস্থা করতে সোমবার আমাদের উকিল আদালতে যাবেন। জানতে পারলাম, পুনর্বিচারের জন্যে কারণ দর্শিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন জানাতে হবে। ম্যানি এখন নানা কাজে ব্যতিব্যস্ত। তা হলেও আমরা আশা করতে পারি আমাদের সঙ্গে শীগ্‌গিরই ও একবার দেখা করবে।

নিষ্ঠুর বিভীষিকার মৃত্যুর জন্যে এই নিস্ফল, অর্থহীন প্রতীক্ষা—মাঝে মাঝে পেটের মধ্যে অস্বস্তি বোধ হয়।

যখন আসল ঘটনা আদৌ প্রচার হয়নি, তখনও সমস্ত ইহুদী কাগজগুলো আমাদের এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লিখেছে। একথা শুনে ভাল লাগে।

বেশী বেশী লোক আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে। পথ কঠিন, পথ বন্ধুর—হায়! বড় ক্লান্তিকর, বড় দীর্ঘ এই পথ। তবু সম্পূর্ণভাবে রেহাই পাবার এই একটি পথই আমাদের আছে। এর কমে মুক্তি নেই।

চিরদিন তোমার বিশ্বস্ত জুলি

প্রিয়তমা, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫২

যখন তুমি প্রসন্ন হও কি সুন্দর দেখায়। ম্যানি যখন উৎসাহজনক ভাল ভাল খবর দিচ্ছিল আর তুমি হাঁ করে সেই খবরগুলো শুনছিলে আমি সারাক্ষণ তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। আমাদের উকিল, কমিটি এবং আর যেসব

সাচ্চা মানুষ ন্যায়বিচারের জন্যে আমাদের সংগ্রামের সমর্থক—তারা এত ভাল কাজ করছে যে, আমিও সেদিন আনন্দের উত্তুঙ্গ তরঙ্গে নিজেকে ভাসিয়েছিলাম।

মাথা উঁচু করে রাখো, এথেল। যদি বইতেই হয় এই দুঃস্বপ্নের জ্বালা, আমরা এমনভাবে তা বইব যাতে সর্বসাধারণের মঙ্গল হয়। আমরা সোজা জানিয়ে দিচ্ছি—আমাদের ভয় পাওয়ানো শক্ত। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মেয়ে পুরুষ যখন আসল ঘটনা জানতে পারে, তারাও ভয় পায় না।

এই দুবছরে আমরা পেরিয়ে এসেছি পাহাড় প্রমাণ যন্ত্রণা। এবার আমরা মুক্তির কাছাকাছি। তোমাকে অঞ্জলি ভরে দিই আমার হৃদয়।

জুলি

প্রিয়তমা আমার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫২

এখন ছ'টা তিরিশ। আলো-আঁধারি সন্ধ্যে দ্রুত রাত্রির কোলে ঢলে পড়েছে। বিলম্বকারী এক জোড়া পাখি, কলমুখর চড়াই এখনও সেলের দিকে মুখ করা জানালার সামনে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। সত্যি প্রিয়তমা, নিদাঘের আর দেরি নেই—যে আধ ঘণ্টা আজ রোদ্দুরে ছিলাম, আমার মধ্যে মুক্তির নতুন আকাঙ্খা জেগেছে।

তথাকথিত 'উদার পন্থী' সংগঠনের নেতাদের কুণ্ঠা কাটিয়ে তোলার জন্যে বিরাট চেষ্টার দরকার। এমন কি শান্তির প্রশ্নেও এদের অনেক 'নেতাই' মুখ খুলতে রাজী হয়নি। অন্য অনেকে অবশ্যই আমাদের সপক্ষে কথা বলতে চান কিন্তু তাঁদের ভয় পাছে তাঁরা 'ভঙ্গ' বলে চিহ্নিত হন।

খুব আশা করছি ছেলেরা এ রবিবারে আসবে। মিছিমিছি ভেবে মন খারাপ করো না।

তোমার অনুরক্ত স্বামী জুলি

কাটবে। আমাদের দিক থেকে দিনগুলো বহন করে আনবে অনেক সুখবর।

যে ছবিতে ঠাকুমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কোলের ছেলে রবী, এইমাত্র সেই ছবিটা দেখছিলাম। এথেল, ছবিটা দেখে আমার মন হু হু করে উঠল। আমার বড় আদরের মা। করুণার প্রতিমূর্তি। অভিজ্ঞতায়, শোকেদুঃখে বয়োবৃদ্ধ আমার মা—তবু তিনি সাহস ও শক্তির প্রতীক। আমাদের সমস্ত প্রিয়জনেরা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ আমাদের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে—আমাদের জয়ী হওয়া তাদের একান্ত দরকার। সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসছে। আমার ভাই এবং বোনেরা সে কথা যত বুঝতে পারছে, ততই আরও বেশী উৎসাহিত হচ্ছে। দেখে এত আনন্দ হয়। আমাদের বুক বাঁধতে হবে। ওরা আসল সমস্যাটা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে। তোমাকে আমার সমস্ত ভালবাসা।

তোমারই জুলি

প্রিয়তম জুলি আমার, ১৬ই জুন, ১৯৫২

সারাটা দিন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে ছটফট করছি। বোঝাও তো একবার, আমার এই বোকা হৃদয়টাকে বোঝাও তো একবার—আমার সঙ্গে তোমার কথা বলবার দিন শুধু বুধবার। ও আমার কথা কানেই তোলে না। কেবলি তোমার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমি জানি, দুঃখের সঙ্গেই জানি—তোমারও হৃদয় ঠিক আমারই মত খুঁত খুঁত করে।

প্রিয়তম, তোমার জন্মদিন এসেছিল, চলে গেছে। না পেয়েছো তুমি স্ত্রী চুম্বন, না সন্তানদের আলিঙ্গন। যেমন প্রত্যেকটা দিন এখানে আসে আর চলে যায়, তেমনি তোমার জন্মদিনটাও এসেছিল, চলে গেছে।

তোমাকে কি যে ভালবাসি। সারাক্ষণ তোমার অভাব আমাকে পাগল করে। সেই আগের মত, প্রিয়তম স্বামী আমার, আমাকে চুমো খেয়ে বলো : শুভরাত্রি। তোমার স্ত্রী তোমাতে মুগ্ধ। তোমার সন্তানেরা তাদের বাপিকে শ্রদ্ধা করে।

আদরের তোমার এথেল

প্রিয়তম স্বামী আমার, ১৮ই জুন ১৯৫২

আমাদের জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় দিনটা কেমন করে আমি ভুলে গেলাম? স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, তাহলে ভুলে গিয়ে অমার্জনীয় দোষ করেছি মানতেই হবে। নিজের দিক থেকে শুধু এইটুকুই আমার বলবার আছে : আমি এমন একঘেয়ে দুঃখের মধ্যে দিন কাটাই যে, মাথার ঠিক থাকে না, চোখেমুখে অন্ধকার দেখি, কোথা দিয়ে সময় চলে যায় কোন সাড়া থাকে না। এমন কি এত বড় যে একটা তারিখ ১৮ই জুন, সেটা পর্যন্ত ভুলে বসে থাকি।

১৯শে জুন, ১৯৫২

কি করব বলো, তোমার স্ত্রীটি হয়েছে এক মহা গলগ্রহ। অবশ্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে এমন মেয়ে হতে যাকে মোটামুটি ভদ্রসমাজে বার করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত অনেক চেষ্টায় পাবার মধ্যে পেয়েছি শুধু তিনটে কিম্ভুত কিমাকার পোষাক। তার বেশী জোটে নি।

ইদানীং তুমি আমায় চুম্বন করে শুভরাত্রি জানাও কি? কেননা আমি তোমাকে কখনই চুম্বন করতে ভুলি না। উঃ, প্রিয়তম! বাধ্য হয়ে কি নিদারুণ প্রহসন আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। এত অসম্ভব একা লাগে—

এথেল

এথেল প্রিয়তমা আমার,　　　　　　　　　　　　　১৯শে জুন, ১৯৫২

যে সব ঘটনা ঘটবার ফলে শেষ পর্যন্ত সভাটা* বন্ধ করে দিতে হল, কাগজে তার বিবরণ পড়েছি। কিন্তু তারপর থেকে সমস্ত কাগজ চুপচাপ। কি ঘট্‌ল না ঘট্‌ল একটি লাইনও কোন কাগজে লিখছে না। এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবশ্য একমাত্র 'কম্পাস্‌' ছাড়া আর কোন পত্রিকাই প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু তারাও বা ঐ পর্যন্ত বলেই থেমে গেল কেন? সভার কোন বিবরণ দিল না কেন?

প্রিয়তমা, সেদিন ঐটুকু সময় একা আমিই দখল করে নিয়েছিলাম বলে দুঃখিত। নির্ভাবনায় থেকো, আসছে বার আমি তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দেবো। আমি ভাবছি, নিজেদের বাড়িতে আমরা কত সুখেই না ছিলাম। দুজনেই খাটতাম, এ ওর কাজে সাহায্য করতাম, সমস্যার কথা পরস্পরের কাছে তুলে ধরতাম। দুজনে সমান ভাবে ভাগ করে নিতাম হাসি, আনন্দ, ভালবাসা।

এথেল, তোমাকে একথা বুঝতে হবে যে, লিখে সব কিছু প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ নয়। বরং আমি তোমাকে সামনাসামনি বলব। চিরদিন তোমার অনুরক্ত—

জুলি

প্রিয়তমা,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　২৬শে জুন, ১৯৫২

আজকের দিনটা যেতে বসেছে। আসছে সেই দিন, যেদিন আমরা পাঁচজন এক জায়গায় হবো। এখন আমি তোমার খুব কাছেই উঠে এসেছি। আছি পশ্চিম বাড়ির পয়লা নম্বর সেলে। ঘণ্টা দুই ধরে লোহার গরাদ, নর্দমা, বাটি আর মেঝে ধুয়েছি। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে উঠলেও এখন খুব ভাল লাগছে। ঝকঝক তকতক করছে

*১৮ই জুন ব্রুকলিন সঙ্গীত আকাডেমির আহূত সভা।

সেলটা। মাত্র কদিন আগে দেয়ালগুলো রং করা হয়েছে। তাছাড়া শোবার জন্যে পাওয়া গেছে নতুন গদি। তবু এক বছরেরও ওপর যারা আমাকে সঙ্গ দান করে আনন্দ দিয়েছে সমস্ত সময় তাদের অভাব আমি অনুভব করব।

'জার্নাল-আমেরিকান' কাগজে হাওয়ার্ড রাশ্‌মোর যে ভাবে তারস্বরে গর্দভ রাগিনী জুড়েছে, আমাদের সমর্থনে যাতে জনসমাবেশ না হয় তার জন্যে যেভাবে সে ফাটা কাপড়ে তালি দেবার চেষ্টা করছে —তাতে বোঝা যায় কমিটির ওষুধ রীতিমত ধরেছে।

ছেলেরা দেখা করতে আসছে। এরই মধ্যে বেশ একটু ঘাবড়াতে শুরু করেছি। তবে প্রত্যেকবারই তো দেখছি দেখা করবার ফল আগের বারের চেয়ে পরের বার উত্তরোত্তর ভালই হয়েছে। আশা করছি, ওরা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামের দিকে চলে যাবে। এদিককার আবহাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে। ওদের নিশ্চয় মনের মত সঙ্গী জুটবে, খেলাধূলো আমোদ আহ্লাদে সময়টা ভাল কাটবে। আমার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে এখানে মা-র দেখতে আসার ব্যাপারে। আমার ভাবনা হচ্ছে—মা-কে আবার এতটা রাস্তা একা না আসতে হয়।

প্রিয়তমা, নিজেকে শান্ত রাখো—আত্মস্থ হও। মনে রেখো, এই উষ্ণ-প্রবাহের মধ্যেও আমি তোমার জন্যে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে চলেছি। আমার চিরজাগ্রত ভালবাসা—

জুলি

প্রিয়তমা, ২৯শে জুন, ১৯৫২

আমাদের পক্ষের দরখাস্তটা আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে। আমার খুবই আশা হচ্ছে, যদি দরখাস্তটা যথোচিত মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখা হয় তাহলে আমাদের পুনর্বিচারের প্রার্থনা

মঞ্জুর না হয়ে যায় না। এটা সত্যিই আইন জগতের একটা আশ্চর্য দলিল; বাহুল্যবর্জিত অন্তরস্পর্শী ভাষার সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিশেছে আইনের অকাট্য যুক্তি। পরিশিষ্টসহ দরখাস্ত কপি করে যদি যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে বিলি করা যায়, তাহলে খুবই ভাল হয়।

আমার বোন এসেছিল দেখা করতে। খুব ভাল লাগল। এদিন শেষ পর্যন্ত ও থাকতে পেরেছিল, কারণ অন্য একজন কয়েদীর সঙ্গে জনকয়েক দেখা করতে এসেছিল তারা গাড়িতে করে শহরে পৌঁছে দেবে বলেছিল। ও যেসব খবর দিল শুনে দারুণ ফুর্তি লাগল। বড় বড় সভা, বড় বড় জৌলুস হচ্ছে। হাওয়ার্ড রাশ্‌মোর কাগজে খবর দিয়েছিল: 'ইহুদি ধর্মযাজক শার্ফ* আমাদের কোন সমাবেশে যোগ দেবেন না, কারণ ঐসব সমাবেশগুলো নাকি কমিউনিষ্ট পরিচালিত।' খবরটা একদম মিথ্যে। শুনে ভাল লাগল।

জানো কি প্রিয়তমা, তোমার আর আমার মধ্যে ব্যবধান মাত্র বিশ হাতের! কিন্তু লৌহ কপাটগুলোতে জমাট বেঁধে আছে অন্তহীন দূরত্ব। ক্রমেই এগিয়ে আসছে আমাদের চরম ভাগ্য নির্ণয়ের দিন। এখনও আমার দুর্মর আশা: আমরা মুক্তি পাবো।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে ভালবাসি।

জুলি

প্রিয়তমা প্রেয়সী আমার, ২রা জুলাই, ১৯৫২

আমার লেখবার টেবিলের মাথায় প্রায় সারা দেয়াল জুড়ে টাঙানো স্বাধীনতার ঘোষণার পত্র, যা গত বছরের ৪ঠা জুলাই 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌-'এ পুরো এক পৃষ্ঠা জুড়ে নতুন করে ছাপা হয়েছিল। এরই মধ্যে বয়সের ছাপ লেগে কাগজটা হল্‌দে হয়ে এসেছে; তার এক কোণে অন্য একটি সইয়ের পাশে জ্বলজ্বল করছে আমার নাম। আমার দেশের প্রতি

* ব্রুকলিন-এর ইহুদি ধর্মযাজক মেয়ার শার্ফ

আনুগত্য কোন আমেরিকাবাসীর চেয়ে আমার কম নয়। এই ঘোষণাপত্র আমি সেলের দেয়ালের এমনি করে টাঙিয়ে রেখে দেবো। আমাদের জীবন বিপন্ন জেনেও এ মামলায় আমাদের আচরণের ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের গণতন্ত্রের মূলনীতির স্বরূপ ফুটিয়ে তুলব। আমেরিকার অতীত ইতিহাস বিকৃত করার, নিজেদের মনমতো নতুন করে লেখার যতই চেষ্টা হোক না কেন তার প্রগতিশীল অন্তর-তাড়নাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা যাবে না। আসন্ন ৪ঠা জুলাই-এর প্রগতি হিসেবে আমি বেয়ার্ডস্-এর 'আমেরিকার ইতিহাস' পড়ছি এবং আজকের ঘটনাবলী খুঁটিয়ে দেখেছি। নতুন উৎপীড়কের দল আমাদের নিয়মতান্ত্রিক রক্ষাকবচগুলো অকেজো করে দিচ্ছে, অন্য হাতে কেড়ে নিতে চাইছে জনসাধারণের জীবন ও সমস্ত রকম স্বাধীনতা। যে দিকে ন্যায়, আমরা সেদিকে। আমরাই জয়ী হবো।

তোমার একনিষ্ঠ স্বামী জুলি

প্রিয়তমা এথেল,

১৩ই জুলাই, ১৯৫২

ডেভ্ এসেছিল। ওর কাছে শুনলাম: ছেলেদের খবর ভাল ও কমিটির কাজ খুব ভাল চলছে। মার চোখদুটো আরও খারাপ হয়ে যাবার আগেই আমাদের একজন ভাল চোখের ডাক্তারকে দিয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল চোখদুটোর জন্যে মা নাকি ক্রমাগত ভুগছেন।

'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা পড়ে বুঝলাম—সুবিচার আদায়ের জন্যে দেশের সর্বত্র কমিটি গড়ে ওঠবার যে খবর আমার ছোট ভাই দিয়েছিল তা সত্যি।

পুরো দু বছর হল আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের ভালবাসার সুখের নীড় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুঃখ পেয়েছি অনেক—তবু আমরা বদলে যায়নি, আমাদের সম্পর্ক

যা ছিল তাই আছে। সুখের কথা এই যে, একাধিক দিক থেকে আমরা জয়ী হবো। আমরা রক্ত মাংসের মানুষ, একথা মনে রেখেই বলছি।

আমাদের এ ব্যাপারের পক্ষে দুনিয়ার শান্তি বজায় থাকা একান্ত দরকার। কেননা ঠাণ্ডা-যুদ্ধের রাজনীতি যদি বরাবরকার মত এখনও সর্বোচ্চ আদালতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে আমাদের রেহাই পাবার আদৌ আশা নেই।

আমার হৃদয়-নিংড়ানো ভালবাসা জেনো। তোমার বিশ্বস্ত—

জুলি

প্রিয়তমা, ১৭ই জুলাই ১৯৫২

নতুন পোষাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। বিশেষ করে আমাদের মামলার ব্যাপারে তোমার পরিচ্ছন্ন ধারণা দেখে আমার বিশ্বাস হল আমরা এতদিনে ঠিক রাস্তা পেয়েছি।

এবারে গরমের ছুটিটা ছেলেদের খুব কাজে দেবে। আমরা নাছোড়বান্দার মত এতদিন ধরে বলে আসছিলাম ছেলে দুটোকে নতুন কোন আবহাওয়ায় নিয়ে যাওয়া দরকার যেখানে তারা নতুন নতুন বন্ধু খুঁজে পাবে। দেখা গেল, আমাদের কথা মত চলে ফল পাওয়া যায়।

মা-র চোখের খবর শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলাম। তার শরীরের প্রতি যাতে অযত্ন না হয়, সেদিকে আমার লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রিয়তমা, আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি—আমি যেন তোমাকে আর ছেলেদের নিয়ে ছুটিতে বাইরে গিয়েছি। নিজের পরিবারের মধ্যে ফিরে যাওয়া সে যে কি আনন্দের! ভালবাসা জেনো!

জুলি

প্রিয়তমা জুলি আমার, ২২শে জুলাই, ১৯৫২

বই থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পড়ার সময় থেকে কিছুটা সময় তোমাকে না দিয়ে পারলাম না। একটা দারুণ খবর আছে। আজ বিকেলে তোমার চিঠির সঙ্গে আরও একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে মাইকেল আর রবী। গত সপ্তাহে তুমি ওদের যে চিঠি দিয়েছিলে, বোঝাই যাচ্ছে এটা তার জবাব। বুধবার যখন দেখা হবে তখন নিশ্চয় তোমাকে পড়ে শোনাব। কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে পড়ে না শোনাচ্ছি আমার শান্তি নেই।

তুমি হয়ত জানতে পারো না, প্রত্যেক বুধবারে তোমাকে দেখার জন্যে কি অধীর আগ্রহে আমি অপেক্ষা করে থাকি। তুমি আমাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে যে স্নেহশিক্ত কথাগুলো বলো, তা শুনে আমি সান্ত্বনা পাই।

এই প্রচণ্ড গরমে আমার সমস্ত উৎসাহ চলে গেছে। খেলতে ইচ্ছে করে না, লিখতে ইচ্ছে করে না—যাতে সামান্যতম হত পা নড়াবার দরকার হয়, এখন কিছুই করতে ভাল লাগে না।

প্রিয়তম, আর আমার ধৈর্য মানছে না ; আমি তোমাকে একান্ত-ভাবে চাই। আমার করবার মধ্যে আছে শুধু—পোড়া কাগজে পোড়া পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি লিখে যাওয়া। আগের চেয়েও তুমি আজ অনেক বেশী আমার হৃদয় ছেয়ে আছো। তোমার একা নিঃসঙ্গ—

এথেল

প্রিয়তমা বধূ আমার, ২৪শে জুলাই, ১৯৫২

বিশ্বাস করো, সেদিন আমাদের দেখা হবার পর থেকে আমি যেন মেঘের ওপর পা দিয়ে হাঁটছি। নতুন পোষাকে তোমাকে চমৎকার দেখায় মনে হয়, তুমি যেন তোমার চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছ সঞ্জীবতার

হাওয়া আর সেই সঙ্গে, প্রিয়তমা, তোমাকে ঘিরে এক মহানন্দময় দিনের সম্ভাবনা।

মাইকেল আর রবী বাইরে গিয়ে নতুন বন্ধুদের পেয়ে সুখে আছে। এতদিন মার ওপর ছিল ওদের ভার; এবার ওরা যদি মার ভার নেয়, হপ্তায় একবার করে যদি আমার বুড়ি মাকে ওরা দেখতে যায়—তাহলে ওদের সঙ্গে কথা বলে মা প্রাণে শান্তি পাবেন। সত্যি, সুন্দর চিঠি লিখেছে মাইক। আমাদের মামলা সম্পর্কিত যে ব্যাপারগুলো ওর মাথায় ঢুকছে না, যতদূর মনে হয় সে সব বিষয় ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার মত ঢের হৃদয়বান লোক পাওয়া যাবে।

প্রিয়তমা, দিনগুলো বড় বেশী দীর্ঘ। সময় বুকে মাটি টেনে চলেছে। আর সেই সারাটা সময় তোমার পাশেই তো আমার থাকার কথা। তবু সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমরা জানি জয় আমাদেরই। তুমি নাও আমার হৃদয়-উজাড়-করা ভালবাসা।

জুলি

প্রিয়তম, ৩রা আগষ্ট, ১৯৫২

তুমি ধারণা করতে পারবে না—আমি কি রকম মুগ্ধ, আচ্ছন্ন মাতোয়ারা হয়ে আছি! বেতারে 'টস্ক বুড়ো'-র গরমকালের ঐক্যতান শুনছিলাম। লোকটা যেন সুরের যাদুকর; সে যে কি মধুর নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস হয় না। ও কথা এখন তোলা থাক প্রিয়তম—এবার আমার মনের মানুষটার দিকে মন দিই। এই বেলা বলে রাখি, (সবিস্তারে বুধবার বলব) আমার ভাই বর্নি দেখা করতে এসেছিল। ওর সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। ফলে সাধারণত সপ্তাহের শেষের দিকে মনের মধ্যে যে রকম একটা হাহাকার জেগে ওঠে, এবার তা হয় নি।

জুলি প্রিয়তম, এইমাত্র তোমার আরেকটি চিঠি পেলাম। তোমার সমস্ত চিঠিই যেন পত্রকারে লেখা কবিতা। তুমি সবসময় এত চিন্তাশীল, এত আন্তরিক যে, একদিন হয়ত আবেগের অতিশয্যে তোমায় খেয়ে ফেলব। তোমাকে ভালবাসি, প্রিয়তম।

এথেল

প্রিয়তমা,

৩রা আগষ্ট, ১৯৫২

আরও একটা দিন, আরও একটা সপ্তাহ, আরও একটা মাস। আমাদের ছাড়াই সময় বয়ে চলেছে। আমরা পড়ে আছি একটানা অন্তহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে। যা কিছু আমাদের প্রিয়, সমস্ত কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। শুধু কাড়তে পারেনি একটি মাত্র জিনিষ—আমাদের আত্মমর্যাদা। জীবনের মূল আদর্শগুলো বার বার জোর গলায় ঘোষণা করা, প্রেরণা নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্যে অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতিপটে জাগিয়ে তোলা—এ ছাড়া আর কিভাবেই বা মানুষ মনের জোর রাখতে পারে?

সময়কে পরাভূত করার জন্যে সাধারণ বই পড়া, লেখা আর বাধাবিপত্তির ভাবনাগুলো মন থেকে মুছে ফেলা। কিন্তু তাই বলে কখনই প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনাগুলো যেন চোখের আড়ালে না যায়।

প্রিয়তমা, সেই চেষ্টাই তো আমরা করে চলেছি। হয়ত আমাদের জীবনে অনেক কিছু করবার আছে বলেই, হয়ত জীবনকে আমরা একান্তভাবে ভালবাসি বলেই—এই বিচ্ছেদ আমাদের কাছে এত দুঃসহ। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে মজা এইখানে যে, আমরা এতসব জানি বলেই আমাদের মনের একটুও জোর কমে না।

ছেলেদের নিয়ে গরমের ছুটিগুলো সেই যে আমরা একসঙ্গে কাটাতাম মনে আছে? গ্রামাঞ্চলে কিম্বা সমুদ্রের ধারে সবাই আমরা

এক জায়গায়—ভাবতে পারো? যখন দেখি, দেশের মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে সমস্ত রকমভাবে চেষ্টা করছে—আমাদের এই নিদারুণ বেদনা ও দুর্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু নিজেকে বড় বঞ্চিত বলে মনে হয়। দুটো বছর—আমাদের ছেলেদের পক্ষে বিশেষ জরুরী দুটো বছর আমাদের কাছ থেকে ওরা যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। শীগ্‌গির শীগ্‌গির ছেলেদের কাছে ফিরে যাই—এইটুকুই আমার একমাত্র কামনা। শয়তানের দল! দুজন নিরপরাধ স্ত্রী পুরুষ আর তাদের নিরপরাধ সন্তান সন্ততির গলায় পা দিয়ে হাড়মাস শুষে নিয়েছো। যা নেবার তার চেয়েও বেশী নিয়েছো, এবার ছেড়ে দাও।

আমরা আশা করছি যদি আমরা এই মিথ্যে মামলার মুখোস-খুলে দিতে পারি তাহলে এতদিন ধরে যে বেদনা আমাদের বুক বিদীর্ণ করেছে তা সার্থক হবে। অন্তত অন্য কোন নিরপরাধ মানুষকে আমাদের মত এত আনায়াসে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না। ভালবাসা নিও।

জুলি

প্রিয়তম, ৭ই আগষ্ট, ১৯৫২

আজ এত একা লাগছে যে, তোমাকে না জানিয়ে পারছি না। আজ আমি জানতাম আমার ঝুলিতে ছিল আনন্দের খবর। সে খবর দুহাতে আমি বিলিয়েছি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে যে বিপুল আনন্দ পাই—আমার পোড়া কপাল, সে আনন্দ ডুবে যায় বিচ্ছেদের অন্তহীন সময় সমুদ্রে।

এথেল

প্রিয়তম, ১১ই আগষ্ট, ১৯৫২

অনেক কাণ্ডের পর শেষে আজ সকালে মোটামুটি সুন্দর একটা চিঠি লিখলাম ছেলেদের। কার্বন কপি পাঠাবার জন্যে তুমি যে অনুরোধ জানিয়েছো সে কথা ওদের লিখে দিয়েছি। ফটো পাঠাবার জন্যেও বিশেষ করে বলেছি। 'উৎফুল্ল বুধবারে' সবিস্তারে তোমাকে সব বলব। হায় রে, আজ মোটে 'ম্রিয়মাণ সোমবার' ('দুখিনী রবিবার' পার হয়েছি সবে) আর 'উৎকণ্ঠিত মঙ্গলবারে'র এখনও তো দেখাই নেই!

কি আশ্চর্য, আমি তোমাকে যে চাই। ভালবাসা।

এথেল

পুনশ্চ।—প্রিয় আমার, তুমি আমার সম্পর্কে বড় বেশী বাড়িয়ে বলো। সত্যি, আমার ভাল লাগে না—আমি যা নই তাই তুমি যে বলো।

প্রিয়তমা, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫২

তোমার চিঠি আমি যতবারই পড়ি, নতুনতার স্বাদ পাই। আমাদের মাথার ওপর ঝুলছে মৃত্যুর খাঁড়া; তাছাড়া যে ধরণের মামলায় আমাদের জড়ানো হয়েছে, যে ধরণের নিগ্রহ এখানে আমরা ভোগ করছি—সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের মনের অনুভূতিগুলো প্রচণ্ড এবং চরম আকারে দেখা দেয়। সীমাসংখ্যাহীন হতাশায় আমরা জর্জরিত হই। কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমরা দেখেছি, এই অবস্থার মধ্যেই আমরা পেয়েছি শান্তি ফিরে পাবার জন্যে সংগ্রামে দুরন্ত প্রেরণা।

পুরোপুরি মুক্তি আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। এই নির্ভুল লক্ষ্য সামনে রেখে নিজেদের অবস্থাটা সঠিকভাবে তলিয়ে বুঝতে আমরা সমর্থ হয়েছি—তার জন্যে নিজেদের আমরা ধন্যবাদ দিই।

প্রিয়তমা, আমাদের কাছে আমাদের জীবন ও স্বাধীনতা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড়। কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো আজ সারা দেশের সামনে, তার মর্মমূলে ঘা দিচ্ছে আমাদের মামলা। সাহসে বুক বাঁধো, প্রিয়তমা, আমরা একা নই। ন্যায়বিচার ও শান্তির দাবি নিয়ে যে বাহিনী দিন দিন দলে ভারী হচ্ছে, আমরা তারই একটি অংশ।

তোমার মনের মানুষ জুলি

প্রিয়তমা, ১৭ই আগস্ট, ১৯৫২

আর সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আমাদের বন্ধুদের কেউ কেউ ছুটি শেষ করে ফিরে আসবে। আবার তারা ম্রিয়মান হৃদয়ে নতুন করে বল দেবে। সেদিন আমার বোনের সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লাগল। শিকাগো সম্মেলনের* খবরাখবর এবং কমিটির অফিসের অনেক উৎসাহব্যঞ্জক কথা ওর কাছে শুনলাম।

আমার পরিবারের লোকদের দেখা করতে আসা ক্রমেই সার্থক হয়ে উঠছে। এ কথা বললে নিশ্চয়ই বেশী বলা হয় না যে, যারা দেখা করতে আসে তারা প্রত্যেকবারই দেখা করে উপকার পায়। আমার পরিবারের লোকেরা সর্বদাই বলে, আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবার পর মনে তাদের উৎসাহ বাড়ে এবং বাইরে গিয়ে যাদেরই সঙ্গে তারা আমাদের মামলার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে তাদেরই মনে সেই উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, পি-কের† সঙ্গে সেদিন দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। দুজনে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে অনেক কথা হল। লোকটাকে সত্যি বেশ ভাল লাগল।

*দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোজেনবার্গ কমিটির প্রতিনিধিরা এই উপলক্ষে শিকাগো শহরে এসেছিলেন।

†জেল অধ্যক্ষ প্রিন্সিপাল কীপার

এথেল তার চিঠিতে লিখেছে, গত সপ্তাহে বি—এসে নিউইয়র্কে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং বলেছেন : ওর কাছে মাইকেল আর রবী বেশ মনের আনন্দে আছে, উনি ওদের বেজায় ভালবাসেন। রবী আজকাল আনাচে-কানাচে লুকোয় না, লজ্জা ভেঙ্গে গেছে। মাইকেলের গায়ে মাংস লেগেছে।

প্রিয়তমা আমাদের এবার শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে ; দারুণ ঝড় উঠছে, আমাদের তৈরি থাকতে হবে। এসো আমরা সংকল্প নিই : যা বাস্তব তারই ওপর শক্ত পায়ে ভর দিয়ে আমরা দাঁড়াবো ; বাহ্য ঘটনাস্রোতে, দাঁতমুখ-খিঁচোনো বিভীষিকার বন্যায় আমরা কিছুতেই ভেসে যাবো না, আমরা এ অগ্নিপরীক্ষা পার হবো—এ বিশ্বাস আমার আছে। তবু তৈরি থাকতে হবে। আমার বুকের মধ্যে যত গান আছে আসছে বুধবার আমি তার মালা গেঁথে নিয়ে যাব তোমার কাছে। অনেক কষ্ট করে কাগজে যে কথা লিখি আমি জানি তার চেয়ে আমার গান তোমার কাছে ঢের বেশী অর্থপূর্ণ হবে। ভালবাসা।

জুলি

১৯শে আগস্ট, ১৯৫২

জুলি প্রিয়তম,

তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আকুল হয়ে আমি চোখের জল ফেলছি। কি বেদনা তোমার আমি জানি ; কেননা, সে বেদনা তো আমারও। চারদিক থেকে যে হীনতা আর অসম্মান আমাদের পিষে মারছে, তার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে ঘৃণার সমুদ্র আর আমি যেন তার তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসছি। প্রিয়তম, ব্যাকুল বাহু দিয়ে আমি তোমায় বুকে জড়িয়ে নিই, তুমি উষ্ণ হও আমার উত্তাপে। তোমার প্রয়োজনের তুলনায় আমি কত সামান্য তা আমি জানি। তবু আমার ভাবতে ভাল লাগে—আগাগোড়া যে অসমান্য দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছ তুমি, তার পেছনে আমার খুব সামান্য এতটুকু দান আছে।

তোমার অচঞ্চল সহধর্মিণী এথেল

ওগো প্রিয়তমা, ২৪শে আগষ্ট, ১৯৫৪

তোমার জন্যে বড্ড একা একা লাগে। আমাদের একেই ভোগান্তির শেষ নেই তার ওপর আবার অনর্থক যখন নতুন উপসর্গ এসে জোটে তখন সত্যিই অতিষ্ঠ না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু তাহলেও গোটা অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ঘটনা আমাদের বিচার করতে হবে।

পড়লেই বুঝতে পারবে, প্রকৃত পক্ষে আমি লিখছি যাতে নিজের উপকার হয়। অনেকটা স্বগতোক্তির মত। দেখা হলে একটা বিশ্রী ঘটনার কথা বলব।

শেষের দিকে কয়েকটা ফটো একটু বেশী রকম ট্যারা বলে মনে হচ্ছে। তুমি যখন রবীকে কানের যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখার কথা লিখেছো, সেইসঙ্গে এটুকুও যোগ করে দিও যে মাইকেলের চোখদুটো যেন একবার পরীক্ষা করা হয়।

আমি আমার বোনকে ছেলেদের সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনার কথা বিষদভাবে বলে দিয়েছি। ওর সঙ্গে বেশ মন খুলে কথা বলা গেছে। কথা বলে যতটা সম্ভব, ওকে চাঙ্গা করে দিয়েছি। প্রিয়তমা, যেহেতু আমরা জান্‌দার বুঝদার মানুষ তাই বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জনদের সান্ত্বনা দেবার কাজটা আমাদেরই করতে হয় এবং তাতে একমাত্র মন খুশি হওয়া ছাড়া আর কিছুই আমরা পাই না। আমার সমস্ত হৃদয় তোমারই জন্যে উন্মুখ প্রিয়তমা।

জুলি

প্রিয়তমা আমার, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

দেখা হবার পর মা প্রথম কথাই বললেন, 'তোর এথেল কি সুন্দর দেখতে হয়েছে, ও তোকে ভালবাসা জানিয়েছে।' মার সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লাগল। ছেলেদের চোখে দেখে এবং ওরা ভাল

জায়গায় আছে জানতে পেরে মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এবার যেটা আমাদের ভাবনার বিষয়, ইস্কুলে গিয়ে ছেলেদের কেমন লাগবে। পরের বার যখন ওরা দেখা করতে আসবে তখনই ওদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমরা জানতে পারব।

প্রিয়তমা, গরমকাল শেষ হল। সময়টা ভালই গেছে। এবার আমাদের ভাগ্যনির্ণয়ের পালা। আমাদের মামলার চূড়ান্ত জয়পরাজয় এবার নির্ধারিত হবে।

সুখের দিন সেই বুধবার আগত প্রায়। ভালবাসা জেনো।

জুলি

এথেল, প্রিয়তমা আমার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

চিঠি লিখতে বসে এখন অনেকটা ভাল। কিন্তু দিনটা যা গেছে বলার নয়। ছেলে দুটোর জন্যে ভেবে ভেবে সারা হয়েছি। বুকটা টনটন করে উঠেছে তোমার জন্যে আর দারুণ জ্বরে ছিঁড়ে পড়েছে মাথা। যাক, দুঃখের কথা শেষ হোক—বুধবার যে এসে গেল।

মনে হচ্ছে, বহু লোকের চোখে আমাদের মামলার রাজনৈতিক প্রকৃতিটা ধরা পড়েছে। এ মামলার গভীর তাৎপর্য তারা বুঝতে পারছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তির জন্যে সংগ্রামের একটি বড় রকমের ধাপ হল আমাদের জন্যে সুবিচার আদায় করা—এ কথা বুঝতে পারার দরুণই এত লোক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

খুব শক্ত লড়াই। তাহলেও আমাদের হিম্মৎ আছে! যুগের প্রয়োজনে এবং ন্যায়ের জন্যে আমাদের লড়াই। চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

ধীর পদক্ষেপে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রধান প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে চলেছি—তা হল পুনর্বিচারের লিখিত আদেশ দেবার তারিখ। আমি আশাবাদী। কিন্তু কোর্টে কোনই

মাথার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত কি করে বসে কিছু বলা যায় না।

সব চেয়ে বেশী চাই আমি তোমাকে।

তোমার বিশ্বস্ত স্বামী জুলি

প্রিয়তমা এথেল আমার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

ছেলেরা নিজেরা নিজেদের খবর জানিয়ে অনেকদিন কোন চিঠিপত্র দেয়নি—এ নিয়ে যখন আমরা আলাপ আলোচনা করছিলাম, তার পরই আমাদের কাছে চমৎকার খবরসুদ্ধ চিঠি এসে হাজির। ওদের ফটোগুলো দেখার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে আছে। চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের জবাব লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমিও তাড়াতাড়ি ওদের চিঠির জবাব দিও। আমরা ওদের জিজ্ঞেস করলে পারি ওখানে বাচ্চাদের কোন পাঠশালা আছে কিনা; থাকলে রবী সেখানে ভর্তি হতে পারে। ওদের চিঠির সুর থেকে মনে হয়, ওরা নির্ভাবনায় আদরযত্নের মধ্যে আছে। আমাদের মামলার দরুণ ওদের ওপর দিয়ে যে ঝড় যাচ্ছে, এভাবে থাকলে ওরা তার ধাক্কা সামলে উঠতে পারবে।

এ সপ্তাহের শেষে নববর্ষের কার্ড পাঠাবো ঠিক করেছি। যখনি কোন ইহুদী পরব সামনে আসে, তখনই আমার মনে পড়ে যায় আমার বাড়ির কথা। পরবের দিনগুলো কি আনন্দে যে কাটাত। এবারকার পরবের দিনটা ওরা ভারি কষ্ট পাবে। বিশেষ করে কষ্ট পাবেন আমার মা। আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা সবাই কান খাড়া করে থাকব সর্বোচ্চ আদালতের কি রায় হয় জানার জন্যে। ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তম জুলি, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

ক্রমেই বেশী বেশী করে আমি নিজের মধ্যে গুটিয়ে যচ্ছি। তুমি যখন কাছে থাকো, একমাত্র তখনি আমি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে

আসি। যত দিন যাচ্ছে আমাদের বিচ্ছেদের জ্বালা ততই দুঃসহ হয়ে উঠছে। যত দিন যাচ্ছে আমার মনের ওপর আঘাতের তীব্রতা ততই নিদারুণ হয়ে হয়ে উঠছে।

যত চাপই আসুক আমরা কখনই আমাদের নীতি থেকে একপা-ও সরে যাবো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুকের জ্বালা কই একটুও তো কমে না।

প্রিয়তম, আমার মধ্যে তোমাকে ভালবাসার শক্তি এত বেশী যে, তা আমার বেদনাকে ছাপিয়ে যায়। তবু তুমি আমাকে বুকের কাছে টানো। আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। একান্তভাবে যে তোমাকে চায়। তোমার চিরদিনের সহধর্মিণী—

এথেল

আপীল সর্বোচ্চ আদালতে

ওগো প্রিয়তমা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা দলিলটা পড়া সত্যিই খুব দুষ্কর। আমি বলি কি তুমি শুধু ডেভ্ আর রুথ-এর এজাহার দুটো খুঁটিয়ে পড়ো। এটা একটা দরকারী অংশ।

অনেক অজ্ঞাত বন্ধুর কাছ থেকে নববর্ষের কার্ড পেয়েছি। আমরা বন্দী হয়ে থাকলেও এইসব অচেনা মানুষেরা আমাদের মনে করেছে দেখে সত্যিই ভাল লাগে।

আমাদের যারা আইনের দোহাই দিয়ে খুন করতে চাইছে, তাদের কাজ যতই ঘৃণ্য হোক না কেন—তোমাকে তা স্পর্শ করতে পারবে না ; কারণ, তুমি নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। এই নতুন বছর মিলিয়ে দিক আমার ঘর-সংসার, আমরা ফিরে যাই ছেলে দুটোর কাছে।

চিরদিন তোমার জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

জেলখানায় এই নিয়ে তোমার তৃতীয় জন্মদিন। এভাবে বন্দী করে রাখার পেছনে কোন ন্যায় নেই, কোন বিচার নেই। আমি ভেবে পাই না তোমার পক্ষে এ অবস্থার জন্মদিনে কেমন করে সুখী হওয়া সম্ভব।

যত যাই হোক, তোমার এই বিশেষ দিনটিকে আমরা সম্মান দেখাব ; নিজেদের আমরা নতুন করে এই বলে উৎসর্গ করব আমাদের পুত্র পরিবারের মঙ্গলের জন্যে, সকল পরিবারের মঙ্গলের জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা লড়াই করে যাবো

শুভ জন্মদিন, প্রিয়তমা স্ত্রী আমার। খুব আশা করছি, তোমার এর পরের জন্মদিনটা আমরা নিজেদের বাড়িতে বসে পালন করব— তুমি আমার পাশে থাকবে, ছেলেরা থাকবে ঘিরে। মনে সাহস রাখো, আমরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে বিচারের পুরো নথিটা পড়লাম। আমার সুস্পষ্ট মত এই যে, আমাদের উকিল আমাদের অধিকারগুলো সর্বতোভাবে রক্ষা করেছেন এবং বিচারক ও ডি-এর আচরণের দরুণই আমরা ন্যায্য ও নিরপেক্ষ বিচার পেতে পারিনি। সব চেয়ে শয়তানি করেছে প্রাদেশিক আপীল আদালতের রায়; আইনগত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে নিয়মতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার যে রক্ষাকবচগুলো আছে তা মেনে এবং আমরা যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছি সে সম্বন্ধে একদম চুপচাপ থেকে তারা এই শয়তানি করেছে।

কামনা করি, তোমার জীবনে সুখের দিন আসুক। হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা নাও।

জুলি

প্রিয়তম,

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

বুধবার তুমি চলে যাবার পর আমি যেন আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়লাম। তুমি তোমার যে সমস্যার কথা আমাকে বলে ছিলে তাতে স্বভাবতই আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক ব্যবহার দেখে বরাবরই আমি ব্যথা পেয়েছি; সুখের বিষয়, এক্ষেত্রে আঘাতটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আমি আবার নতুন শক্তি, মনে নতুন বল ফিরে পেয়েছি। বিশেষ করে আমার আদরের স্বামী যখন আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে।

প্রিয় আমার, আমি তোমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে কি যে ভালবাসি। যে অসামান্য গুণাবলী আমার ওপর তুমি আরোপ করো, আমার খুব

ইচ্ছে করে সেই সব গুণের অধিকারী হতে। খুব ইচ্ছে করে তোমার মত হতে।

প্রিয়তম, তোমার পাঠানো সুন্দর কার্ডের জন্যে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই। তোমাকে দিলাম আমার সমস্ত হৃদয়।

তোমার সহধর্মিণী এথেল

প্রিয়তমা,

২রা অক্টোবর, ১৯৫২

তোমাকে এত ভালো এবং এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে দেখেই মনটা খুশী হয়ে গেল। আমি যখন বলি—তোমাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে খুব একটা ফুর্তির ভাব হয়। তোমার সঙ্গে মিলে নিজের মধ্যে জোর পাই আর জয় সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস জাগে—বিশ্বাস করো, আমার তলদেশ অন্তরের গভীর থেকেই তখন সেকথা উঠে আসে।

সর্বোচ্চ আদালতের রায় বেরোতে দেরি নেই। ত'তে যেন আমরা মুষ্‌ড়ে না পড়ি। বরং এসো আমরা নিজেদের সাহায্য করবার জন্যে যা করতে পারি করে যাই। হতাশার মধ্যে কেউ যেন আমাদের পিষে ফেলতে না পারে। আমরা বুক টান করে লড়েছি এতদিন। আমাদের বুকের কল্‌জে ছোট নয়।

নিজের কথা বলি। সারাক্ষণ আমার কাজ হল বিচারের নথি পড়া, আমাদের উকিলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে বলবার কথাগুলো সবিস্তারে টুকে রাখা এবং একেকটি বই একদিনে পড়ে শেষ করা। ষষ্ঠ বইটা ধরেছিলাম কিন্তু মাঝের থেকে মাঠে খেলা শুরু হয়ে যাওয়ায় পড়াটা একটু পিছিয়ে গেছে। মনে হয় এ বছর খেলাটা খুব জমবে। তুমি আর আমি দুজনেই বোধহয় ডজার্স দলের সমর্থক—তাই না?

স্বভাবতই আমি আশা করেছিলাম আমাদের সম্পর্কে কোন কোন কাগজে আমাদের সমর্থন করে লিখতে শুরু করবে—অন্তত

উদারপন্থী কাগজগুলো তো বটেই। যাই হোক, সমস্ত ব্যাপার আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। রাজনৈতিক আবহাওয়া এখনও সুবিধের নয়, এককালে যাঁরা উদারপন্থী এবং প্রগতিশীল ছিলেন দারুণ ভয়ে তাঁরা মুখ বন্ধ করে আছেন। এখনও আমি আগের মতই আশাবাদী ; তবে যে কোন সম্ভাবনার জন্যে তৈরী হয়ে আছি।

এই সময়টা নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। বার বার মনে পড়ছে তোমাকে। শুধু যদি তোমাকে দুটো বাহুর মধ্যে পেতাম। ভালবাসা।

জুলি

প্রিয় স্বামী আমার, ৩রা অক্টোবর, ১৯৫২

নিজের জন্মদিনকে নিজেই স্মরণীয় করে তুলে ছেলেদের কাছে চিঠিটা লিখে পর্যন্ত মনটা খুব ভাল লাগছে। আরও একটা কথা শুনে তুমি অবাক হবে—নতুন একটা পোষাক করেছি, সেই থেকে মনে বেজায় ফুর্তি। তোমাকে দেখাতে না পারা পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। নিঃসন্দেহে জেনে রেখো, পোষাকটা আমার গায়ে দারুণ মানিয়েছে।

বরাবরের মতই সেদিনও কথা অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে মনে আবার নতুন করে জোর পেয়েছি। প্রিয়তম, তোমার এত ক্ষমতা, এত খাটতে পারো, তুমি এত মধুর আমি মনে মনে তোমাকে পূজো না করে পারি না। আবার জানাই আমার গভীরতম ভালবাসা আর ধন্যবাদ।

চিরদিন তোমার এথেল

প্রিয়তমা, ৫ই অক্টোবর, ১৯৫২

সুন্দর চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই, আবার একসঙ্গে মিলবার জন্যে আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব।

খবরের কাগজে দেখলাম ১৩ই অক্টোবরের আগে সর্বোচ্চ আদালত আমাদের আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবে বলে মনে হয় না। নথি পড়ে আমি যে নোট তৈরি করেছি, সেটা ২৬ পৃষ্ঠার ওপর হয়ে গেছে। সেটাকে আরও ছোট করে মাত্র কয়েকটা বিষয়ের ওপর আসছে বুধবার আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করব। বিচারের নথি খুঁটিয়ে পড়ার কাজ শেষ হয়েছে। এখন আমি তোমার এবং ম্যানির সঙ্গে বসে কমপক্ষে ঘণ্টা ছয়েক এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

শেষবার তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর কেবলি আমার মন কেমন করেছে তোমার জন্যে। আমি চাই তোমায়, তোমার দুঃখ-হরা জ্ঞানগর্ভ বাণী, আমি চাই তোমার ভালবাসার উষ্ণতা। আমি নিজের মধ্যে অনুভব করি ক্ষুধার এক মহানল, কিন্তু মনে মনে আমি আমার হৃদয় দিয়ে জানি আমরা আবার এক হবো।

একনিষ্ঠ জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ৯ই অক্টোবর, ১৯৫২

তোমার ছেলেরা শেষ যে চিঠি দিয়েছে তা পড়ে আনন্দে নিশ্চয় তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। যাঁদের কাছে ওরা এখন আছে, তাঁরা চমৎকার মানুষ। তাঁদের যত্নে ওরা খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করছে। রবীকে কিণ্ডার গার্টেনে ভর্তি করার ব্যাপারটা থেকে বোঝা যায় তাঁরা আমাদের প্রস্তাবগুলো কাজে লাগাতে একটুও দেরি করছেন না। মাইকেল যাতে পিয়ানো বাজাতে শেখে তার জন্যে তুমি একবার লিখে দেখতে পারো।

আসছে সোমবার আমাদের আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত হবার কথা আছে। কি হয় না হয় দেখে তারপর ওদের চিঠির আমি জবাব লিখব। আর তুমি যদি দেখ তুমি ওদের লিখতে পারছ দয়া করে তুমিই তাহলে লিখে দাও।

আশা করছি আসছে সোমবারের আগেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। না যদি হয় এই চিঠি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ষ্টেশন ডব্লিউ-এফ-এ-এস, সোমবার রাত ১২ টা-৪৫ মিনিটে যখন খবর বলবে তখনই ধরলে সম্ভবত সর্বোচ্চ আদালতের রায় জানতে পারবে।

মনে রেখো, প্রিয়তমা, বিচারের ফল যাই হোক না কেন, আমরা যে নির্দোষ সেই নির্দোষই থাকব; যেমন আমরা একদিন নীতির ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই করে এসেছি, তেমনি আমরা নীতির ওপর দাঁড়িয়েই পূর্ণ মুক্তির জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবো।

একটা বিষয় খুব পরিস্কার: এ দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ভয় দিয়ে ঠাসা; যারাই একটু ভিন্ন মত পোষণ করেছে, তাদেরই বিরুদ্ধে ক্রমেই ক্রোধ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এর অন্য পিঠে দেখা যাচ্ছে তালে তাল দিয়ে বাড়ছে আমাদের কমিটির ক্রমবর্ধমান আন্দোলন। যেভাবে আমরা একদিন নিজেদের চালিয়ে এসেছি, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপের কারণ নেই। আমাদের আত্মসম্মান আমরা অক্ষুণ্ণ রেখেছি। প্রিয়তমা, নিজেদের সম্পর্কে অনায়াসে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি।

আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক নীতির ওপর, এদেশের অসাধারণ সুন্দর সাধারণ মানুষের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস করে যে আমরা ভুল করিনি অনাগত কালই তা প্রমাণ করবে। আজ এ অবস্থায় তোমাকে আমি আমার ভালবাসা দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু আমি জানি আমার হৃদয়মনে তুমিই সবার আগে বিরাজ করছ।

অনুরক্ত জুলি

প্রিয়তমা,   তারিখ নেই

আমাদের যখন আলোচনা হচ্ছিল, আমাদের মাঝখানে তুমি বসেছিলে রাজরাণীর মত। তোমাকে নতুন পোশাকে কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল! তুমি দেখা দিয়েছিলে সুলক্ষণার মত। তোমার মনের সুর ছিল সেদিন তোমার পোশাকের সুরে বাঁধা। আমাদের আলোচনা হয়েছিল সেদিন অতিচমৎকার; আজ পর্যন্ত কমিটির কাজের ফলাফলও খুব ভাল—তাই আমার আনন্দের শেষ নেই।

আমাদের সামনে এখন আইনের আর কোন্ কোন্ রাস্তা খোলা আছে, আমরা জানি। কাজেই সেই মত নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারব। আলোচনায় আমরা থাকায় অনেক ফল হয়েছে। তোমার কথা বলতে গেলে, আমি তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি, সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসি। তোমার জন্যে এবং তোমার সঙ্গে দেখা করে এসে এখন আমি খুব ভাল আছি। নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়ে সর্ব্বোচ্চ আদালতের রায়ের জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি।

কাল প্রায় সারাটা দিন বসে বসে আমি বিচারের নথির ওপর লেখা আমার নোটের সংক্ষিপ্তসার করেছি। প্রিয়তমা, আমাদের সংগ্রামের এক নতুন পর্বে আমরা যেন প্রবেশ করছি। যত বাধাই থাক, আমাদের চূড়ান্ত জয়ের দিন আসন্ন। ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তম,   ১৩ই অক্টোবর, ১৯৫২

তোমার সঙ্গে আবার যতদিন না দেখা হয় একটু উৎসাহের কথা শুনিয়ে রাখি। আমার কথা বলতে গেলে, আমি আগেও যেমন ছিলাম এখনও তেমনি আছি—কিছুরই বদল হয়নি। আমার সাহস, মুখের ভাব, বোধশক্তি আগের মতই আছে। তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে, আমাদের মামলায় সর্বোচ্চ আদালত ন্যায় বিচারের ধার কাছ দিয়েও যায়নি।

১২টা ৪৫ মিনিটের রেডিওর খবর আমি জানতাম। কিন্তু আমি মাকে বলিনি। কারণ আমি চাইছিলাম বাড়িতে যাবার পর যখন চার-পাশে আরও লোকজন থাকবে তখনই যেন মা দুঃসংবাদটা শোনেন। মার যাতে কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়, সেটাই আমাদের দেখা দরকার; কেননা মার সবটাই এখন আবেগ এবং তার ওপর মন একদম ভেঙে গেছে। আমি অনেক করে মার মন হাল্কা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এভাবে দেখা করার ভেতর দিয়ে দুঃখ হাল্কা করা খুবই শক্ত কাজ।

আমাদের দেশের সরকারের আসল চেহারা যে কি তা ওয়াশিংটনের সরকারী প্রচার শুনে বোঝা যায় না। আমাদের মামলার ব্যাপারে আদালতের আচরণ থেকেই সরকারের আসল চেহারা নগ্নভাবে ধরা পড়ে। জনমতের আদালত পাছে এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলে জবাব দেয়, সেই ভয়েই সরকার সাত-তাড়াতাড়ি আমাদের মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে চায়। আমি আশা করি, আমাদের দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের এই কাণ্ডকারখানা দেখে দলে দলে মানুষ আমাদের পক্ষ নিয়ে বিদ্যুৎবেগে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। লড়াই শেষ হয়ে যায়নি, জনসাধারণ তাদের কথা শুনতে বাধ্য করবে।

অবশ্যই আমি বুঝি, পরের পর প্রত্যেকটি বৈধ উপায় থেকে আমাদের বঞ্চিত করার ফলে আমাদের পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও আমরা তো বাস্তববাদী, আমরা জানি আমাদের মত এই রকম একটা রাজনৈতিক মামলায় অন্যান্য আরও অনেক বিষয় কাজ করে। তার প্রভাব বড় কম নয়।

আমি বুঝি ছেলেদের কাছে আমার চিঠি লেখা উচিত। ওদের চিঠি লিখতে এমনিতে তো ভালই লাগে। কিন্তু এই সময়টাতে কিছুতেই হাত উঠছে না। হয়ত তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আমি ওদের চিঠি লিখতে পারব।

প্রিয়তমা, এবার থেকে যখন আমাদের দেখা হবে অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের কথা আমাদের বলে শেষ করতে হবে। কেননা এবার খুব দ্রুত এবং ঝড়ের বেগে ঘটনা ঘটতে থাকবে। আসছে বার যখন আমাদের দেখা হবে, তখন আমরা কে কি করব না করব একবার আলোচনা করে নেওয়া যাবে—কি বলো?

আবার আমি তোমাকে জানাতে চাই, প্রিয়তমা—তোমাকে এবং ছেলেদের আমি গভীরভাবে ভালবাসি বলেই আমি সাহস, বিশ্বাস আর স্থির লক্ষ্য নিয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হচ্ছি। গণতন্ত্রের নীতিতে এবং মানুষের মর্যাদায় আমরা আস্থাবান; তাই আমি বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরাই জয়ী হবো।

বিশ্বস্ত জুলি

প্রিয় ম্যানি, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৫২

আমাদের কপাল ভালো; সেদিন আলোচনার সময় তুমি এত ভাল ভাবে আমাদের তালিম দিয়েছিলে বলেই প্রশংসনীয় আত্মমর্যাদা ও আত্মসংযমের সঙ্গে এই প্রচণ্ড আঘাত আমরা সহ্য করতে পেরেছি। আমি মনে করি নিজেদের আচরণ সম্পর্কে এইভাবে বলবার অধিকার আমাদের আছে; নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে মনে ভাবা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর লাগে যখন দেখি উনুনে ফুটন্ত কড়াই এবং প্রকাশ্য দিবালোকে চক্রান্ত ক্রমেই ঘনিয়ে উঠছে আর সেই সময় দলে দলে মানুষ পালাতে গিয়ে ঢালু রাস্তায় নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছে। আর উদারপন্থীরা কাঁদো কাঁদো মুখে পালিয়ে গিয়ে দর্শকের ঝুটো আসনে বসছে।

সোমবার, ১৩ই অক্টোবর সর্বোচ্চ আদালত তার উচ্চপদের সুযোগ নিয়ে আইন গ্রন্থ থেকে 'ন্যায়বিচার' ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। এর মধ্যে একমাত্র প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম হলেন বিচারক ব্ল্যাক। যে

মামলায় দুজন ভদ্র তরুণের পিতামাতার জীবনমরণ নির্ভর করছে, যে মামলায় দেশের প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক কল্যাণের পক্ষে জরুরী আইনের প্রশ্ন জড়িত—সে মামলার পুনর্বিচার করতে না চেয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিল—আজ থেকে ন্যায্য নিয়মের পথ বাতিল হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে বাতিল হয়ে গেল মানুষের জীবন।

তাদের আচরণে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মামলাটা নেহাৎ একটা অছিলা মাত্র এবং বিচার হল শুধু প্রহসন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত। এই যে মহামান্য প্রতিষ্ঠানটিকে এতদিন আমরা চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করে ভেবে আসছিলাম, বোঝা গেল যে সমস্তই অসার।

এথেল

প্রতীক্ষা

প্রিয় ম্যাগি, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫২

কাগজে দেখলাম, পুরোদমে ছুটির মরশুম চলেছে। 'ন্যায়ের দণ্ড' যেহেতু আমাকে ধরে রেখেছে, সে আগেই হোক আর পরেই হোক কিছুতে 'কেনাকাটা' করতে দেবে না—তাই আমার হয়ে কাউকে ছোটদের জন্যে বই বাছাই করা এক মহা সমস্যা—এ ব্যাপারে খানিকটা কুল পাবার আশায় কাজটা করে দিতে হবে। 'গার্ডিয়ান' কাগজটা এলেই প্রায় লাফিয়ে পড়ি 'আমার বন্ধু হও টনি এবং আশ্চর্য্য দরোজা' এবং 'মানবগোষ্ঠী'—এই বইগুলো এদের দিতে চাই তো বটেই কিন্তু অন্যত্র আরও বইএর যে ফর্দ পাওয়া যাবে এতো তার সামান্য কণিকা মাত্র। আমি চাই যত বই আছে ভাল কার দেখেশুনে তারপর বাছাই করা হোক যাতে ওদের বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন বিকাশ হতে পারে। ফোনোগ্রাফ রেকর্ড সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

তুমি হয়ত ভেবে অবাক হচ্ছ কেন আমি খেলনা, পোষাক এসব সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করছি না। তা ঠিক নয়। ইদানীং আমি বিজ্ঞাপনের রাজ্যে ডুবে আছি। পেন্সিল দিয়ে কখনও কোনটার পাশে দাগ দিচ্ছি, কখনও কেটে রাখছি, এই হয়তো কোনটা পছন্দ হচ্ছে অন্য পরক্ষণেই আবার তা অপছন্দ করে সরিয়ে রাখছি।

আমি ঠিক করেছি এমন ভাবে বাঁচব, এমন ভাবে সব কিছু গুছিয়ে ভাবব—যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে শুধুই স্বামীর সাদর চুম্বন, সন্তানের কলমুখর স্বাগত সম্ভাষণ।

এথেল

প্রিয় ম্যানি, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

আজ আমার মন ছুটে যাচ্ছে ১৯৩৩ সালে। সে সময় দারুণ মন্দার বাজার। আমি সেওয়ার্ড পার্ক হাই-স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ি। আর্থিক দিক থেকে সংসারের তখন শোচনীয় হাল। বয়স সবে পনেরো হলেও চারিদিকের অবস্থা সম্পর্কে আমার বেশ টনটনে জ্ঞান ছিল। সামান্য যা পাওয়া যায় পয়সা রোজগারের জন্যে রবিবার রবিবার ফেরি করে চিনির সস্তা মিঠাই বেচতে স্যুরু করে দিতাম। বিক্রি খারাপ হলে ৪০ সেণ্ট আর ভাল হলে ৮০ সেণ্ট* পর্যন্ত একদিনে লাভ থাকত।

একদিন নীচু ইষ্ট সাইড এলাকায় ডিলাখি স্ট্রীটে রাস্তার মোড়ে দেখি এক সভা হচ্ছে। একজন বক্তা কী যেন বলছিলেন। শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম। টম মুন বলে এক শ্রমিক নেতাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পুরে রাখা হয়েছে—তাঁকে মুক্ত করবার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলবার কথা বক্তৃতায় বলা হচ্ছিল। বক্তার কাছ থেকে আমি একটা চটি বই কিনেছিলাম। তাতে মামলার পুরো বিবরণ ছিল। সেই রাত্রেই বইটা আমি পড়ে ফেললাম এবং পরদিন নিজে গিয়ে ৫০ সেণ্ট চাঁদা দিয়ে এলাম। তারপর আমি সেই বই বিলি করতে এবং মুনির মুক্তি-আবেদনে স্কুলের বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-পড়শীদের কাছ থেকে সই যোগাড়ের কাজে গেলে গেলাম।

আরও একটা ঘটনার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে! ১৯:৫। সিটি কলেজে আমি তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। নতুন যারা কলেজে ঢুকেছে, তাদের জন্যে একটা করে বিশেষ অনুষ্ঠান হত। প্রথম বার্ষিক ছাত্রদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। প্রোগ্রাম তৈরীর ভার থাকত ছাত্র কাউন্সিলের ওপর।

একবার এক অনুষ্ঠানে কলেজের প্রেসিডেণ্ট নিজেই প্রোগ্রাম তৈরীর ভার নিয়েছিলেন। তিনি করলেন কি—ফ্যাশিষ্ট-শাসিত

*আমাদের হিসেবে দুটাকা থেকে চার টাকা

ইতালী থেকে একজন ছাত্রকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করে আনলেন যাতে ফ্যাশিষ্ট রাজার সম্পর্কে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ভাল ধারণার সৃষ্টি হয়।

প্রেসিডেণ্ট যেই বলতে উঠেছেন অমনি চারিদিক থেকে ছেলেরা মুখ বাজিয়ে বিষম হট্টগোল জুড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত না বলেই তাঁকে বসে পড়তে হল। হট্টগোলের মধ্যে তাঁর শুধু একটা কথা কোনমতে শোনা গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আস্তাকুঁড়-চাটা লোকদের মত' নাকি আমরা আচরণ দেখিয়েছি। শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্যে ছাত্র কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট এডি আলেকজাণ্ডারকে বলতে ডাকা হল। এডি এসে দাঁড়াতেই সমস্ত হল নিস্তব্ধ। এডি বলতে আরম্ভ করল: 'আমাকে এই সর্তে বলবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, ফ্যাশিজম-এর বিরুদ্ধে কিছু আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমি আমার সেই সব ভাইদের কাছে আমার শুভেচ্ছা পাঠাতে চাই যাদের শৃঙ্খলিত করে রেখেছে, চোখে ধূলো দিয়ে রেখেছে ইতালির ফ্যাশিজম্।'

সত্যি কথাটা এত বেশী আঁতে ঘা দিল যে, ফ্যাসিষ্ট ছাত্ররা চুপ করে বসে থাকতে পারল না। তারা ছুটে এসে এডি আলেক-জাণ্ডারকে টেনে হিঁচ্ড়ে মাইক থেকে সরিয়ে দিল। ব্যাস্, তারপরই লাগ-লাগ করে লেগে গেল। প্রকাণ্ড হলে তিন হাজার গলায় গর্জে উঠল আওয়াজ 'ফ্যাসিজম্ ধ্বংস হোক!'

ঠিক এই সময়ে প্রেসিডেণ্ট খবর দিয়ে ডেকে আনলেন নিউ ইয়র্ক শহরের দাদাদের। তারা এসে একধার থেকে কলেজের ছাত্রদের বেধড়ক লাঠির আগায় পৌরবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে গেল। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দেখা গেল ছাত্রদের সকলেরই বুকে ব্যাজ আঁটা রয়েছে; তাতে লেখা: 'আমি আঁস্তাকুড়-চাটা। ফ্যাশিজমকে ঘৃণা করি।' পরে যেসব ঘটনা ঘটে—যেমন ইথিওপিয়ার বোমা, আগুন আর মৃত্যুর পিঠে করে মুসোলিনীর 'সভ্যতা' বয়ে আনা—তাতে প্রমাণ

হয়েছে, আমরা সেদিন খাঁটি কথাই বলেছিলাম। কিন্তু ২১ জন ছাত্রকে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হল।

স্কুলে যখন পড়ি, তখন স্কট্স্‌বরোর ছেলেদের মুক্ত করার আন্দোলনে আমি খুব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলাম। পড়াশুনার বাইরে, যে সময়টা পেতাম আমি বরাবর এইসব ভালো ভালো কাজে নিজেকে লাগাতাম। আরও হাজার হাজার কম বয়সী ছেলেদের মতই আমিও পড়াশুনা করতাম, অন্দোলনে অংশ নিতাম এবং শিখতাম।

১২৫তম ষ্ট্রীটের কাছে লেনক্স অ্যাভিনিউতে এক ওষুধের দোকানে আংশিক সময়ের জন্য কেরানীর একটা কাজ নিয়েছিলাম। নইলে চলছিল না। ইস্কুল থেকে কাজের জায়গায় যেতে রাস্তায় পড়ত নিগ্রোদের পল্লী। বৈষম্যমূলক আচরণ কাকে বলে সেখানে চোখের ওপর দেখেছিলাম। বস্তিগুলোতে পা ফেলবার জায়গা নেই এত লোক। ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। অন্য যে কোন পাড়ার চেয়ে জিনিসের দর টাকায় চার আনা থেকে আট আনা বেশী! বাড়ী ভাড়াও সংঘাতিক বেশী। পাড়ার সব দোকানেই কর্মচারীরা শ্বেতাঙ্গ। এমন বহু ঘটনা আছে যেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে পাশবিকতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

একদিন রাত্রে আমি দোকানের মধ্যে কাজ করছি, এমন সময় লেনক্স অ্যাভিনিউতে এক দুর্ঘটনা ঘটে। চলন্ত বাসের নীচে এক মধ্য বয়সী নিগ্রো চাপা পড়েন। তাঁকে তখনই সেই অবস্থায় ধরাধরি করে ওষুধের দোকানে তোলা হয়। একটা পা কেটে শরীর থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গিয়েছিল। গল্ গল্ করে রক্তের স্রোত বইছিল। ইমার্জেন্সীতে ফোন করে তক্ষুনি খবর দেওয়া হল। পৌণে এক ঘণ্টা বাদে যখন অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছুলো তখন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে ভদ্রলোক মারা গেছেন। তাঁর সেই তাজা রক্ত আমাকে নিজের হাতে মুছতে হয়েছিল। যারা মানুষকে এইভাবে অনায়াসে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়, তাদের অপরাধ আমি কখনও

ভুলব না।

অতীতের এইসব ঘটনার কথা আমি নতুন করে পড়ছি এই জন্যেই যে আমি বোঝাতে চাই—কতকগুলো জিনিস আছে যা ইস্কুলে কিম্বা বই পড়ে শেখা যায় না, শিখতে হয় নিজের চোখে দেখে।

এর থেকে খানিকটা বোঝা যাবে কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়ে আমি বড় হয়েছি। জীবনের এই অভিজ্ঞতাই আমাকে দস্তুর মত মানুষ করে তুলেছে। তারই দরুণ আমি হতে পেরেছি একজন প্রগতিশীল মানুষ। সেজন্যেই কি ওরা আমাদের বেঁচে থাকবার আর মোটে তিনটে সপ্তাহ সময় দিয়েছে? আমাকে ওরা ঘুরিয়ে ঘারিয়ে নানা কায়দায় বলে: 'নিজের স্ত্রীকে তুমি বাঁচাতে পারো, নিজেকে বাঁচাতে পারো। এসো একটা রফা হয়ে যাক। সরকার যা চাই তাই করো।'

দিনে দিনে যে সত্যকে আমি জেনেছি, আজ তা আমি অস্বীকার করব—একি সম্ভব? যে মূলমন্ত্র আমার অস্থিমজ্জায় মিশে আছে, আমি তা কি অস্বীকার করতে পারি? না, আমার পক্ষে কখনও তা সম্ভব নয়। আমি মিথ্যের সঙ্গে ঘর করে বাঁচতে পারব না। আমি যেভাবে জীবন যাপন করেছি, যে চোখে আমি দুনিয়াকে দেখেছি—তাতে ওরকম কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেই সঙ্গে এও খুব পরিষ্কার যে অপরাধ সাব্যস্ত করে আমাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে—আমি সে অপরাধ করতেই পারি না। সোজা কথা হল, আমরা দুজনে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ।

বড়দিনের উৎসব শুরু হল। ষোল বছর আগে এই সপ্তাহে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছিল। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর প্রথম আলাপ। আমার এথেলকে তো তুমি জানো। ওর গুণের কথা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। দুজনে আমরা কত সুখী হতে পারি। আমরা আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলতে চাই, ছেলে দুটোকে কাছে পেতে চাই। আমাদের দুরন্ত ইচ্ছে বাঁচবার।

তাই তো আমরা দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ি।

আমাদের জীবনে যাতে এটাই শেষ বড়দিনের উৎসব না হয়, তা দেখবার ভার দেশের মানুষেরা নেবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

তোমাদের জুলি

প্রিয় ম্যানি

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

মৃত্যুপুরীতে আজ বড়দিন। রোজকার মত আজও এক কাপ কফি দিয়েই সকালের জলযোগ সেরে নিলাম। তারপর আমার এই ছোট্ট ঘরের ঠিক মাঝখানটায় এসে দাঁড়ালাম। যেদিকে হাত বাড়াই হাত ঠেকে। আমার বাঁদিকে, আমার ডানদিকে, আমার পেছনে, আমার পায়ের নীচে, মাথার ওপরে যেদিকে তাকাই কংক্রিটের পুরু দেয়াল। ব্যতিক্রম শুধু সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ানো ভারী লোহার পাত। গরাদের ফাঁকগুলোই শুধু প্রকৃতির আবহাওয়ার একমাত্র প্রবেশ পথ।

আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাবলাম। ঘরটা শক্ত করে গাঁথা, তৈরি করার বাহাদুরী আছে—কিন্তু বড় বেশী ঠাণ্ডা। ঘরটার মধ্যে একমাত্র বাঁদিকের দেয়ালটাই যা একটু চকচকে—যেখানে আঠা লাগানো ফিতেব গায়ে ঝোলানো রয়েছে এথেল আর দুই ছেলের ছবি। আমার টেবিলের ওপর স্তূপাকার হয়ে আছে বড়দিনের এক রাশ কার্ড। তাতেই ঘর একটু আলো হয়েছে। ১৯৫১ সালের ৪ঠা জুলাইয়ের 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'এর যে পাতায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছাপা হয়েছিল, যে পাতাটা আমি দেয়ালের গায়ে আঠা দিয়ে সেঁটে ছিলাম—সেই পাতাটাও হলদে হয়ে বুড়িয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেয়ালের ছাঁচে ঢালা, ঝড়ে-ভাঙা বিবর্ণ এক টুকরো কাগজ। তবু এই কবরটায় উত্তাপ ছিল ; আমারই মধ্যে ছিল সেই উত্তাপ।

আরও অনেক বড়দিনের স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। সঙ্গে

সঙ্গে মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম আমার আদরের স্ত্রী, আমার চোখের মণি দুই ছেলেকে। কিভাবে সময় কাটাচ্ছে তারা? কি করছে এখন? আমি ভাবতে লাগলাম আমার সঙ্গীসাথী মানুষদের কথা; ভাবলাম সারা পৃথিবীর কথা। খুব ইচ্ছে করে তাদের মাঝখানে ফিরে যেতে, কিন্তু তবু আমি ব্যথায় ভেঙে পড়ি না। কেননা আমাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস অগাধ। আমরা তাদের বিশ্বাস থেকে বুঝি, যা ন্যায্য ও শুভ বলে আমরা মনে করেছি, তা সত্যিই ন্যায্য ও শুভ, বুঝতে পারি আমরা বরাবরই সত্যের পথে থেকেছি।

সময় সংক্ষেপ হয়ে আসছে। তবু এখনই আমি হাল ছাড়িনি— মুক্তি আমরা আদায় করবই। আমাদের এখনও যে তিন সপ্তাহ আয়ু আছে, তার মধ্যে অনেক কিছু করা যায় এবং তা করতেই হবে।

তোমাদের জুলি

পুনশ্চ।—বড় দিনের কার্ড এবং উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি এখনও সমানে আসছে। আমার ধারণা, যত কার্ড ও চিঠি আসছে তার একটা সামান্য অংশই জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে আসতে দিচ্ছে। আমাদের প্রতি সমর্থনের এই অভিব্যক্তি দেখে আমরা খুবই আনন্দ পাই। আমাদের শুভাকাঙ্খীদেব কাছে আমরা জানাই আমাদের সাদর সম্ভাষণ।

প্রিয় ম্যানি, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

সকাল বেলা উঠোনে ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। শীত তার দাপট দেখাচ্ছিল। উঠোন পেরিয়ে বার বার দমকাবেগে ভেসে আসছিল হিমেল হাওয়া। আর সেই হাওয়া জ্বলিয়ে দিচ্ছিল আমার দুটো কান, নাকের কাছে তাড়িয়ে তাড়িয়ে আনছিল হাড্‌সন নদীর মাছের

আঁশটে ঝাঁঝাঁলো গন্ধ। প্রবল বাতাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ওপরদিকে উঠছিল এক আকাশচারী সিন্ধু শকুন। বিরাট উন্মুক্ত আকাশের যে ফালিটুকু আমার চোখে পড়ছিল তার সমস্তটাই জুড়ে দেখা গেল সেই সিন্ধু শকুনের সুন্দর স্বচ্ছন্দ বিহার। কোথাও কিছু নেই এমন সময় হঠাৎ সেখানে দুম্ করে এসে হাজির হল মানুষের আবিষ্কার—জেট্ বিমান। কিন্তু তার শাদা শাদা ধোঁয়াগুলো যে রকম অন্তহীন ভাবে একটির সঙ্গে আরেকটির গিঁট বেঁধে দল পাকিয়ে মেঘের মূর্তি নিল—তাতে বিমানটা সেই মেঘে ঢাকা পড়ে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

উঠোনের দিকে আরেকবার ফিরে তাকাতেই দেখি শাদা চূণের গায়ে ছাপ ধরে মৃত্যুপুরীর দেয়াল জুড়ে ইঁটের মাঝখানে মাঝখানে ভাঙা ভাঙা রেখায় অদ্ভুত সব মূর্তি তৈরি হয়েছে। বাড়ী তৈরির মালমশলার রসায়ন সম্বন্ধে আমি ভাবতে লাগলাম। আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল একটা ছবি: মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে খুঁড়ে আনা চাঁই চাঁই কয়লা আর কাঁচা লোহা, ট্রাক ভর্তি হয়ে তারা এল কারখানায়। ফার্ণেসের জ্বালামুখ দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসছে লোহা আর ইস্পাত। তারপর সেই ঢালাই করা লোহার সাজসরঞ্জাম কেমন করে যেন সিং-সিঙে আসে, সুদক্ষ মিস্ত্রির দল আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানকে যোল আনা কাজে লাগিয়ে এক শক্ত ইমারত বানায়—তার নাম মৃত্যুপুরী। মনের পর্দায় ছবিটা দেখছি, এমন সময় পাহারাদার সেপাই এসে জানিয়ে দিল আমার উঠোনে বেড়াবার জন্যে বরাদ্দ পনেরো মিনিট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর একবার সেই প্রাণমাতানো খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে তারপর নিজের সেলে ফিরে এলাম।

কি দিন কি রাত—কখনও কখনও ঘরের মধ্যে পায়চারি করি, কখনও বিছানায় পা ছড়িয়ে শুই, মনের মধ্যে ভিড় করে আসে অজস্র ভাবনা।—সময় সত্যিই এত কম। দুটো মোটে সপ্তাহ—তার

মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে এত কথা, মিটিয়ে দিতে হবে এতখানি জীবন। গোড়াতেই কি লিখলে ভাল হয়? কাকে লিখব? কেমন করে? আমার অনুরোধ। দেখ, কান দাও, তাকাও, শোনো, অনুভব করো। সত্যকে জানো, প্রকৃত তথ্য নাও। প্রত্যেককে আত্মরক্ষার জন্যে ন্যায্য অধিকারে ও জীবনের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

ছেলেদের কাছে লিখব বলে কতবার যে চিঠি শুরু করেছি। প্রত্যেক বারই কয়েক লাইন লেখবার পর চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছি। তারপর আবার সাব্যস্ত করেছি পরে লিখব। এথেলকে সে কথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। ছেলেদের লিখব বলে আবার বসেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখতে আর পারিনি। কোন মাকে একথা বলার কোন মানেই হয় না যে, তুমি সন্তানদের জন্যে দুঃখ করো না।

আমরা মা আর বাবা। আমরা আমাদের সন্তানদের নিদারুণ ব্যথা দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানি তাদের প্রাণ হরণের চক্রান্ত চলেছে। পর্দার ভেতর দিয়ে যখন আমি দেখি সেলের মধ্যে আমার স্ত্রী বসে আছে—তার দুগাল বেয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু সমস্ত শরীর দিয়ে প্রাণপণে সে রোধ করতে চাইছে কান্না—আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করি, কিন্তু নিজেই সারাক্ষণ মুখ বুঁজে কেঁদে কেঁদে সারা হই। এর জন্যে দায়ী জঘন্য অবিচার এবং নিষ্ঠুর নৃশংসতা। আমাদের সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে এবং সেই সঙ্গে তাদের মত আরও অনেকের কথা ভেবে ন্যায়ের পথে অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

জুলি

পুনশ্চ।—গোয়েন্দা দপ্তরের হাত থেকে আমাদের পারিবারিক ছবিগুলো উদ্ধার করা কি সম্ভব? ছেলেদের জন্মের পর থেকে বিভিন্ন বয়সে তোলা ছবি শুধু ঐ কটাই আছে। তাছাড়া ওর মধ্যে এথেল

এবং আমারও বহুৎ ছবি আছে। অবশ্যই ছবি আদায় করবার ভার তোমার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যা পারো করো।

প্রিয়তমা বধূ আমার ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

আমি ভাবছি কর্তব্যের কিছুই করা হল না প্রিয়তমা আমার; এই দারুণ দুঃখের সময় তোমাকে আমি সান্ত্বনা দেবো তার উপায় নেই। কোন মাকে একথা বলা নিরর্থক যে, সে যেন তার সন্তানদের ভাবনায় কাতর না হয়। আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি ছেলে দুটো কি দারুণ বিভীষিকা আর কি মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। হাজার বোঝালেও তাদের দুঃখ যাবার নয়। তবু তোমাকে আর আমাকে ইস্পাতের মত শক্ত হতে হবে—যদিও আমাদের বুক খান্ খান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত হৃদয় কেঁদে উঠছে যন্ত্রণা উপশমের জন্যে। ওদের জন্যে আর ওদের মত শিশুদের জন্যে যা করা দরকার তা আমাদের করতেই হবে।

তোমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে আমি জানি প্রিয়তমা। ভয়ানক মন কেমন করছে তোমার জন্যে। ভাবাই যায় না আমাদের চারপাশে এই রকম কদাকার বিভীষিকার জাল বোনা হয়েছে। এথেল, তোমার প্রতি আমার উদ্বেলিত ভালবাসাই আমাকে শক্তি দেয়—দিন দিন ভারী হওয়া দুঃখের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমি বুক টান করে দাঁড়াই। এক বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত; তা হল এই—আমাদের মাথার ওপর নেমে আসছে যে দারুণ বিভীষিকা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠার জোরে তুমি তা জয় করবে।

তোমার কাছে উজাড় করে দিচ্ছি আমার বুকভরা ভালবাসা। আমার যা কিছু কাম্য, যত কিছু আমার কাছে সুন্দর, যা কিছু প্রিয় —সমস্তই আমি তোমাকে উৎসর্গ করছি। সত্যিকার মানুষের মত মানুষ হওয়ার যে কত সুখ, তোমার কাছ থেকেই আমি তা জেনেছি।

জুলি

প্রিয় ম্যানি, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

ছেলেদের কাছে আমি এ পর্যন্ত চিঠিতে যা কিছু লিখেছি, মুখে যা কিছু বলেছি—সব কিছুর ভেতর দিয়েই আমাদের অবস্থাটা খোলসা করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। আমি নিশ্চয় করে জানি যখন তারা বড় হবে, যখন তারা জানবে তাদের মা আর বাবা আগাগোড়া ন্যায়ের পথে অবিচল ছিল—গর্বে তাদের মাথা উঁচু হবে।

এখনও আমরা আশা ছাড়িনি। কিন্তু আমাদের ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে, পাগলের দল তাদের এই জঘন্য চক্রান্ত তাড়াতাড়ি চাপতে গিয়ে আমাদের জীবনগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আমাদের মামলার ফলাফল যাই হোক না কেন, বিচারক কাউফ্‌ম্যান কি কখনও তাঁর নিজের সন্তানদের কাছেই তাঁর আচরণ সমর্থন করতে পারবেন, বিশেষ করে যখন তারা একদিন না একদিন প্রকৃত তথ্য জানবে?

যদি ঠাণ্ডা মাথায় কেউ বিচার করে, তাহলে দেখবে—যে ধরণের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের দণ্ড দেওয়া হয়েছে, এমন কি একজন পকেটমারকে জেল দেবার পক্ষেও তা যথেষ্ট নয়। আইনের দিক থেকে, বিচারের দিক থেকে, নীতির দিক থেকে এবং নিছক সত্যের দিক থেকে যেভাবেই হোক, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। যদি দেশের প্রত্যেকটি পুরুষ এবং নারীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবার আমার উপায় থাকত বিপদ সম্বন্ধে আমি তাদের হুঁশ করে দিতে পারতাম। যা আমরা বলতে চাই তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারতাম। আন্দোলনে যেন কিছুতেই ঢিলে দেওয়া না হয়। ন্যায় বিচারের দিক থেকে আমাদের বেঁচে থাকা একান্ত দরকার; এখন আমাদের একান্ত দরকার আদালতে লড়াই করে জয়ী হওয়া, পুরোপুরি মুক্তি আদায় করা। তা যদি না হয়, মানুষের বিবেক মরমে মরে যাবে, ধুলোয় লুটোবে আমাদের জাতির সম্মান।

আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং সমর্থনকারীদের জন্যে রইল আমার গভীর স্নেহ এবং ভালবাসা।

তোমাদের জুলি

হে প্রিয়তমা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৩

নববর্ষের শুভেচ্ছা নাও—এথেল, প্রিয়তমা আমাদের জীবনে নতুন নতুন ঘটনাস্রোতে পুরনো বছরের চেয়েও ঢের বেশী কল্যাণ আসুক এই নতুন বছর। প্রাদেশিক আপীল আদালত আরেকবার তার সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচার দিয়ে বছর শেষ করল। যাই হোক, খবরের কাগজে যেটুকু বেরিয়েছে তা পড়ে মনে হল—তারা একথা মেনে নিয়েছে যে, প্রচারের কাজটা যেভাবে হয়েছে তাতে আমাদের বিরুদ্ধে বিরূপতার আবহাওয়া গড়ে উঠেছে।

উভয় আদালতই এই মত প্রকাশ করেছে যে, বিরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বিবাদীপক্ষ নাকি সময়মত নিয়মমাফিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 'অসমর্থ' হয়েছে; সুতরাং আবেদন অনুযায়ী আমাদের সুযোগসুবিধা দেওয়া এখন আর আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। এর উত্তরে আমি বলব—বাজে কথা ছাড়ো!

আমি বিশ্বাস করি—সত্যিকারের বিচার তাকেই বলে বাইরের নিয়মের খোলসটা বাদ দিয়ে যা ভেতরকার শাঁসটা দেখে। আচ্ছা, বোঝা গেল একটা ক্ষতিকর অন্যায় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরে কিছুদিনের মধ্যে তা কেমন ক'রে 'ঠিক' হয়ে গেল।

বিচারের এই নিষ্ঠুর প্রহসন যাতে লোকের চোখে ধরা পড়ে তার জন্যে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আমি লড়াই করে যাবো। আমার মনের জোর আগের চেয়েও বেড়ে গেছে। আমরা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবো—এ বিশ্বাস, এ আশা আমার আছে।

বড়দিনের উৎসবের সময়, আজ সারাদিন—মধুময়ী তোমার কথা

মনে হয়েছে। প্রিয়তমা আমার, তোমাকে পাঠাই আমার হৃদয় তুমি আমাকে নাও।

চিরদিন তোমারই জুলি

প্রিয় ম্যানি, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৩

আজ আমাদের সোনার মানিকরা এসেছিল। আমাদের ছোট পরিবারটা ছ'ঘণ্টার জন্যে প্রাণ পেয়ে আবার বেঁচে উঠেছিল। রবীর চোখের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমাদের প্রতি তার আস্থার ভাব। রবী হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালবাসে। ওর কথাবার্তা শুনে, আমাদের সঙ্গে ওর খেলা করার ভেতর দিয়ে তা বুঝেছিলাম। গরাদ-দেওয়া জানলার ফাঁক দিয়ে আমরা সিন্ধুশকুন দেখছিলাম। দেখছিলাম একটা গাধাবোট হাডসন নদীর বুকের ওপর দিয়ে একসঙ্গে গুণ-টানা অনেকগুলো বজরা টেনে নিয়ে চলেছে। রবী বসে বসে ছবি আঁকছিল—আর মাঝে মাঝে রবী উঠে এসে আমার গালে চুমো খেয়ে ছোট ছুটো হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরছিল। বাপিকে পেয়ে ওর খুব আনন্দ। বাচ্চাটা আমাদের মানসিক অবস্থা আঁচ করতে পেরেছিল।

মাইকেলকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল। আমাদের কাছে, ওর বাপমা-র কাছে ওর মনের ভাব খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। আমার স্ত্রী খুব সুকৌশলে তাকে শান্ত করল। ধীর স্থিরভাবে সযত্নে, দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে বোঝাল। এমনভাবে আগাগোড়া সে বোঝালো, তাতে মাইকেল ব্যাপারটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। আমার স্ত্রী আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। মাইকেলকে কথা দিয়েছি ওর সঙ্গে দাবা খেলব। কোন এক দিন খেলব আশা আছে।

তারপর ওদের যাবার সময় হল। মাইকেলকে আমি কোট্টা

পরিয়ে দিচ্ছি, হঠাৎ ও আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। তারপর হেঁট মাথায় আমতা আমতা করে বলল 'তোমাকে বাড়ী আসতে হবে। রোজ আমার পেটের মধ্যে একটা ডেলা আট্‌কে থাকে, বিছানায় যখন শুতে যাই তখনও।' তাড়াতাড়ি ক'রে তাকে একটা চুমো খেলাম। 'সব ঠিক হয়ে যাবে'—এর বেশী আর কিছু বলবার আমার শক্তি ছিল না।

নিজের সেলে যখন ফিরে এলাম আমার পেছনে লোহার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সেলে তখন আমি একা। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। আমার সন্তানেরা ব্যথায় কাতর। তাই আমি ছেলেমানুষের মত ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম। গরাদগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে কংক্রিটের দেয়ালগুলোর সামনে দাঁড়ালাম। চতুর্দিক থেকে দেয়ালগুলো আমাকে যেন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলল। বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে লাগল। আর সেই যন্ত্রণায় যখন আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বান ডাকল আমি বিন্দুমাত্র বাধা দিলাম না।

জুলি

প্রিয় ম্যানি, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৩

ঈশ্বরের কাছে, মানুষের কাছে আমি নীচের এই সত্যগুলো তারস্বরে ঘোষণা করতে চাই ঃ

১। আমরা সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ। এ অতি ধ্রুব সত্য।

২। রোজেনবার্গদের মামলায় রাজনৈতিক মতলব হাসিল করবার জন্যে এক ভয়ঙ্কর চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছে।

জজ সাহেব এবং ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী মামলার সূত্রপাত থেকেই কমিউনিজম্ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস-সম্পর্কিত অবান্তর প্রশ্নের আমদানী করেছেন। আসল ব্যাপারটা ঘুলিয়ে দেওয়া এবং আমাদের বিরুদ্ধে জুরীদের বিরূপ করে তোলার জন্যেই এসব করা হয়েছে।

শুনানীর সময় যখনই কোন একটা স্তরে অবস্থা আমাদের অনুকূলে গেছে, তখনই জজ সাহেব আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে মামলায় সমানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর একমাত্র চেষ্টা ছিল আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে কিভাবে জুরীদের কাছ থেকে রায় আদায় করে নেওয়া যায়। আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তিনি কোন বাধা দেননি। আমাদের পক্ষ নিয়ে যথোপযুক্তভাবে মামলা লড়বার ব্যাপারে আমাদের উকিলকে তিনি বাধা দিয়েছেন। জুরীরা আমাদের অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু জজ সাহেব তাদের ন্যায় এবং নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সেই অপরাধ বিচার করতে দেননি।

আমাদের দিক থেকে বলার কথা এই যে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমরা কোন অন্যায় করিনি। শান্তি, স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদার লড়াইতে বাদ সাধার জন্যে আমরা কখনোই পরের কাছে নিজেদের বাঁধা দেবো না।

ধীরে! মশাইরা, ধীরে! গলায় ফাঁসী পরানোর জন্যে অতটা ব্যস্ততা ভাল নয়। মনে রাখবেন, ব্যাপারটা দু'তরফা। এই মামলায় আমাদের সরকার কি করে না করে সারা দুনিয়া দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে। রোজেনবার্গদের মামলায় অমানুষিক দণ্ড দেওয়ার জন্যে এবং বিচারের ব্যর্থতার জন্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক মানুষই নিদারুণ ক্ষুব্ধ।

সময় খুব সংক্ষেপ। আর মোটে দশটা দিন আমরা বাঁচতে পারব। এর মধ্যে যতটা পারি ঠেসে কাজ করে যাবো।

তোমাদের জুলি

৯ই জানুয়ারী, ১৯৫৩

প্রিয় ম্যানি,

আমার মনে হচ্ছে: বিচারক আরভিং আর কাউফম্যান এবার সত্যিই অমর হলেন। আমাদের প্রতি অনুকম্পা দেখাতে অস্বীকার করে তিনি যে রায় দিয়েছেন—মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাকে

ধূর্ত প্রবঞ্চনা এবং মানসিক অসাধুতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে বরাবর তুলে ধরবে।

কাউফম্যান যে রায় দিয়েছেন, আগাগোড়া সাংঘাতিক ভুলচুকে ভরা। তিনি যুক্তি দিয়েছেন এমন জাঁকজমক করে, যাতে লোকে ধরতে না পারে সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞ সাজবার প্রাণপণ চেষ্টা আছে—কিন্তু ফলের দিক থেকে দাঁড়িয়েছে নিছক ছ্যাবলামি।

মনে হয়, বড় বড় মানুষদের বচন আওড়াতে জজসাহেব একটু ভালবাসেন। যাই হক তিনি যদি বার্ণার্ড শ-র 'সেণ্ট জোয়ান' বইটা থেকে নীচেকার কথা কটা পড়তেন তাহলে হয়ত রোজেনবার্গদের লক্ষ্য করে ঐসব বচন আওড়াবার তাঁর উৎসাহ হত না। সেই যেখানে একটা দৃশ্য আছে—ইংরেজ পাদ্রী জন্ ডি ষ্টোগাম্বার, যে জোয়ানকে পুড়িয়ে মারার প্রস্তাব করার ব্যাপারে নিজে একজন বড় পাণ্ডা ছিল, ঘটনাস্থল থেকে সে ছুটতে ছুটতে আসে; তারপর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পাগলের মত হায়-হায় করে:

'তোমরা সে জানো না; তোমরা সে দেখনি; না জেনে বলাটা খুবই সোজা। তোমরা কথার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকো: তোমরা নিজেদের জাহান্নামে পাঠাও, কেননা নিজের জ্বলন্ত ক্রোধের আগুনে ঘি ঢালতে বেশ মজা লাগে। কিন্তু যখন তুমি বুঝতে পারো, যখন তুমি চোখের ওপর নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাও, তখন তা তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, হৃদয় ছিঁড়ে যায়—তখন হে ঈশ্বর, আমার চোখের সামনে থেকে দৃশ্যটা সরিয়ে নিয়ে যাও। হে যীশুখৃষ্ট! আমাকে পুড়িয়ে মারছে যে আগুন তার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করো।—অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়িয়ে সেই নারী তোমার কাছে কেঁদেছিল; হায় যীশু! হায় যীশু! এখন সে তোমার বুকের মধ্যে আর আমি রসাতলে কেবলি তলিয়ে যাচ্ছি!'

তোমার স্থান ঐ নরকে, বিচারক কাউফম্যান! 'হত্যার চেয়েও গর্হিত' তোমার পাপের জন্যে।

প্রিয় ম্যানি, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫৩

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বহর দিন দিন বড় হচ্ছে। যত কাগজে এই সব অপপ্রচার ছাপা হচ্ছে, শুধু তার ওজন দেখলেই তো মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবিয়ে তোলে। ওদের কাগজ কাটছে খুব। কর্তৃপক্ষ গোঁ ধরে আছে, এই পাগলামি চালিয়ে যাবে— না কি তারা দেশের লোককে বোঝাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে?

স্পষ্টতই, চারদিকে বড় রকমের বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে। শুধু আমাদের দুটো জীবনই যে যেতে বসেছে তা নয়, আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষের নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। ওয়াশিংটনের কর্তারা বিচার বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছে বলা যায় না, তাদের এই মরীয়া অবস্থায় হয়ত বিনা বাধায় জল্লাদের হাত বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে আমাদের খুন করবে।

এবার আমাকে চিঠি শেষ করতে হবে। রাত্রে আবার সঙ্গে কলম রাখবার জো নেই। সেপাই এসেছে কলম নিয়ে যেতে। আমাদের বন্ধুদের বলো তারা যেন সোৎসাহে কাজ চালিয়ে যায়। আমার বন্ধুরা সত্যি ভাল কাজ করছে। আমরা পারি এ লড়াই জিততে।

তোমাদের জুলি

প্রিয় ম্যানি, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৩

ব্যাপারটা এখন খুবই স্পষ্ট। রাজনৈতিক প্রচারের কাজে লাগাবার জন্যেই খুব সুচিন্তিতভাবে কাউফম্যানের মুখ দিয়ে কথাগুলো বলানো হয়েছে। কাউফম্যান যে রায় দিয়েছেন, অনায়াসে তার এই শিরোনামা হতে পারত: 'কমিউনিষ্ট-সমর্থক হওয়ার অপরাধে অভিযুক্তদের মেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।' রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে কাউফম্যানকে দিয়ে এইভাবে বলানোর পেছনে আছে: (১) পররাষ্ট্র দপ্তরের কারসাজি। এই সাজানো মামলা

ও অমানুষিক দণ্ডবিধানের দরুণ দেশে ক্ষুব্ধ জনমত দিন দিন যেভাবে রাগে ফুলে উঠছিল, পররাষ্ট্র দপ্তর চাইছিল তাকে চাপা দিতে ; (২) স্বরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগের উস্কানি। তারা চাইছিল দেশের মধ্যে প্রতিবাদ আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরার জন্যে প্রভাবশালী সংবাদপত্র ও বেতার-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোদমে কাজে লাগাতে এবং সেই সঙ্গে সব চেয়ে বেশী করে চাইছিল দেশসুদ্ধ লোক যাতে ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে যে, রোজেনবার্গদের মামলায় বিচারের নামে নিছক প্রহসন চলছে।

সত্যকে তারা কি যমের মতই না ভয় করে। আমরা দুজন সামান্য মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সাহস হারাই না। আমরা শক্তিমান, কেননা আমরা নির্দোষ। আমরা জানি, ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে আমরা লড়ছি। চমকপ্রদ যুক্তি দিয়ে যত সুন্দর ইমারতই গড়ে তোলা হক না কেন, যদি তার ভিত্তিটা প্রকাণ্ড মিথ্যে দিয়ে গাঁথা হয়ে থাকে—ন্যায় এবং প্রকৃত সত্যের আঘাতে তা সপাটে ভেঙে পড়বে।

আমরা বিশ্বাস করি, দেশের মানুষ রোজেনবার্গদের রক্তে আমেরিকার ন্যায়ের দণ্ডকে কখনই এমনভাবে কলঙ্কিত হতে দেবে না, যে কলঙ্ক কখনও মুছবে না।

তোমারই জুলি

প্রিয় ম্যানি, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

এর আগে যে চিঠি দিয়েছিলাম, তারপর জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। রোজেনবার্গ দম্পতি অকম্পিত কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল—দেশের মানুষ আইনের ছদ্মবেশে হত্যার ব্যাপারটা কিছুতেই মুখ বুঁজে মেনে নেবে না। আমাদের সে ভবিষ্যদ্বাণী যে নির্ভুল ছিল, তা সহস্র বার প্রমাণ হয়ে গেছে।

এখানে সেখানে একেকটা তারিখ হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়। আমার ব্যক্তিগত দিনপঞ্জিতে লেখা আছে দেখছি : বুধবার, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫২—ওপরওয়ালাদের যথারীতি নির্দেশ দিয়ে এক ভদ্রলোক জেলার সাহেবকে সঙ্গে করে আমার কাছে এলেন—আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে না আছে, আমি কি চাই না চাই জানতে। অবশ্য একটা জিনিস চাইলেও পাবো না—জল্লাদের (হ্যাঁ, ভদ্রলোক 'জল্লাদ'ই বলেছিলেন) হাত বন্ধ করতে। ১২ই জানুয়ারী থেকে যে সপ্তাহের শুরু, সেই সপ্তাহে মৃত্যুর বোতাম টেপবার জন্যে সে সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে। আর তারপর রবিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫২—আমি আমার সেলে শান্ত মনে বসে গানের পর গান 'শুনছিলাম'। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ওসিনিং ষ্টেশনে* দাঁড়িয়ে হাজারখানেক মানুষ সেই গান গাইছিল (যদিও আমি সে গান নিজের কানে শুনতে পাইনি)। আমার মধ্যে এমন এক প্রশান্তি আর ভরসা, এমন এক আত্মিক যোগ অনুভব করলাম—যা হাজার বঞ্চনায়, হাজার নিঃসঙ্গতায়, হাজার বিপদেও ভাঙবে না।

জানুয়ারীর ১৪ই তারিখ এসে চলে গেল। যেমন করে তার ঠিক আগেই কয়েকটা অশান্ত দিন এসে ফিরে গিয়েছিল। দিনগুলোর কথা মনে আছে। আমাদের দুয়ারে সদলবলে টহল দিয়ে ফিরেছেন হেন অফিসার তেন অফিসার আর পোঁ-ধরা কলমচী-র দল সেই সময় সমানে আমাদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে চলেছে।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য স্মৃতি আছে যা কোন দিনপঞ্জিতে খুঁজে

*সিং-সিং জেলখানাটা হল নিউইয়র্ক প্রদেশের ওসিনিং অঞ্চলে। আমেরিকার যে হাজার হাজার মানুষ চেয়েছিল রোজেনবার্গ দম্পতি বাঁচুক—তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে হাজারখানেক লোকের এক মিছিল এসেছিল রোজেনবার্গদের অভিনন্দন জানাতে। পুলিশ এই প্রতিনিধিদলকে জেলখানার ধারে ঘেঁষতে দেয়নি। সেই কারণে তারা রেলষ্টেশনে জমায়েত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্তরস্পর্শী গান গেয়ে রোজেনবার্গদের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছিল।

পাওয়া যাবে না। আবেগময় কত যে স্মৃতি! উর্ধ্বশ্বাসে একটার পর একটা সেই আবেগ উল্কার বেগে ছুটে গিয়েছিল। আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি—নিভে-যাওয়া নক্ষত্রের মত তাদের মনে হয়। অবিকল মৃত নক্ষত্রের মতই তারা আজ পাণ্ডুর, তারা বিবর্ণ, তারা বিস্মৃত। আবার, দ্রুত-ধাবমান এই বর্তমানের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে যখন একনজর তাকাই, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—তখন আমার মনে হত প্রত্যেকটি দিন যেন নিজেকে টেনে দীর্ঘ করে আমার সামনে মেলে ধরেছে স্বর্ণময় অনন্ত সম্ভাবনা। এমনি এক দিনে আমার স্বামীকে লিখেছিলাম: 'সংগ্রাম গজ্‌রাচ্ছে, আমি শান্ত।' আর চানুকা পরব উপলক্ষে ছেলেদের রবিবারের 'টাইমস্‌' কাগজ থেকে কেটে পাঠিয়েছিলাম একটা চমৎকার হাল্কাগোছের ছোট্ট কবিতা।

সে সব, সে সবই অতীত। আর ক'দিনের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। সেই অপেক্ষায় আমরা এখানে বসে আছি। সময়ের শক্তফাঁস যতই ছোট হয়ে আসছে, ততই দম নেবার জন্যে আমরা প্রাণপণে লড়ছি। দিন ঘনিয়ে আসছে। তার ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আসন্ন দিনের গর্ভে কি আছে আমরা জানি না। এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুগের বিশাল পটভূমিকায় তাকে বিবর্ণ, কদাকার দেখাচ্ছে। আর আসলে তো সিদ্ধান্তটা কিছুই নয় —কয়েকটি সরল প্রস্তাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ্যাঁ কিম্বা না।

প্রথমত, মামলার দোষগুণ যাই থাক—আজ দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ মনে করছে: রোজেনবার্গদের প্রার্থনা অনুযায়ী আইনগত সুযোগ সুবিধে দিতে অস্বীকার করে আদালতগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রায় দুবছর ধরে রোজেনবার্গরা যে সমানে বলে এসেছে—আমরা হলাম ঠাণ্ডা যুদ্ধের রাজনৈতিক শিকার—সে কথা এক বর্ণ মিথ্যে নয়। দুনিয়ার এই কোটি কোটি মানুষদের দলে আছেন এ যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাই তো দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ প্রতিবাদের ঝড় তুলে আমাদের প্রাণদণ্ড রদ করতে চেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপক প্রতিবাদ—আর সত্যি বলতে কি, প্রতিবাদ যে রয়েছে—এ থেকেই আমাদের মামলার রাজনৈতিক চরিত্র পরিষ্কার ফুটে ওঠে—তার চাপে পড়ে কোন কোন মহল মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে—হয় আমাদের নিন্দাকারী বিরুদ্ধপক্ষকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলে আমাদের সমর্থনকারীদের গুরুত্ব যথাসম্ভব ছোট করে দেখাতে, না হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই 'কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র' বলে উড়িয়ে দিতে।

তৃতীয়ত, যখন দুনিয়া কখনও রাগে ফেটে পড়েছে, কখনও বজ্রকণ্ঠে হেঁকে উঠছে, কখনও চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে, আবার কখনও সকাতরে প্রার্থনা জানাচ্ছে—তখন আমাদের সামনে আমরা পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী জাতির সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি দেখছি ; তার হাত-পা বাঁধা, সে অসহায়। ভুল হলে নিজেকে শুধ্‌রে নেবার মুরোদ নেই তার। কেননা সব সময়ই পুরনো ভুল শুধরে নেওয়া যত না সহজ, তার চেয়ে ঢের বেশী সহজ নতুন নতুন ভুল করে বসা।

চতুর্থত, এটাকে দু'কথায় আরও সহজ করে এমন কি শুনে হাসি পাবার মত করে এই গুরুতর প্রশ্ন আমি রাখতে চাই : 'যুক্তরাষ্ট্রের মুখরক্ষার জন্যে দুটি তরুণ টাটকা জীবন বলি দেওয়া কি কাজের কথা হল—বিশেষ করে যাদের অপরাধ সম্পর্কে সারা দুনিয়ার মানুষ বলছে : সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।'

সিদ্ধান্তটা এমন কিছুই নয়। রোজেনবার্গদের প্রতি করুণা দেখাতে যদি 'মুখ ছোট হয়ে যায়' তাহ'লে বুঝতে হবে দেশের বিচার জিনিষটা যাঁতাকলের চেয়েও নৃশংস ব্যাপার—যাকে একটা দিকে একবার চালিয়ে দিলে বোতলের নিষ্ক্রান্ত ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত ক্রমেই বড় হতে হতে হাতের বাইরে চলে যাবে আর দেশময় তখন শুরু হবে তার উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর সেই আবছায়ার মধ্যে বসে আমরা দিন গুণছি আর আশা করছি। আমরা বিশ্বাস হারাই না ;

আজও সূর্যের আলো জেগে আছে আমাদের জন্মের এই মাটিতে—এই 'স্বাধীনতার মিষ্টি দেশে'—এই আমেরিকায়।

এথেল

প্রিয় ম্যানি, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

সোমবার আমার মা এখানে এসেছিলেন। সেই খবরটা দেবার জন্যেই তোমাকে এই চিঠিটা লেখা। মার সঙ্গে কি কথা হল নীচে লিখে জানালাম। পড়তে তোমার ভাল লাগবে। ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা নিঘিন্নে নীতিহীনতা রয়েছে যে, এখনও তার ধাক্কা সামলে উঠতে পারিনি।

আমি মাকে পরিস্কার বললাম—ডেভি যে ভাবছে এখন সত্যি কথা বললে, ওরা ওর ওপর প্রতিশোধ নেবে; ওর ঐ ভয়টা একদম অমূলক। আর ভয় যদি পেয়েও থাকে ওর এটা বোঝা উচিত যে, আমি আমার জীবনটাই হারাতে বসেছি! আর সে ক্ষেত্রে ওর কিন্তু যত যাই হোক জান যাবার ভয় নেই। মাকে আরও বললাম—বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আজ বাদে কাল মরতে চলেছি, তবু নির্ভীকভাবে আমি বার বার জোর গলায় বলছি আমি নির্দোষ। আমি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে বুক টান করে এখনও বলছি—ডেভি যা বলেছে সব মিথ্যে। আর ডেভি? সে তো অনেক ভাল অবস্থায় আছে। অন্তত এই শেষ সময়েও সে মরদের মত উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মিথ্যেটাকে স্বীকার করতে পারে না? নিজের মুখ বাঁচাবার কথা না ভেবে আমার জীবনটাকে সে বাঁচাতে পারে না?

আমাদের মধ্যে কি কথা হল নীচে লিখলাম। কথাগুলো ঠিক যা হয়েছিল প্রায় হুবহু সেই মত রেখে'ছ।

মা বললেন: তুই যদি ওর কথাগুলো সায় দিয়ে যেতিস কি আর এমন ভয়ানক হত?' শুনে আমার মুখটা বোধহয় হাঁ হয়ে গিয়েছিল। আমি জবাব দিলাম: 'কি বলছ তুমি! যে অপরাধ আমি করিনি তার

জন্যে নিজের ঘাড়ে দোষ নেবো? ওকে রক্ষা করবার জন্যে আমার নিজের নামে, আমার স্বামী-পুত্রের নামে কালি পড়াবো? কি বলছ তুমি! যে কথা আমি জানি একদম অসত্য, যার মধ্যে আমার স্বামীকে এবং আমাকে জড়ানো হয়েছে—সেই বানানো গল্পে আমাকে তুমি সায় দিতে বলো? দাঁড়াও তো একটু, এমন হতে পারে আমি হয়ত তোমার কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না। ঠিক কি বলতে চাইছ তুমি, বলো তো?'

বিশ্বাস করো, মা তার জবাবে বললেন, 'না, তুমি ঠিকই ধরেছো। আমি বলতে চাই—কথাটা মিথ্যে হলেও তোমার বলা উচিত ছিল কথাটা সত্যি। তাহলে পর তুমি ভাবছ তোমাকে এমন জায়গায় আসতে হত? কখনই নয়। তুই যদি স্বীকার করতিস ডেভি যা বলেছে তা ঠিক, ডেভি যদি ঠিক না বলেও থাকে—তাহলে আর তোর এই হাল হত না।'

শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম। প্রতিবাদ করে বললাম 'কিন্তু, মা—সত্যি কথা বলবার শপথ নিয়ে সেই শপথ যদি আমি সজ্ঞানে ভাঙতাম, তাহলেই কি তুমি খুশী হতে?'

হ্যাঁ-না কিছু না বলে মা শুধু কাঁধটা একটু নাড়ালেন আর গোঁ ধরে থেকে আগের কথাটাই আবার বললেন, 'তাহলে আর তোকে এমন জায়গায় আসতে হত না।'

৩১শে তারিখ শনিবার ছেলেদের এখানে আনবার ব্যবস্থা করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে? যদি আমাদের মৃত্যুদণ্ড রদ না হয়, তবু জুলি আর আমি দুজনেই মনে করি—ছেলেদের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া দরকার। সুতরাং এ ব্যাপারে তুমি চেষ্টার ত্রুটি করো না। একটা কথা—যেদিন দেখা হবে তার মাত্র দু'একদিন আগে ওদের খবর দেবে। তার আগে বললে মাইক বড্ড চঞ্চল হয়ে পড়বে। প্রীতি জেনো।

এথেল

প্রিয় ম্যানি, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

আজ সকালে জুলির সঙ্গে দেখা করে এলাম। যা আঁচ করেছিলাম তাই। যত শীগ্‌গির সম্ভব তোমার সঙ্গে ও দেখা করতে চায়। তুমি এলে ছেলেদের ব্যাপারে ও আরেকটু পাকাপাকি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করবে। মঙ্গলবার যদি আসতে পারো খুব ভালো হয়। দশটা পর্যন্ত জুলির সঙ্গে আমার দেখা করবার সময় এবং দেখা করবার জন্যে আবার যখন ডাক আসবে, আমি তাহলে একই পোশাকে তৈরি হয়ে থাকতে পারি (আগে থেকে তোমার আসবার কথা না জানতে পারলেও)। মঙ্গলবার যদি নেহাত না পারো, বুধবার কিম্বা শুক্রবার এলেও চলবে।

নির্জন কারাকুঠরিতে বাস করার অবশ্যম্ভাবী ফল বিষণ্ণতা। যখন আমি সেই দারুণ বিষাদে ডুবে যাচ্ছি, তখন তোমার চিঠি এসে আমাকে সেই বিষণ্ণতা থেকে টেনে তুলল। তার মানে এ নয় যে, আমি বেশ চাঙ্গা আছি বলে তোমার যে ধারণা সেটা ভুল। সত্যি বলতে কি, আমার বিশ্বাস ও মনের জোর আগের মতই বজায় আছে। কিন্তু তা থাকলেও আমার বেচারা নির্বোধ হৃদয় মানে না। যুক্তির ধার ধারে না সে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের ভেতর দিয়ে নতুন সৃষ্টির কামনা চরিতার্থ করবে বলে আমার স্পন্দমান হৃদয় যেন মরে যায়। আমার বিশ্বাস এবং মনের জোর আগের মতই আছে। তা থাকলেও এখানে বেঁচে থাকার মধ্যে বিষাদভরাতুর যে বেদম এক-ঘেয়েমি, তার কোন ইতরবিশেষ হয় না।

তুমি যে প্রীতি, যে সহৃদয়তা, মনের যে উদারতা দেখিয়েছো তার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে দাও। তোমার চিঠি আমার অন্তরের অন্তস্থল স্পর্শ করেছে। আর সেখান থেকে কখন যে আমার চোখের দুকুল ছাপিয়ে টেনে এনেছে নিরন্তর সুখের, মধুর আনন্দের অশ্রু— আমি নিজেই জানি না। ছেলেবেলায় স্নেহ পাইনি, আমার চারিদিকে ঘিরে ছিল ভেঙ্গে-দুমড়ে দেওয়া হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ; আর আজ যখন

তোমার মুখে অমন সহৃদয় প্রশংসা শুনি, আমার হৃদয়ের গভীর তলদেশ তোলপাড় হয়ে ওঠে। আমার মাথা নুয়ে আসে, আমি নিজের মধ্যে অনুভব করি গভীর কৃতজ্ঞতা।

যখন দেখি তোমার মমতায়, তোমার নিষ্ঠার সন্দেহ প্রকাশ করে তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ চলেছে—রাগে হাত নিস্‌পিস্‌ করে। যখন দেখা হবে তখনই বিষয়টা নিয়ে ধীরেসুস্থে বসে আলোচনা করা যাবে। তার আগে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমি আর আমার স্বামী আমরা নিরাপরাধ হয়ে বরং মৃত্যু বরণ করব—কিন্তু নিজেদের অপরাধী করে বেঁচে থাকার মত হীন প্রবৃত্তি কিছুতেই আমাদের হবে না। তোমাকে আমরা নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসি। কিন্তু কারও এমনকি তোমারও সাধ্য নেই—রোজেনবার্গদের কান ধরে চালাবার। রোজেনবার্গ দম্পতি শুধু একটি নির্দেশই মেনে চলে—সে নির্দেশ আসে তাদের অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে, সে নির্দেশ তারা পায় তাদের বিবেকের কাছ থেকে, সত্যের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। মানুষের প্রতি যে ভালবাসা আমরা পোষণ করি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ-পূত একমাত্র সেই ভালবাসাই আমাদের চালনা করে।

এথেল

ও আমার কোকিলকণ্ঠী প্রিয়তমা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

তখন কি আনন্দ! হঠাৎ তোমার গলায় শুনতে পেলাম গুনো-র সেই গান দুটি—'মেরীর ভজন' আর 'স্তবগাথা'। তাও যদি তোমার লোহার দরজাটা খোলা থাকত। দুজনে গলায় গলা মিলিয়ে কী সুন্দর গান হতে পারত, ভাবো তো! আমার মনে পড়ে গেল অনেক সব পুরনো দিনের কথা। সেই যে তুমি গান ধরতে কখনো মেঠো, কখনও একাবলী সুরে—যে সুরগুলো আমার খুব প্রিয় ছিল।

নিউ ইয়র্কের এক ভদ্রলোক জেলখানায় দেখা করতে এসেছিলেন।

তাঁর গাড়ীটা পেয়ে যাওয়ায় আমার বোন বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত থেকে যেতে পেরেছিল। বোনের সঙ্গে দেখা হয়ে অনেক কাজের কাজ হল। সময় অভাবে ও তোমাকে যেমন খবর দিয়ে উঠতে পারেনি, পরদিন যখন দেখা হবে আমার কাছে শুনো। লেনা উৎসাহ জীইয়ে রাখতে পেরেছে দেখে খুব আশ্বস্ত হলাম।

সোনামানিকদের কথা যাতে খুব বেশী না ভাবি তার জন্যে বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, আমাকে নিজের মনের সঙ্গে অনবরত যুঝতে হয়। ওদের কথা মনে হলেই আমার বুক যে ভেঙে যায়, ব্যথায় যে ককিয়ে উঠি। প্রিয়তমা, আমরা দুজনে আবার যদি আমাদের সংসারে ফিরে যেতে পারি ওঃ, কী সুন্দর যে হয়! একটু আগে আমি ভাবছিলাম কি আনন্দেই না আমাদের দিনগুলো কাটত। তুমি রবীকে পিঠে নিয়েছো, আমি নিয়েছি মাইকেলকে, তারপর পাল্লা দিয়ে সে কি দৌড়। ছোট খোকাকে শোয়াতে নিয়ে যাবার সময় কিরকম আমরা মিছিল করে যেতাম মনে আছে? তুমি ওর পায়ের দিকটা ধরতে, আমি ধরতাম ওর কাঁধ আর মাইকেল তার মাথায় ভাইয়ের পিঠটা ঠেকিয়ে ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াত। কি মজাটাই না হত। সেই দুটি অসহায় বাচ্চা শিশুকে আজ বিনা দোষে শুধু শুধু কি নিষ্ঠুর যাতনা দেওয়া হচ্ছে। আমরা কেউ এ কখনও ভুলব না।

কাছে সরে এসো বধূ আমার, কানে কানে তোমাকে একটা কথা বলি ঃ আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

তোমার একান্ত জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

সাধারণত সপ্তাহের শেষে বাড়ি থেকে একবার কেউ না কেউ আসে। এবার না আসায় সপ্তাহের শেষ দিকটা বড় দীর্ঘ বলে মনে হল। গত শুক্রবার তোমার সঙ্গে দেখা করে ফেরবার পর থেকে তোমার কথাই ভাবছি।

তুমি কি দুঃসহ ব্যথা পাও, আমি জানি। বিশেষ করে আজ আমরা বসে বসে মৃত্যুর দিন গুণছি ; তাই আশাভঙ্গের দারুণ বেদনা নিজেকে বাড়িয়ে সহস্রগুণ করে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। নিজেকে তুমি সেদিন ধরে রাখতে পারোনি। তোমার চোখে নেমে এসেছিল দর দর ধারে অশ্রু ; কান্না চাপতে পারোনি। সেদিনকার সেই চোখের জল, সেই কান্না যেমন ছিল তোমার বেদনার বাইরের—তেমনি জেনে রেখো, তোমারই মত এক দারুণ যন্ত্রণার দরুণই সে সময় আমার বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে যে অসহ্য যাতনা সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘোরে তাকে শান্ত করব, তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবো—আমার সে সাধ্য নেই। কিন্তু আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছি এই দারুণ যাতনা সত্ত্বেও ; আর আমরা যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরকে বাঁধতে পেরেছি তা তো এই দারুণ যাতনারই জন্যে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাঁদের লেখায় প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁরা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে কি সৌন্দর্য, কি মহত্ত্ব আছে। কিন্তু এমন কি মৃত্যুর দ্বারদেশে এসেও তোমার আমার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে ব্যথায় কাতর যে চূড়ান্ত সুখ তার কাছে তাঁদের সমস্ত বর্ণনা-ব্যাখ্যা ম্লান হয়ে যায়।

আমি বিশ্বাস করি, মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাকে আমরা রূপ দিতে পেরেছি, তার কারণ আমরা আমাদের সন্তানদের মহত্তর কল্যাণের জন্যে, সমগ্র মানবজাতির মহত্তম কল্যাণের জন্যে আমাদের ব্যক্তিগত ভালবাসার মহৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়েছি।

তোমার একনিষ্ঠ স্বামী জুলি

প্রিয় ম্যানি, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একটা বিশ্রী ব্যাপার শুরু হয়েছে। আর সেটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমি মেয়েমানুষ এবং মা বলে নাকি

আমার প্রতি মানবোচিত দয়া দেখানো হবে ; আমার মৃত্যুদণ্ডটা মাপ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার স্বামীকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মারা হবে —এই রকম একটা কথা কানে কানে আলগোছে ছড়ানো হচ্ছে। তারপর আরও একটু অগ্রসর হয়ে আশা প্রকাশ করে ফিস্‌ফিসিয়ে বলা হচ্ছে—আর এ যদি হয়, তাহলে আমার 'গুপ্তচরবৃত্তির গোপন তথ্যগুলো' আমার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে মারা যেতে পারবে না ; পরে আমি কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হবো—এমন একটা সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে থেকে যাবে। কথাটাকে শেষ পর্যন্ত এইখানে এনে দাঁড় করানো হচ্ছে : আমার স্বামী বাঁচবে কি মরবে তার দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তাচ্ছে : যদি আমি তাকে নিজে ইচ্ছে করে 'ভাঙিয়ে আনতে' রাজী না হই, তাহলে স্বামীর রক্তে আমার হাত লাল হবে।

হুঁ, তাহলে এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আমার স্বামীর জীবনের দাম দিয়ে আমাকে আমার নিজের জীবনটা কিনে নিতে হবে! স্ত্রীজাতির প্রতি দরদে উথলে-ওঠা বীরপুরুষের দল আমার দিকে যে দড়িটা ছুঁড়ে দিয়েছে, সেটা চেপে ধরে একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে আমি ডাঙায় উঠি আর ডুবে মরুকগে যাক আমার স্বামীটা, এই তো? শয়তান কোথাকার! রাগে আমার মাথায় খুন চাপে। বীভৎসতায়, ঘৃণায়, গায়ের মধ্যে যেন পাক দিয়ে ওঠে। এইসব রক্ষাকর্তারা আসলে আমার জন্যে এমন একটা কবর গাঁথতে চাইছে যার মধ্যে আমি যেন বেঁচে না থেকেও ধুকপুক করে বাঁচি, মরে না গিয়েও ছটফট করে মরি। সারাটা দিনমান আমার আশা বলতে কিছু থাকবে না, সারাটা রাত আমি শান্তি পাবো না। বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেই প্রিয় মুখ, আমার কেবলি মনে হবে আমি যেন সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। বার বার আমি হায় করে বলে উঠবো শেষ বিদায়ের বুক-ভাঙা যন্ত্রণায় মুচ্‌ড়ে-ওঠা বাণী। আর অনিবার্য্য হত্যার আঘাতে আমি টলে টলে পড়ব, চোখে অন্ধকার দেখব।

আর আমাদের ছেলেদেরই বা কি দশা হবে? শিবতুল্য বাপকে যমের দুয়োরে পাঠানো, পুত্রস্নেহাতুরা মাকে চিরস্থায়ী শূন্যতার হাতে সঁপে দেওয়া—একে কোন্ ধরণের অনুকম্পা বলে? অমন কৃপার পাত্র হয়ে মাথা হেঁট করে বেঁচে থাকবার চেয়ে আমি হাজারবার চাই আমার স্বামীকে মৃত্যুর মধ্যে জড়িয়ে ধরতে।

রাজনৈতিক কুটনীদের কাছে নিজেকে বারবণিতার মত বিক্রী করে—না, আমি আমার বিবাহবাসরে অগ্নি-সাক্ষী-করা শপথ ভাঙব না; দুজনে যে আনন্দ, অখণ্ডতা আমরা ভাগ করে নিয়েছি, তার সম্মান আমি ধূলোয় লুটিয়ে দেবো না। আমার স্বামী নির্দোষ, যেমন নির্দোষ আমি নিজে। দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই জীবনে কিম্বা মরণে আমাদের আলাদা করে।

প্রত্যাখ্যান

প্রিয় ম্যানি, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ সন্ধ্যে ছ'টা

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার কিছু আরও তাঁর জব্বর 'জেহাদ' দেখালেন! দেখে আমার বাইবেলের একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বিলক্ষণ যা একটু বদলেছে শুধু পাত্র পাত্রী। গলার স্বরটা জেকব-এর, কিন্তু হাত দুটো এসাউ-এর'। পরিহাস আর কাকে বলে; এক নিষ্ঠুর আচরণের গায়ে ভণ্ডামি করে জড়ানো হয়েছে দরদপূর্ণ কথার নামাবলী।

প্রেসিডেণ্ট আজ যে কাজ করলেন তাতে সরকারের শাসনবিভাগও খুনের দায়ে পড়ে গেল। কেননা নির্জলা সত্য হল এই যে আমরা নির্দোষ।

সকলের পক্ষেই আসল ঘটনাগুলো একান্তভাবে জানা দরকার। পত্রপত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচারযন্ত্রের মারফৎ যে খবরগুলো বেরোয়, সেগুলো আদৌ সত্য নয়। আমাদের মামলা ব্যাপারটাকে বিকৃত করে তুলে ধরে তার ধড় একদিকে মুণ্ডু একদিকে করে অত্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টিতে সেই খবরগুলো পরিবেশন করা হচ্ছে। বেআইনীভাবে আমাদের সাজা দেওয়া হয়েছে—এই কারণ দেখিয়ে আমরা নতুন করে বিচারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। এ মামলায় যদি সততার সঙ্গে নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নির্ধারণ করতে হয়, এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার হয়েছে কিনা দেখতে হয়—তাহলে আমাদের সেই আবেদন সংক্রান্ত বিচারকার্য এবং আদালতের আচরণের পুরো বিবরণই কেবল তার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে।

এটা খুব পরিষ্কার যে—যারা রাজনৈতিক দিক থেকে ভিন্নমতাবলম্বী, তাদের ওপর পীড়ন চালাবার জন্যে, তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি

আদায়ের জন্যই মামলাটা মূলত ব্যবহার করা হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় একমাত্র পরিণাম হবে—স্বদেশের লাঠি গুলীর সরকার আর পরদেশে লড়াই।

ন্যায় নীতির প্রতি যদি আমরা অচঞ্চল থাকি, তাহলে আমরা বিশ্বাস করি, তাতে অন্তত এইটুকু সাহায্যও হবে যে—আমাদের পরে অনেকে যারা আসবে আমাদের মত তাদের নিশ্চয়ই এমনতর বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হবে না।

আমরা চাইছি ন্যায়বিচারের সংগ্রাম যেন অবিরাম চলতে থাকে। আসলে ঘটনাগুলো কি আগে জানো, সত্যকে বুক দিয়ে বাঁচাও। জীবনের জন্যে, ভালবাসার জন্যে আমরা সাহসে মাথা উঁচু করে, বুকে ভরসা নিয়ে সমানে লড়াই করে চলেছি। চিরদিনের

জুলি

প্রিয় ম্যানি, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

আমরা যে খবর পেয়েছিলাম মার্জনার উকিল মিষ্টার লায়ন্স মামলার একমাত্র পুরো নথিটা অ্যাটর্ণি জেনারেলের কাছে এ সপ্তাহের শেষাশেষি পাঠাবেন, আমার মনে হয় খবরটা ছিল। খবরের কাগজগুলোতে যেটুকু খবর বেরিয়েছে তা এই: 'বিকেল ৪টা-৩০ মিনিটে মিষ্টার হার্বট ব্রাউনেল (ছোট) হোয়াইট হাউসে মামলার নথিপত্রগুলি আনিবেন।' ৫টা-৭ মিনিটে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে লিখিত বিবৃতি সাংবাদিকদের হাতে দেওয়া হল। এ থেকে দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারবে যে, প্রেসিডেন্ট নথিপত্রগুলো পড়ে দেখেননি, তিনি আমাদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদনও দেখেন নি। কাজটা কাঁচা হয়ে যাচ্ছে দেখে খবরের কাগজগুলো তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে নিজেদের দু কথা জুড়ে দিয়ে বলেছে: বিষয়টা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাহেব অনেক আগে থেকেই আলাদাভাবে ভেবে আসছিলেন এবং তিনি

'বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে পারমাণবিক যুগে এই ধরণের অপরাধের ফলে সাংঘাতিক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এবং এতজ্জন্য তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিচারকেরা যে রায় দিয়েছেন ন্যায্যত তাঁহার পক্ষে তাহার অন্যথা করা সম্ভব নহে।'

আর ভান করবার দরকার নেই ভাঁড়ামি যাচ্ছেতাই ভাবে ধরা পড়ে গেছে। এ থেকে আরও একবার আমাদের কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল : আগে থেকে বিরুদ্ধতার মনোভাব নিয়ে একতরফা ভাবে বিচার হয়েছে : নথিপত্র পড়ে দেখি বিচার হয়নি, একটি বিশেষ পক্ষ ক্রমাগত কানে মন্ত্র পড়েছে ; মামলার তথ্যপ্রমাণ কিম্বা গুণাগুণের ওপর এই বিচার আদৌ নির্ভর করেনি।

পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে, প্রেসিডেন্টের মূল বিবৃতিটা নিয়ে একবার নাড়াচাড়া করলেই দেখা যাবে তাতে কি রকম সাংঘাতিক সাংঘাতিক ভুল রয়েছে।

১। প্রেসিডেন্ট সাহেব 'মামলার নথিপত্র অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বিচার' করে দেখেছেন—এটা কখনই সম্ভব হতে পারে না। কেননা অ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর কাছে নথিপত্রগুলো পৌঁছে দিয়েছেনই বেলা সাড়ে চারটেয় আর তারপর আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই এদিকে কিন্তু লিখিত বিবৃতি বেরিয়ে গেল।

২। সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করার পুরো সুযোগসুবিধে আদালত-গুলোর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আমাদের দণ্ডটা যে অবৈধ তা দেখবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করার জন্যে আমরা শুনানীর একটা দিন চেয়েছিলাম। আমাদের বক্তব্য সপ্রমাণ করার জন্যে যাতে বিভিন্ন দলিলপত্র এবং বিভিন্ন সাক্ষীসাবুদ হাজির করা হয় তার জন্যে আমরা বলেছিলাম আদালত থেকে সমন পাঠানো হোক। বিচারক রায়ান আমাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি।

৩। সংবাদপত্রের প্রতিদিনকার বিরুদ্ধ প্রচার, সরকার পক্ষের গর্হিত আচরণ এবং সেই সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমদানি করা—এর ফলে জুরীরা আগে থেকেই আমাদের বিরুদ্ধে খাপ্পা হয়ে ছিল এবং বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করছিল।

৪। আমাদের বিরুদ্ধে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ আদালত না করেছে তার সমর্থন, না করেছে তার নতুন করে বিচার। সহযোগী বিচারক ফ্র্যাঙ্কফুর্টার যে মত দিয়েছেন, তাতে তিনি স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন।

সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁদের মধ্যে আছেন বৈজ্ঞানিক, বিখ্যাত আইনজীবী, ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিনিধি পণ্ডিত ও শিল্পীসাহিত্যিক, সমস্ত রকম রাজনৈতিক মতের জনমান্য নেতা, প্রশ্নগুলো বিচার করে দেখার যাঁদের পুরোপুরি যোগ্যতা আছে, তারা গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন : আসলে বিচারটাই হয়েছে দোষদুষ্ট।

দুই ছেলের প্রতি, আমাদের পরস্পরের প্রতি আমরা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি যে ভালবাসা সেই ভালবাসাই আজ দাবি করছে—আমরা যেন সত্যের পথ থেকে একচুলও সরে না আসি ; মৃত্যু এসে আমাদের ছোট সংসার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে, তবু মৃত্যুর মধ্যেও যেন আমরা শক্ত হাতে সত্যকে ধারণ করি।

দুঃশাসনের হাতে আমরাই প্রথম বলি নই। আমাদের ষাট লক্ষ সহধর্মী এবং সেই সঙ্গে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী আরও লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ ফ্যাশিজম্-এর শিকার হয়ে পাইকারী হত্যার সরকারী কশাইখানায় প্রাণ দিয়েছে। যে যুদ্ধাপরাধীরা এইসব নৃশংসতার জন্যে দায়ী, আমাদের রাজপ্রতিনিধিরা বন্দীশালা থেকে তাদের দৈনিক ছেড়ে দিচ্ছে। আজ এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতির প্রতিভূ সেজে সরকার চাইছে রোজেনবার্গদের রক্তে দেশের

সুনাম কলঙ্কিত করতে। গোড়ায় তারা দুই নিরীহ আমেরিকানকে বধ করছে। এ তো সবে শুরু, এরপর তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বলি দেবে, আমরা বিশ্বাস করি এই নতুন সাংঘাতিক বিপদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ কেশর ফুলিয়ে হুঙ্কার করে উঠবে।

আসল চেহারা পরিষ্কার বেরিয়ে পড়েছে। আজ যে-কেউ তা দেখতে পাবে। আমাদের প্রাণভিক্ষা চেয়ে ধর্মগুরু পোপ যে আবেদন জানিয়েছিলেন, বিচার বিভাগ সে আবেদন চেপে রেখেছে—প্রেসিডেণ্টকে এবং দেশের লোককে তা জানতে দেয় নি। নথিপত্রে লিপিবদ্ধ সত্যকার ঘটনাবলী এবং কোটি কোটি মানুষের প্রকৃত মনের কথা বিচার বিভাগ চেপে রেখেছে—প্রেসিডেণ্টকে এবং দেশের লোককে জানতে দেয়নি। আমাদের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগ যে চক্রান্ত চালিয়েছে তাতে গোড়া থেকেই এই ধারাটি অনুসরণ করা হয়েছে! দুজন নিরীহ আমেরিকানের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সাংঘাতিক অবিচার সম্পূর্ণভ বে ঢেকে দেবার জন্যেই তারা লিখিত বিবৃতিতে প্রেসিডেণ্টকে দিয়ে তাড়াহুড়া করে সই করিয়ে নিয়েছে।

তোমাদের জুলি

প্রিয়তমা আমার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, আইজেনহাওয়ার নথিপত্র পড়েননি। আমাদের আবেদন দেখেন নি। বিবৃতির মধ্যে স্পষ্টতই উল্টোপাল্টা কথা থাকায়, শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টাতে বলা হচ্ছে: উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নাকি মামলাটা সম্পর্কে ওর ধারণাটা ভাল করে আবার একবার জানিয়ে নিচ্ছেন। ভণ্ডামিরও সীমা আছে। তাঁর এটুকুও যাচাই করে দেখবার মনোবৃত্তি হল না যে, তাড়াতাড়ি যে সব বস্তাপচা ছেঁদো-কথাগুলো তিনি বলেছেন সেগুলো ঠিক কিনা। তাছাড়া, সর্বোচ্চ আদালত নাকি আমাদের মামল

পুনরায় বিচার করে দেখেছে—এমন একটা স্পষ্ট ভ্রমাত্মক উক্তি করেও তিনি চুপচাপ হজম করে আছেন। আমাদের শূলে চড়াবার মনোবাঞ্ছা হয়ত তাঁর পূর্ণ হবে ; কিন্তু সারা দুনিয়া তাঁকে ধিক্কার দেবে।

কাজ কামাই দিইনি এথেল—কিন্তু এক নাগাড়ে আজ খুব বেশীক্ষণ কাজ করতে পারিনি। আমার মনের ভাবটা ঠিক গুছিয়ে উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। নিশ্চিন্তে ধরে নিতে পারো, আমার সমস্ত ভাবনাই তোমাকে ঘিরে। তোমাকে আমি যত ভালবাসি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি কাউকে আমি কোন দিন এতখানি ভালবাসব।

তোমারই মত, প্রিয়তমা, আমিও ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না এই নতুন অবস্থার ফলে আমাদের সোনার মানিকদের কি দশা হবে। আরও কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, আমরা খুন হয়ে যাবার পর যে মারাত্মক ফলাফল হবে, তা থেকে ওদের রক্ষা করবার ব্যাপারে আমাদের কিছুই করবার থাকবে না—যে মর্মান্তিক আঘাত ছেলেরা পাবে আমরা তার জ্বালা জুড়োতে পারব না। এই যন্ত্রণা দাঁতে দাঁতে সহ্য করে ছেলেদের যাতে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারি, তার জন্যে নিজের মধ্যে আমাকে শক্তি পেতেই হবে। এ আমাদের করতেই হবে। চিঠিটা ম্যানির কাছে পাঠিয়ে তাকে বলা—এমন সময় যেন সে চিঠিটা ছেলেদের পড়ে শোনায় যখন ম্যানি বুঝবে চিঠি শুনে ওরা ভেঙে পড়বে না—যাই হক, পরে আমাদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করে নেব কোন্‌টা করলে সব থেকে ভালো হয়। এই বেলা এখন থেকে আমাদের তোড়জোড় শুরু করতে হবে যাতে জরুরী কাজগুলো বাকি থেকে না যায়, শেষকালে সব কিছু যেন শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে না হয়। এর পরের বার যখন আমাদের উকিল সলাপরামর্শের জন্যে আসবে, তখন এ নিয়ে আলোচনা তোলা যাবে।

আমি তোমাকে জানাতে চাই, প্রিয়তমা—তুমি আমার জীবন

ঐশ্বর্যে ভরেছো, আমি সুখী। তুমি সমস্তক্ষণ বিরাজ করছ আমার মনে। আমি তোমার

জুলি

প্রিয় ম্যানি, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

আমাদের মামলার ব্যাপারে খবরের কাগজ আর রেডিও মারফৎ যতটুকু যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমার মতটা তোমাকে লিখে জানাচ্ছি। ধাক্কাটা প্রথম লাগতেই এক মুহূর্তের জন্যে দেশের লোক সত্যের মুখ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তারপরই তাড়াতাড়ি হাঁ হাঁ করে ছুটে গিয়ে মিথ্যের পর্দাটা আবার ধুপ করে ফেলে দেওয়া হল।

এই রবিবারের 'টাইমস্'ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিভাবে ছলনাকর শিরোনামা দিয়ে ওরা পাঠকদের মন থেকে 'পোপের বাণীর মূলগত অর্থ'টা মুছে দিতে চেয়েছে। চোখ ধাঁধিঁয়ে দিয়ে লোকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে ওরা টুকরো টুকরো খবরের সাংবাদিকতার ভেল্কি ছুটিয়েছে, খবরের মাথায় স্বেচ্ছায় বসিয়েছে ভ্রান্তিকর হেডিং, জায়গামত ছেড়েছে হেগার্টির* একটা ঠেস্-দেওয়া মন্তব্য।

খবরের কাগজ যারা পড়ে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই খুব 'খুটিয়ে-পড়া' পাঠক নয়। তাদের মনকে চালনা করে তাদের চোখ। জলে কাৎ করে ঝিনুক ছুড়লে যেমন সেটা একবার ডোবে একবার ভাসে—তেমনি অধিকাংশ পাঠকদেরই অবস্থাটা: এই দেখছে এই দেখছে, ব্যস্ পরক্ষণেই আবার চোখের আড়ালে চলে গেল। রটানো হচ্ছে যে, পোপ যা বলেছেন তা তাঁর ঠিক মনের কথা নয়। জেনেশুনে সত্যকে কিভাবে বিকৃত করা!

আমার মনে হচ্ছে, এই ঘটনাটা যেন সভ্যতার মর্মমূলে গিয়ে যা দিচ্ছে—কেননা এর ফলে সত্য বিনাশ পাচ্ছে। কিন্তু তবু যেহেতু

*জেমস্ হেগার্টি—প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সংবাদ-সচিব

সত্যকে চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না। তাই এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখ থেকে সমস্ত ঢাকনাটা খুলে খসে পড়বার আগেই ওরা যত তাড়াতাড়ি পারে আমাদের নিকেশ করে দিতে চাইছে। ভয়ে ওদের কাছা খুলে পড়ুক ; সত্যকে প্রকাশ করে দেবার জন্যে আমরা সাহসে বলীয়ান, বিশ্বাসে অটল থাকব।

বুক বেঁধে এগিয়ে যাও, প্রিয় বন্ধু—আমাদের সত্তার প্রত্যেকটি তন্তু দিয়ে আমরা তোমার পেছনে আছি। তোমাদের—

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

ছেলেদের দেখা করতে আসার ব্যাপারে গোলমালে আর উত্তেজনায় এবং আমাদের মামলার ব্যাপারে খুব দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকায় তোমাকে বলবার সময় পাইনি—কি সুন্দর যে তোমাকে দেখাচ্ছিল। বলতে পারি নি তোমাকে কত যে ভালবাসি। অবস্থার কথা বিবেচনা করে বলা এমন একটা ব্যাপার আমরা ভালভাবেই সামলাতে পেরেছি—কাজও হয়েছে অনেকটা।

চমৎকার হয়েছিল সেদিন। উদ্বেগের মধ্যে হলেও সবাই আবার এক জায়গায় হওয়া—সবাই মিলে আবার সেই এক অভিন্ন সুখী পরিবার গড়ে তোলা। কী ভালো যে লেগেছিল। এই একটু সুখের কাছে মানুষের কোন ত্যাগই ত্যাগ নয়। ছেলে দুটোর বেশ উন্নতি দেখাচ্ছে। উন্নতির ভাগটা মাইকেলেরই বেশী। তবে আমার দৃঢ় ধারণা, আমাদের ছোট ছেলেটার পক্ষে খুব বেশীরকম সাহায্যের দরকার! তাছাড়া ওদের দুজনেরই শরীর খুব কাহিল হয়ে পড়েছে, দেখেই বোঝা যায় ওদের মনের ওপর দিয়ে বড় বেশী ধকল যাচ্ছে। আমরা যা কিছু বলি, যা কিছু করি সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমরা আমাদের আস্ত হৃদয়গুলো চারিয়ে দিই। লোকে কি সত্যিই তা

বোঝে ?—যারা সত্যকে দেখে তারা আমাদের আচরণ শুভ ও যথার্থ বলে মনে করে। সত্যকে যারা দুচক্ষে পড়ে দেখতে পারে না, তাদের চোখে আমরা একটু 'গোঁয়ার গোবিন্দ এবং দুর্বিনীত' বৈকি।

খুবই কঠিন। দাঁতে-দাঁত-দিয়ে লড়াই। তবু এখনও আমার বিশ্বাস—আমরা জয়ী হবো। মিথ্যের হাতে, কদর্যতার হাতে কিছুতেই আমি নিজেকে তুলে দেব না। আমাদের সন্তানদের জন্যে, পৃথিবীর সুজন মানুষদের জন্যে যতদিন আমরা ঠিক-কাজ করে যাবো, ততদিন কিছুতেই কিছু যাবে আসবে না। আমাদের দুটি হৃদয় আত্মার কঠিন মেলবন্ধনেই আমাদের শক্তি। সেই শক্তির জোরেই আমরা—ভবিষ্যতের গর্ভে যাই থাকুক না কেন, আমরা তার সামনাসামনি চোখে চোখ রেখে দাঁড়াবো।

তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, তার মৃত্যু নেই। তোমার কথা মনে হলেই, আমার ব্যাথাকাতর হৃদয় শান্তি পায়। তোমার—

জুলি

ওগো প্রিয়তমা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

তোমার জন্যে যে মন কেমন করে। হাতে যখন আরও কিছু সময় পাওয়া গেছে, তখন এসো ছেলেদের সম্পর্কে তোমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি নিয়ে পুরোদমে লাগা যাক। আর একটুও দেরি নয়—এখুনি বুঝে দেখ—সব থেকে জরুরী এক্ষুনিকার প্রশ্ন ছিল—জীবন না মৃত্যু। প্রত্যেকে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছিল—যেকোন মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত বুঝি হয়ে যাবে। তাই অন্য কোন দিকে কারো মন ছিল না। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছো—ব্যবস্থার ছক আমাদের সমানে করে যেতে হবে, সমানে বাঁচাতে হবে। ব্যাপারটার প্রতি এখুনি যাতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয় তার জন্যে সবাইকে বোঝানোর ব্যাপারে তোমাকে আমি সাহায্য করব।

ছেলেদের ব্যাপারে, তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা কি হবে না হবে সে সম্বন্ধে আমাদের আরও খুঁটিয়ে ভাবতে হবে এবং শুধু ভাবা নয়, ওদের স্বাস্থ্য, স্কুলে পড়া, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা বাৎলাতে হবে। যদি আমরা কিছু কিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যে চালু করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা অনেকটা ভরসা পাবো এবং দুশ্চিন্তা অনেকখানি কেটে যাবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। বিশেষ করে, যখন ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবার দিন ঘনিয়ে আসবে।

এখন থেকে আমাদের দেখা হওয়ার ব্যাপারটা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। আমরা বুঝতে পারছি—এখন বেশ কিছুদিন আমাদের ছেলেদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ব্যাপারটা সমস্যা হয়েই থাকবে; আবার তেমনি আমাদের একটা বড় প্রশ্ন এসে হাজির হচ্ছে—আমাদের আইনের লড়াই এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন।

একই মামলায় যারা আসামী হয়, তারা সব সময় কাছাকাছি থাকে, নিয়মিত ভাবে তারা তাদের মামলার ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে, পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তুমি যেহেতু আমার স্ত্রী এবং স্ত্রীলোক, সপ্তাহে গোণাগুন্তি দু'ঘণ্টা আমাদের দেখা বরাদ্দ। এখানে বাদবাকি প্রত্যেকেই আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সপ্তাহে রীতিমত ভাবে দুবার দেখা করতে পারে—১০টা থেকে ১২টা এবং ১টা—৩০ থেকে ২টা—৩০। হ্যাঁ, আমি বুঝি আনুষ্ঠানিক দিক থেকে বাধা আছে, কিন্তু দরকারটা এত বেজায় যে —সত্যি বলছি, ওদের উচিত আমাকে যে করে হোক সোজাসুজি জেনানা ফাটকে জায়গা করে দেওয়া।

জানো প্রিয়তমা—মাসের পর মাস কেটে গেল। তবু আমাদের এখানে থাকার ব্যাপারটা আজও আমার কাছে কেমন যেন আজগুবি বলে মনে হয়। অনেকদিন আগে আমি যেন আরও কোথায়

থাকতাম। মিষ্টিমত একটা বউ আরও দুটি সোনার ছেলে নিয়ে আর পাঁচজনের মতই আমি ছিলাম। আজ সব গেছে। আমাদের সামনে মৃত্যু। আর যখনই আমি স্ত্রীর মধুর একটু চুম্বনের জন্যে, পুত্রের একটু সাদর আলিঙ্গনের জন্যে মরে যাই—তখনই আমি প্রতিশ্রুতি পাই আমার পূর্বপরিচিত সুন্দর জীবনে আবার ফিরে যাবার। তখন যখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলব, আমাদের দিনগুলো কি সুখেরই না হবে। মানবিক এই শক্তি, জগৎ জুড়ে সাচ্চা মানুষদের সমর্থন—তারই জোরে এমনি এক জয়ের আশায় আমি মাটিতে দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে লড়ি।

তোমার স্বামী জুলি

প্রিয় ম্যানি, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

আমাদের এই সুমহান দেশের যিনি পিতা আজ তাঁর এই জন্মদিনে সত্যের ধারণাটাই সব চেয়ে বড় স্থান পায়—কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রথম প্রেসিডেণ্টের জীবনপ্রসঙ্গের মূল কথাই ছিল তাই।

১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী 'নিউইয়র্ক পোষ্ট, পত্রিকায় লিওনর্ড লায়ন্স্-এর কলমে যে খবরটা* বেরিয়েছিল—আমি মনে করি জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক সেই প্রসঙ্গটা নিয়ে আজ এমন দিনে আলোচনা করাটা ঠিক যথোচিতই হবে। এর আগে আরও এরকম একাধিক ঘটনা আমি তোমার নজরে এনেছি। আমাদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের মনকে বিষিয়ে দেবার জন্যে, আমাদের হত্যা করবার

*যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল উইলিয়াম ক্যারল অন্তিমকালীন ব্যবস্থাদির জন্যে মৃত্যু-পুরীতে গেলে আণবিক-বোমার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত গুপ্তচর জুলিয়াস ও এথেল রোজেনবার্গ তাঁকে বলে যে, কোন ইহুদী ধর্মযাজকের উপস্থিতি তারা চায় না। কারণ, ইহুদী ধর্মযাজকেরা পুঁজিবাদীদের হাতের যন্ত্র।…লিওনার্ড লায়ন্স, 'নিউ ইয়র্ক পোষ্ট'

জন্যে যে চক্রান্ত চলেছে তার পথ প্রশস্ত করার জন্যে—এখানে আবার সেই সম্পূর্ণ মনগড়া মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল উইলিয়াম ক্যারল সিং-সিঙে আসেননি, যদি এসেও থাকেন তো আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেননি। আমরা কখনও যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল কিম্বা আর কারও কাছে কোন ইহুদী যাজক সম্পর্কে ওরকম কোন উক্তি করিনি। এটা মনে রাখা বোধহয় ভাল যে, লায়ন্স্-এর সঙ্গে সরকারী উকিল কাউফম্যানের এবং গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের গলায় গলায় ভাব। তুমি যদি অন্য ব্যপারে বেশী ব্যস্ত থাকো, তাহলে তোমার সঙ্গে যুক্ত আছে এমন কারো ওপর এবিষয়টার ভার দিও।

এই রবিবারের 'টাইমস্' পড়ে এই দেখে ভাল লাগল যে ইউরোপের মানুষ আমাদের মামলাটা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, আস্তে আস্তে তার খবর আমাদের দেশের মানুষের কাছে যাহোক এতদিনে পৌঁছুতে শুরু করেছে। কমিটির পক্ষ থেকে যেসব কাগজপত্র ছাপা হয় আমাদের এক কপি করে পাঠাবার জন্যে তোমার সেক্রেটারীকে বলে দিও।

প্রিয় বন্ধু, আমরা তোমার ওপর নির্ভর করে আছি। আমরা জানি তুমি এমন একটা ব্যবস্থা করবে যাতে গর্বে আমাদের মাথা উঁচু হবে।

তোমাদের জুলি

পুনশ্চ। ওয়াল্টার উইঞ্চেল লায়ন্সেরই সুরে সুর মিলিয়ে কুৎসা চালু রেখেছে। এব্যাপারে নিউ ইয়ার্ক-এর ইহুদী ধর্মযাজক সঙ্ঘ কিছু বলতে চাইতে পারে। এর একটি মন্তব্যের মধ্যেও বিন্দুমাত্র সত্য নেই।

প্রিয় ম্যানি,   ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

গোড়ায় আমি ভেবেছিলাম লায়ন্স-এর লেখাটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ক্রমেই এখন আমি বুঝতে পারছি আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে এটা নতুনতম প্যাঁচ। আমাদের বিরুদ্ধে আইন আদালত খাড়া করার ভেতর দিয়ে যে জালজুয়াচুরি দেখানো হয়েছে এক্ষেত্রেও তারই অদ্বিতীয় প্রকাশ।

প্রথমে লায়ন্স, তারপর রবিবার রাত্রে বেতারে এবং সোমবার তার সংবাদপত্রের স্তম্ভে উইঞ্চেল তুজনে মিথ্যে রটনা করেছে। বিচারের প্রহসন খোলাখুলি দেখিয়ে দিয়ে এবং আমাদের প্রাণরক্ষার দাবি জানিয়ে যে ঢেউ ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে তার গতিরোধ করার জন্যেই শত্রুরা মরীয়া হয়ে এবার এই নতুন চাল চেলেছে। বর্তমান কমিউনিষ্টদের ঘাড়ে ইহুদীবিদ্বেষ চাপাবার জন্যে ঘৃণার ব্যাপারীরা তেড়েফুঁড়ে যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার সঙ্গে এটা চমৎকার খাপ খেয়ে যায় এবং এবারেও রোজেনবার্গদের তারা জুড়ে দিয়েছে।

আমাদের কাছ থেকে ওরা ঘা খাচ্ছে, ম্যানি—তাই অমন সব উন্মাদের মত কাণ্ড করে বসছে। মানসিক যন্ত্রণা থেকে এর উৎপত্তি। আরেকটু মোক্ষম ফলের আশায় আছি।

ছেলেদের কাছ থেকে আমরা একটা চমৎকার চিঠি পেয়েছি। যে শহরের প্রায় বেবাক লোকই বেকার, ইতালির এমন একটি শহর থেকে ওদের কাছে অনেক সব সুখাদ্য এবং একটা ছোট্ট কলের বাজনা পাঠিয়েছে চিঠিতে এই খবরটা পেয়ে আমি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। এই উপহারের পেছনে রয়েছে যে শুভচিন্তা, আমাদের হাত ধরে মানবজাতির সত্যকার হৃদয়টা তা চিনিয়ে দেয়; সেই সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আসা উৎসাহব্যঞ্জক বহু চিঠি, বুকের উত্তাপ দেওয়া ঘোষণা মানুষের অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বভাবের নিদর্শন হয়ে দেখা দেয়। এ লড়াই জিততে যা লাগে, আমাদের তা আছে। সব সময়েই চূড়ান্ত উত্তর দেবার মালিক জনসাধারণ।   তোমাদের জুলি

প্রিয় ম্যানি, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

হয়ত নিকট ভবিষ্যতে রবীর গলার টন্‌সিল কেটে বাদ দিতে হতে পারে। কাজেই আমার মনে হয়, রবীর প্রতি ভাল করে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এতদিন ধরে যে শাস্তি ও পেয়ে এসেছে, তার ওপর আবার নতুন করে ও শাস্তি পাক—আমার আদৌ তা ইচ্ছে নয়। বরং ছুরি না ছুঁইয়ে যদি পারা যায়। তাহলে মিছিমিছি ওকে কষ্ট না দেওয়াই ভালো। কিন্তু ওর ইস্কুলের কার্ডে দেখলাম বহুদিন ওর কামাই হয়েছে ; ওর শরীরের অবস্থাটা একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। যে রকম চিকিৎসা দরকার সে রকম চিকিৎসা গ্রহণ করবার মত যদি ওর মনের জোর থাকে, এবং যে পরিবারে সে আছে তারা যদি বোঝে হ্যাঁ ঠিক আছে (বুঝলে, যদি দেখি দুটো শর্তই পূরণ হচ্ছে, একমাত্র তাহলে আমরা তাকে মত দেবো) তাহলে তার জন্যে যে ব্যবস্থা করা দরকার হবে, তখন যেন তা করা হয়। দেখে আমাদের খুব কষ্ট হল—একবারে দু চারটি কথার বেশী বলতে গেলেই ও বেজায় মুস্কিলে পড়ে যায়। ওর কথা জড়িয়ে যাবার কারণগুলো যে অন্য তাতে আমার সন্দেহ নেই। তাহলেও ওর নাক আর গলা সব সময় যে রকম বুজে থাকে, তাতে ভাবনা হবারই কথা। যাই হোক রোগ সারবে—এরকম একটা আশ্বাস পাওয়া দরকার। একমাত্র তাহলেই আমরা বলব ঠিক আছে।

যাদেরই আমি নিদারুণ ভালবাসি, তাদের প্রত্যেকেরই অভাব অনুভব করি। অসম্ভব এই নিঃসঙ্গতা।

এথেল

প্রিয় ম্যানি, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

আমাদের জীবনদর্শনের মূল কথাই হল—সমান অধিকারে এবং ধর্মের স্বাধীনতায় অচঞ্চল বিশ্বাস। তাই লায়ন্স্‌ এবং উইঞ্চেলের

প্রচারিত মিথ্যার বহর দেখে আমরা এতখানি রাগে দিশেহারা হয়েছিলাম।

সিং-সিঙে ইহুদী ধর্মযাজকের উদ্যোগে যে কবার উপাসনা হয়েছে আমি আর এথেল থেকেছি। ফাঁসীর সেলবাড়ীটায় তিনি যখনই আসেন আমার সঙ্গে কথা হয়। আমি সেদিন ওর কাণে কথাটা তুললাম। শুনে উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ওঁর ধারণা, ছিল না যে খবরের কাগজের দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকগুলো এতখানি পাপিষ্ঠ প্রকৃতির হতে পারে। এতদিন এখানে থাকার ভিতর দিয়ে ক্যাথলিক ধর্মযাজক রেভারেণ্ড টমাস্ জে ডোনোভান আমাকে বিলক্ষণ চেনেন। সংবাদপত্রের খবরগুলো শুনে উনিও থ' হয়ে গেলেন এবং বললেন আমার মধ্যে ও ধরণের মনোভাব কোনদিন তিনি দেখেন নি। এই দুই ধর্মযাজক এবং এখানকার জেল কর্তৃপক্ষ এঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, এখানে সকলের সঙ্গেই আমি সব সময় মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করেছি এবং বিশেষভাবে কাজে ও কথায় আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে আমি একদিকে যেমন ধর্মদ্রোহী নই, তেমনি আবার অন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষদের প্রতি কোন ধর্মান্ধ বিদ্বেষও আমার নেই।

প্রিয় বন্ধু, নিরপরাধ হওয়া সত্বেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে আমাকে এইভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় এক নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, বেলমণ্ট প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক-এর লায়ন্স ক্লাবের এক দিবাকালীন ভোজসভায় মিষ্টার লেন* এক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার বেশীর ভাগটাই ছিল রোজেনবার্গ 'গুপ্তচর' মামলা চালনার ব্যাপারে।

তাঁর বক্তৃতার একেবারে শেষ কথায় আসল ব্যাপার বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বলেছেন: 'কমিউনিষ্টরা যখন আমাদের প্রাণ

*রোজেনবার্গদের মামলায় সরকারপক্ষের সহকারী উকিল মাইলস্ জে লেন।

নেবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে, তখন আসুন আমরাই ওদের আগে সাবাড় করি।' সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, তাঁর আশা আছে আমেরিকানরা কমিউনিষ্টদের ছুঁচ হয়ে ঢোকার নীতি সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকবে। তিনি আরও বলেন যে, এই মামলার সাহায্যে ঐ নীতির গোড়া কেটে দেওয়া যাবে। ও, তাই বলো। এই জন্যেই বুঝি দুজন নিরপরাধ মানুষকে মিথ্যে মামলায় জড়ানোর ব্যাপারে তুমি হাত লাগিয়েছো যাতে এই মামলাটাকে ভিন্ন মতাবলম্বীদের (যাদের তোমরা চোরে-চোরে-মাস্তুতো-ভাইয়েরা না হক্ দেখলেই কমিউনিষ্ট বলো) বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বলতে বলতে মনে পড়ল, আমি সবে তিন মাসের চাঁদা দিয়ে 'টাইমস্'-এর গ্রাহক হয়েছি।

আশা করি, তুমি নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিচ্ছো। আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি, এই মামলার ভেতর দিয়ে আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ তুমি। তোমাকে আমরা পেলাম এবং দুদিনেই আমরা হয়ে উঠলাম তোমার, তুমি আমাদের প্রাণের বন্ধু।

তোমাদের জুলি

আবার আবেদন

প্রিয়তমা এথেল,　　　　　　　　　　　　১৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

একেকটা সময় আসে, যখন আমার মধ্যে জাগে সিংহের বিক্রম—মুখে রক্ত তুলে প্রাণপণে খাটি, আর কি উৎসাহ—কেননা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। তখন কি ভাল যে লাগে! তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়, ম্যানি যখন আসে, ছেলেদের যখন কাছে পাই, কিম্বা যখন বাড়ি থেকে কেউ আসে, যদি শুধু একটা চিঠি পাই, কেউ দিয়ে যায় শুধু ভালো দু একটা খবর আমার মন মেতে ওঠে, মনে জোর পাই। অবশ্য এতেই সব কিছু হয়ে যায় না। আমি যে ফিরে যেতে পারি না তোমার কাছে, ছেলেদের কাছে—আমাদের সংসারে যেতে পারি না। আর তার পর যেদিকে চাই চরাচর ধূ ধূ করে। ব্যাথায় টন্‌টন্ করে বুক।

বইপত্র বড় ভাল জিনিষ। যখন পড়ি ভুলে যাই। আমাকে ওরা এখান থেকে বাঁচিয়ে বার করে নিয়ে যায়। আমাকে তৃপ্তি দেয়। আবেগে জড়িয়ে তুলে ধরে। আমি চিন্তার খোরাক পাই। এখন আমি পড়ছি ফোর্বস্-এর লেখা একটা বই—বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন যন্ত্রকুশলতার ইতিহাস এবং সভ্যতার ওপর তার ছাপ কিভাবে পড়েছে। বইটা পড়লে অনেক কিছু জানা যায়, লেখাও বেশ মজা করে। যেই বইটা চোখ থেকে নামিয়ে রাখি অমনি, ঝুঁকে কাছে এসে দেয়াল আর লোহার গরাদগুলো আমাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে।

যন্ত্রের কারিকুরির দিক থেকে মানুষ কত দ্রুত এগিয়ে গেছে—

কিন্তু এই দেয়াল আর লোহার গারদগুলো আমাকে তার উল্টোপিঠটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমাদের চারপাশে মান্ধাতা আমলের সেই সেকেলে বর্বর, ভূতুড়ে, শুচিবায়ুগ্রস্ত জীবন আজও অনেকাংশে টিকে আছে। শব্দের পেছনে, আকৃতির পেছনে, সমাজ সংসারের পেছনে কি অর্থ লুকিয়ে আছে, চোখ থেকেও যে তা দেখতে না পায়, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে না পারে সে তো জীবন থেকে কিছুই পায়না। কেননা কেবলি সম্মুখ দিকে মানুষের যে গতি তার মধ্যে তো জীবনের আসল মাধুর্য।

আমাদের হিব্রু সংস্কৃতির যুগ-যুগ-সঞ্চিত ঐতিহ্যকে পুরুষানুক্রমে আমরা কাজে লাগিয়েছি, তা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। এই ঐতিহ্য আমাদের অস্থিমজ্জায়, আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। আমরা তারই নির্দেশে বন্ধনমুক্ত জীবনের জন্যে, সমৃদ্ধতর জীবনের জন্যে, মহত্তর জীবনের জন্যে লড়ছি। দুজনকে দুজনের কাছ থেকে আলাদা করে সামনে মৃত্যুকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে; তবু আমরা যা তাই থাকব, আমাদের যা আছে তাই থাকবে—কারো সাধ্য নেই ছিনিয়ে নেয়। আমার মনে হয়, আমরা যদি এমন গভীরভাবে অনুভব করতে না পারতাম, আমাদের বিরুদ্ধে রুজু করা মামলার দূর-প্রসারী অর্থ যদি ধরতে না পারতাম—তাহলে হয়ত আমাদের যন্ত্রণা অনেক হাল্কা হয়ে যেত। সে যাই হোক, আমার দৃঢ় ধারণা—যে পথে আমরা চলেছি, তাছাড়া আর কোন পথেই আমাদের মন উঠত না। আমাদের পথ বহু বাধায় কণ্টকিত; তবু—আমরা যেমন অতীতে করেছি, তেমন ভবিষ্যতেও প্রগতির পথ নিরন্তর প্রশস্ত করে যাবো। তারই জন্য আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা কদর্যতম ছলাকলার আশ্রয় নেয়—কেননা সোজাসুজি ঘা দিয়ে আমাদের ওরা ঠিক পেড়ে ফেলতে পারে না। তুমি নাও আমার হৃদয়ের উৎসারিত সমস্ত ভালবাসা।

তোমার অনুরক্ত স্বামী জুলি

প্রিয় ম্যানি,   ৫ই মার্চ, ১৯৫৩

১০ই মার্চ মাইকেলের জন্মদিন। ওর দশ বছর পূর্ণ হবে। বাড়িতে থাকতে আমরা বরাবরই এই উপলক্ষে ওদের দুভাইকেই নানা রকম উপহার কিনে দিতাম। তাছাড়া উৎসবে ওদের আনন্দ দেবার আরও সব দিক থাকত। আমাদের মনে হয় এমন একটা সময়ে বিশেষভাবে চেষ্টা হওয়া উচিত—যাতে আমাদের ছেলেরা বোঝে সংসারে তাদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি জানাবার আরও লোক আছে, যাতে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ও কল্যাণ সম্বন্ধে ভরসা পায়। আমার পরিবারের লোকেরা যদি ভুলে গিয়ে থাকে দিনটা যে যথার্থ কি সেটা মনে করিয়ে দিও—কেননা আমি জানি ওরা রবী আর মাইকেলের জন্যে বাড়িতে কিছু করতে চাইবে। যদি সম্ভব হয় ওরা যা পারে তার ওপর তুমি আমাদের হয়ে কিছু একটা জিনিষ ওদের কিনে দিও। এথেল বলছিল বড় করে বাঁধানো আমাদের একটা ছবি যদি ওদের দেওয়া যায় তাহলে একটা বেশ সুন্দর উপহার হতে পারে।

মুক্তিপ্রিয় ফরাসী জাতির সুসন্তান পল্ ভিলার্ড ভ্রাতৃসুলভ যে অন্তরস্পর্শী বাণী পাঠিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ফরাসী দেশের কোটি কোটি মানুষের এই প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতি আমাদের প্রেরণা দেবে, সাহস জোগাবে! যতদিন দুনিয়ার মানুষের বিবেক বুদ্ধি এই ভাবে শুভকামনা ও সৌভ্রাতৃত্বের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হতে থাকবে, ততদিন পৃথিবীর বুকে নিশ্চিন্তে বাস করবে শান্তি ও স্বাধীনতা, রোজেনবার্গরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে।

পৃথিবী উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে। অনেক বড় বড় ব্যাপার এখুনি মীমাংসা হয়ে যাবে। ঘটনাক্রমে, দুটি অতি নগণ্য জীবন এইসব বড় বড় ব্যাপারের সঙ্গে ঝুলছে। সব চেয়ে বড় কথা হল এই যে—যেদিকে সাধারণ মানুষ, আমরা সেইদিকে থেকে লড়ছি; যেসব ছোট আর বড়

জিনিষগুলো দিয়ে মহত্তর, পূর্ণতর, শান্তিভরা জীবন গড়ে ওঠে- আমরা তারই জন্যে লড়ছি। তোমাদের

জুলি

৮ই মার্চ, ১৯৫৩

শুভ জন্মদিনের মা-মণি, আমার আদরের এথেল,

তুমি যেদিন প্রথম মা হয়েছিলে, আমি হয়েছিলাম বাবা—এবারে ১০ই মার্চ তার বয়েস দশ বছর হবে। আমাদের ছোট্ট সংসারটার জন্যে গর্ব হয়, এথেল প্রিয়তমা—সমস্ত বাধা ঠেলে ঠেলে ঠিকভাবেই আমাদের ছেলেরা বড় হচ্ছে। আবার আমি তোমাকে জানাতে চাই, প্রিয়তমা—আমার শরীরের প্রত্যেকটি তন্তুতে তন্তুতে জড়ানো তোমার প্রতি আমার ভালবাসা। যে নিদারুণ অবস্থার মধ্যে আমবা আছি, তাতে আমি সুখী নই। কিন্তু আমি খুশী এই জন্যে যে, আমরা ন্যায়ের রাস্তা থেকে একচুলও সরিনি; আমরা যে নির্দোষ, সে কথা প্রমাণ করাবার জন্যে আমরা অবিচল ভাবে লড়েছি। তোমার প্রতি আমার যে টান, তা গভীর। আমাকে তোলপাড় করে। তোমাকে ছেড়ে থাকাই আমার আত্মদান। আমি বসে ব'সে শুধু ভাবব: তোমার আর আমার কথা, আমাদের ভালবাসার কথা; যে জীবন আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে কাটিয়েছি, সেই জীবনের কথা; আদর্শের প্রতি আমাদের অকম্পিত নিষ্ঠার কথা। সুখের দিন কোলে করে সমানে অপেক্ষা করছে যে ভবিষ্যৎ, আমি তার কথা ভাবব। আর যখনই তা ভাবি, তখনই কি আশ্চর্য—বিদ্যুৎবেগে আমার মধ্যে সঞ্চালিত হয় শক্তি আর আত্মবিশ্বাস।

আজ এই শুভদিনে সত্যি ভাল লাগে যখন দেখি ছেলেরা সুন্দর-ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যখন মনে পড়ে যায় সেই সব বন্ধুদের কথা যারা তাদের স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করছে। ভাল লাগে

যখন মনে পড়ে সেই সব মানুষদের কথা যারা আমাদের সমর্থন করছে, আমাদের ধরে যারা এমন কি টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে। যতই হোক সব চেয়ে বড় কথা হল এই—ন্যায়ের জন্যে মানবিক মর্যাদার জন্যে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির জন্যে, গণতন্ত্র আর শান্তির জন্যে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এমন কি সাক্ষাৎ এই নরকে বসেও আমরা প্রগতির রথের রশিতে দুজোড়া হাতে টান লাগাতে পারি। আমাদের যে দশাতেই থাকি, সামনে যত বাধাই থাক—আমাদের হাতে হাত লাগবে, সকলের মঙ্গলের জন্যে কাঁধে চাড় দিয়ে উঠে দাঁড়াবে যথাযুক্ত সত্য আর ন্যায়।

এক সংকট সঙ্কুল যুগে আমরা বাস করছি। নিজেদের ওপর, সাধারণ মানুষের ওপর সমস্ত সময় আমাদের আস্থা যেন থাকে। মাথার মধ্যে গোটা ছবিটা পরিষ্কার ভাবে রাখতে হবে; তাহলেই সুস্পষ্টভাবে আমরা পথ পেয়ে যাবো। লক্ষ্য করে দেখো, আমাদের শত্রুপক্ষ যখনই একটা বড় রকমের রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তারা তখনই তার সঙ্গে আমাদের মামলাটাকে জুড়ে দেয়। তাদের এই চালবাজি লোকের চোখে সোজাসুজি তুলে ধরতে হবে। একেকটি দিন যায় আর আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারে ওরা রোজ নতুন নতুন মোচড় দেয়। প্রত্যেকটা সম্বন্ধে লিখতে গেলে রোজ একটা করে মহাভারত লিখতে হয়। যখনই কোন নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তোমার সঙ্গে তা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি এবং যখন কোন কারণে ম্যানিকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না, তখন সাক্ষাতে সে সম্বন্ধে বলার জন্যে খাতায় টুকে রাখি।

জন্মদিনে আমি ছেলেদের একটা চিঠি পাঠিয়েছি। ওদের ভালই লাগবে বলে মনে হয়। আমার আবেগ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে ওদের কাছে চিঠি লেখা আমার পক্ষে খুব শক্ত হয়ে পড়ে। তখন কলম থামিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ মনে মনে ভাবি যেন আমরা সবাই বাড়ীতে আছি। ছেলেরা মেঝের ওপর খেলনা নিয়ে বসে খেলছে।

আমরা পাশাপাশি চেয়ারে বসে পারিবারিক আবহাওয়ার স্নিগ্ধতাটুক উপভোগ করছি। আর মাঝে মাঝে চুম্বন করছি। প্রিয়তমা, আমাদের এ স্বপ্ন আমরা সফল করে তুলব। আমাদেরই পক্ষে ন্যায়, দুর্জয় আমাদের মনোবল আর তাছাড়া সুবিচার ও সুখ পাবার এ ছাড়া তো পথ নেই।

বধূ আমার, তোমাকে আর ছেলে দুটোকে দেখার জন্যে আমি পাগল। আবার কবে দেখা হবে। আমার মন কিছুতেই মানছে না। যতক্ষণ জেগে থাকি, তোমার আর ছেলেদের ভাবনা একটি মুহূর্তের জন্যও আমাকে ছেড়ে যায় না। মধুময়ী রমণী আমার, শুভরাত্রি—চিরদিন তোমাতেই নিবেদিত।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ১২ই মার্চ, ১৯৫৩

মাইকেল এবং আমার বোন যে চিঠি দিয়েছে, দুটো চিঠিতেই আগের চেয়ে আরও বেশী আত্মনির্ভরতার সুর। সংশয় কাটিয়ে উঠে বিশ্বাসে ভর করে মানুষ যখন ভাল কাজে নিজেকে লাগায়—উৎসাহে, উদ্দীপনায়, সাহসে সে যে কিভাবে গন্‌গন্‌ করে জ্বলে উঠতে পারে, দেখলে অবাক লাগে। চার পাশের জগৎটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসা, যা করতে চাই তা কেন করতে চাই জানা—এইভাবে জেনে বুঝে যে কাজগুলো করা যায়, তার ফল সত্যিই খুব ভাল না হয়ে পারে না। প্রথমত আমাকে বলতেই হবে—সারা বিশ্বের সহৃদয় মানুষেরা আমাদের কাছে, আমাদের পরিবারের কাছে উৎকণ্ঠার সঙ্গে যে কুশল প্রশ্ন পাঠিয়েছেন—তা পেয়ে আমরা ধন্য। এটা খুব বড় কথা জগৎ জুড়ে বিরাট সংখ্যক মানুষ জানে শান্তি এবং স্বাধীনতাই সকলের বড় লক্ষ্য ; পৃথিবীর সামনে আজ যে মহা সমস্যা, তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য প্রত্যেকটি ব্যাপার সম্পর্কেই তারা সজাগ। আর এই ব্যাপারগুলোর

মধ্যে একটি ব্যাপার হল আমাদের মামলা! নিজেদের রক্ষার জন্যে লড়াই করে এই ভালো কাজ আমরা সমানে চালিয়ে যাবো এর বেশী আমরা চাই না।

গত এই ক'সপ্তাহ ধরে আমি লেখার ভাগ কমিয়ে দিয়েছি। এতদিন যা পড়েছি সেইগুলোই পরিপাক করছি। তাহলেও চারদিকে যে বিপজ্জনক অবস্থা ঘনিয়ে উঠছে, সে সম্বন্ধে না লিখে পারছি না। বলতে গেলে সমস্ত কাগজগুলোই হর হর বোম্ বোম্ করে লেগে গিয়েছে। চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর এবং উল্টোপাল্টা খবরের বান ডাকানো তো আছেই, তাতে আরও চেকনাই হয়ে খুলেছে সোজাসুজি রণং-দেহি বিবৃতি, সম্পাদকীয়, বাঁধা নিবন্ধ। পাঠকদের ওপর এর যে ফল খারাপ হবে, তা বোঝাই যায়। দুনিয়ায় কি ঘটে যাচ্ছে, তাদের কি হাল হতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা করতে গেলে আগে তাদের দরকার মোটামুটি কিছু সত্যিকার খবর জানা—কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, দেশের লোকের পক্ষে সত্যিকারের খবর পাওয়া ততই দুষ্কর হয়ে পড়ছে। প্রগতিশীলদের মধ্যে, জননেতাদের মধ্যে, অকপট নরনারীদের মধ্যে যারা ভয়ডরহীন—তাদের কর্তব্যকাজ একদিকে যেমন ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তেমনি সে কাজ এখুনি হাতে নেবার প্রয়োজনও বেড়ে যাচ্ছে।

প্রিয়তমা, ইস, আমার হাত দুটো নিস্‌পিস্ করছে। যদি উপায় থাকত, তাহলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষকে আমি দাঁড় করাতাম। তাকে সব বলতাম। কেননা, আমি তো জানি তার এবং আমার দুজনেরই স্বার্থে আমরা খুব সহজেই মিলতে পারি।

এতে কোন ভুল নেই যে, আমি এতদিন যা পড়ে এসেছি যা শুনে এসেছি সবই সুন্দর সুন্দর কথার ধুচুনি, নীতির বচন আওড়ানো লম্বাচওড়া বাহারে বক্তিমে। ভেতরে কিচ্ছু নেই, সব ফাঁকা বুলি। মিথ্যের ঔরসে তাদের জন্ম। শান্তি এবং 'স্বাধীন' দুনিয়ার ভেক ধরে তারা রাস্তা ভুলিয়ে নিয়ে যায় প্রতিক্রিয়া, রসাতল আর মৃত্যুর দিকে।

'প্রলয়ের অবতার'দের ঠিকমত চিনতে হলে আলাদা প্রত্যেকটা ঘটনা এবং তার স্পষ্ট অসঙ্গতিগুলো মনে রাখলেই শুধু চলে। কেন সন্দেহ নেই যে, জনসাধারণ বুক দিয়ে শান্তি আগলে রাখবে এবং আমি এও বিশ্বাস করি যে, তারা আমাদের বাঁচাবার কাজে সাহায্য করবে।

প্রিয়তমা আমার, ১৫ই মার্চ, ১৯৫৩

যখন তোমাকে অগ্নিপরীক্ষার* ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল বুঝতে পারো তখন আমার কি মনের অবস্থা। তবে যতটা যা শুনলাম ভাল-ভাবেই তুমি উৎরোতে পেরেছো। আমাদের যাদের বিবেক আছে, আমাদের অনিন্দ্যসুন্দর অনুভূতি আছে—সেই আমাদেরই কিনা নিজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আজ যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। এখন খুব জরুরী এক লড়াই চলেছে ; তার পুরোভাগে আমরা। আমাদের ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে এর ওর কাছ থেকে যত বড় চাপই আসুক না কেন সাহসে সোজা হয়ে শক্ত পায়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকব নিজের মধ্যে —এই বিশ্বাস পাই। যারা ভাল মানুষ, তারা ভাবতে পারে না আমাদের কল্‌জেগুলো কি রকম বুনো বর্বরের মত মেরে মেরে থেঁতো করা হচ্ছে। এইসব ধরণধারণ দেখে সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত মন অবাধ্য হয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। যাদের চোখ আছে তাদের কাছে যেন এই রাজনৈতিক শিক্ষাটুকু স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ঘৃণার ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে দল বেঁধে বাধা দিলে তবেই শান্তি আর স্বাধীনতা বাঁচবে।

ওগো প্রিয়তমা, আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, আমি যে কত চাই তোমাকে নিয়ে থাকতে। ভাবো একবার ওদের সে সাহসই হল না আমার সামনে আসে। তোমার পরিবারের লোকগুলো

* এথেলের মার দেখা করতে আসা

আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি। বোধহয় গোয়েন্দা বিভাগ কিম্বা জেলার সরকারী উকিলের কাছ থেকে আরও নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমার কাছে নোংরা প্রস্তাব রাখার ঝুঁকিটা এখুনি চট্ করে ওরা নিতে চাইছে না। এখনও বিস্তারিত ভাবে সব না জানলেও তুমি যে বীরোচিত ব্যবহার দেখিয়েছো, তার জন্যে তোমাকে সাবাস্ দিই।

চারিদিকে উত্তেজনা বাড়ছে। দুনিয়ার হালচাল ঘোরালো হয়ে উঠছে। তবু জানো, প্রিয়তমা এখনও আমি দিব্যি নির্বিকার। আমি শান্ত, আমি নির্ভয় কেননা আমি জানি আমরাই ঠিক। আর জানি এই লড়াইয়ের একটি ক্ষেত্রে আমাদের যা করবার আমরা করছি। আমাকে যা একটু মুস্কিলে ফেলে তোমার জন্যে এবং ছেলেদের জন্যে আমার নিয়ত দুর্ভাবনা। আমার ধারণা এমন হবারই কথা। ছেলেদের সঙ্গে আবার কবে আমরা দেখা করব এখনও আমরা ঠিক করিনি; তবে আমার মনে হয় আমাদের দরখাস্তটা ম্যানি আগে পেশ করুক, তারপর ওদের এখানে আনতে বলাটাই যুক্তিযুক্ত হবে। এবিষয়ে ভেবেচিন্তে এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করো যাতে সুপ্রীম কোর্ট থেকে খবর আসবার আগেই ওদের সঙ্গে আমাদের দেখাটা হয়ে যায়। এথেল, প্রিয়তমা বধূ আমার, তোমার আসন স্থাপিত আমার হৃদয়ে। সমস্ত সময় তুমি আমার হৃদয়ে আছো।

তোমার অনুরক্ত—জুলি

প্রিয়তমা আমার, ১৯শে মার্চ, ১৯৫৩

কোন এক যুবকের ভাল-লাগা ভালবাসায় পরিণত হতে দুটো দিন—এখনও দুটো দিন বাকি। যার যখন পালা সে যেন ঠিক তখনই আসছে। সূর্য-ওঠা ফুটফুটে দিনগুলোর হাত ধরে মধুমাস ঐ আসে।

ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হবে ফুর্তিতে নেচে উঠবে হৃদয় আর যৌবনের নেশা-ধরানো আবেগ নতুন নতুন জয়ের পথে ঠেলে দেবে। কেননা আসলে তো সমস্ত অগ্রগতির মধ্যে থাকে তারুণ্যেরই তাড়না। আমাদের মামলার আসল চেহারা সারা দুনিয়ার মানুষ চিনে ফেলেছে। আর পৃথিবীতে যারা সব চেয়ে ক্ষমতাবান, সেই সাধারণ মানুষ আমাদের পেছনে ; তারা দেখিয়ে দিচ্ছে তারা সজাগ, তারা জানে শান্তির জন্যে স্বাধীনতার জন্যে কেমন করে লড়তে হয়। বিচার নিয়ে এই ছেলেখেলা শুধু যে সাধারণ মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে তাই নয়, প্রগতিশীল মতের জন্যে আমাদের মামলার দুজন নিরীহ মানুষকে নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমাদের সরকারের পর্দাফাঁই করে দিয়েছে। জনসাধারণ পুরো অর্থ টের পেতে শুরু করেছে। এইসব দেখে মনে আমি বেজায় বল পাচ্ছি ; আর তার সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে আমার গভীর ভালবাসা—কিন্তু প্রকাশ করতে পথ না পেয়ে সে কেঁদে মরছে। আমরা যে ন্যায়ধর্মের পতাকা শক্ত হাতে উঁচু করে রাখতে পেরেছি, আমরা যে ভালো কাজে নিজেদের লাগাতে পেরেছি, তার জন্যে সত্যিই আমরা সুখী। তবু যতদিন না আমরা আমাদের সন্তানদের কাছে নিজের সংসারে ফিরে যাই—আমাদের এ দেহে শান্তি নেই।

আমি ভাবছিলাম, প্রিয়তমা—আজ তিন বছর হতে চলল আমরা ছেলেদের ছেড়ে। যখন একসঙ্গে থাকতাম প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের কাছে কী মূল্যবানই না ছিল। ওরা যখন নতুন কিছু শিখত, আমাদের কি আনন্দ। হয়ত ছেলেদের মধ্যে কেউ একটা নতুন ছবি এঁকেছে, কাঠের টুকরো দিয়ে বানিয়েছে খেলাঘর, কেউ হয়ত এমন কিছু করেছে যার বিশেষ তাৎপর্য আছে ; বেড়ে ওঠার লক্ষণ, সঙ্গীতে কিম্বা শিল্পে ক্ষমতার নিদর্শন আর আনন্দ উদ্বেগ আর ব্যথায় জড়ানো সাতপাঁচ সমস্যা। এই ছিল আমাদের আটপৌরে সুখের সংসার। তাহলে রবীর বয়েস হতে চলল ছয়, মাইকের তো দশ চলছে।

ওরা এবং আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার হারিয়েছি। আমরা যে স্থির বিশ্বাসে লিখে যাই, আমরা যে শক্ত হয়ে থাকি তার কারণ, বেদনার গভীর ক্ষতচিহ্নে আমাদের শরীরে দেগে দেওয়া হয়েছে দুরপনেয় সত্য। যখন আমি দেখি মাইকেলের অতল নীল চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে আমাদের প্রতি ওর অকুণ্ঠ সমর্থন, যখন রবীর মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সহানভূতির স্মিত হাসি তখন বুঝি কিসের জোরে এই নিদারুণ জ্বালা আমরা সহ্য করে চলেছি। আমার মনে হয় আসলে আমার ভেতরটা তুলতুলে নরম ; নইলে যখন ছেলেদের কথা ভাবি তোমার কথা ভাবি মনটা কেন কোমল হয়ে পড়ে কাউকে আমি জানতে দিই না। কিন্তু আমার হৃদয়টা চীৎকার করে কাঁদে।

জানো, আমি আজকাল একধার থেকে পড়ছি। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে, পদার্থের রীতিনীতি সম্পর্কে, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে, রাজনীতি আর বিজ্ঞান সম্পর্কে যত বই আছে পড়েছি। মানুষ প্রকৃতিকে নাড়াচাড়া করে বহু আকাঙ্খিত এক সুন্দর পৃথিবা গড়ে তুলতে পারে এ কথা আমি যত জানি ততই বুঝতে পারি সে আকাঙ্খাকে রূপ দেবার জন্যে কাজ করা কত জরুরী। ছেলেদের যদি সত্য ভালবাসতে চাই তো তার এই একটি পথই আছে। স্বৈরাচারী শাসনে এ ওর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যখন আমরা দুজন দুপাশে আড়াআড়ি হয়ে বসি আমার চোখের তারা আমার কণ্ঠস্বর, আমার প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা তোমাকে জানিয়ে দেয় তোমার প্রতি আমার মনপ্রাণ-ঢেলে-দেওয়া একাগ্র নিষ্ঠা, গভীর শ্রদ্ধা আর সেই সঙ্গে কথা দেয় আমি চিরদিন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। দিন তাহলে আসছে। বসন্তের এক ঝলক ফুরফুরে হাওয়া। বদ্ধ পাঁপড়িগুলো খুলে যাবে আর তাই সারা বছরটাই হবে যৌবনের ঋতুরঙ্গ। দিন আসছে। তোমাকে ভালবাসি। আমরা জয়ী হবো।

তোমার প্রেমে পড়া সেই যুবক—জুলি

মণি আমার, ২২শে মার্চ, ১৯৫৩

সেই উদাস দৃষ্টিতে আমি ঘুর ঘুর করে ঘুরছি। তুমি ঠিক ধরেছিলে। বসন্তের হাওয়া-লাগা জ্বর। যেমন হয়ে থাকে। হঠাৎ একটা পুরোনো জিনিস নতুন করে টেনে এনে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এত ফলাও করে ছাপল কেন এবারকার 'ন্যাশানাল গার্ডিয়ান' পড়ে বুঝলাম ব্যাপারটা। গ্রীণগ্লাস জোর দিয়ে বলছে! মিথ্যে বলেনি সে! লক্ষ্য করো এখন ওরা এই দুর্বল যুক্তিতে এসে ঠেকেছে যে—গ্রীণগ্লাস যখন বলছে, তখন সত্য না হয়ে যায় না।

প্রিয়তমা, সাধারণ মানুষ এই মামলার বিচার সম্বন্ধে আজ প্রশ্ন করছে, বেশ রূঢ় ভাবেই প্রশ্ন করছে। মামলাটার বিচার দোষদুষ্ট একথা তাদের মনে হবার পেছনে যুক্তি আছে। যে চোরাগোপ্তা যুদ্ধের আবহাওয়ায় আমরা বাস করছি, তাতে ভোজসভা ডেকে আশ্চর্য ফল হয়েছে বলতে হবে। আমাদের পক্ষ সমর্থন করে যারা কাজ করছে তাদের এ থেকে বোঝা উচিত, সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে এই মামলার পেছনে মানুষজনকে টেনে আনা দরকার।

আরও একটি আশার ব্যাপার হল 'ন্যাশানাল গার্ডিয়ান' পত্রিকার নতুন বর্ধিত কলেবর নিউ ইয়র্ক সংখ্যা। সংবাদপত্রে খবর চেপে যাওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন যে দানা বাঁধছে, এ থেকে তা প্রমাণ হয়। আজ যখন প্রগতিশীল মানুষের দল মার্কিন ফ্যাশিজম-এর ফয়রার ম্যাকার্থির নীতির বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেছে, তখন এই কাজ খুবই সময়োচিত হয়েছে! এখন যেটা শুধু দরকার বলে মনে হয় বিভিন্ন ঘটনাগুলো একটু খুলে পরিষ্কার করে বলা। তাহলে দেশের লোক আমাদের সরকারের নিজের দেশে ও পরের দেশে লোকঠকানো কম্মগুলো ধরে ফেলবে।

চিঠির শুরুতে যে কথাটা বলেছিলাম। যারা বাড়ীতে থাকে ঈষ্টার-এর সময়টা তাদের ভারি বিচিত্র বলে মনে হয়। দু একটা নতুন জামা-কাপড়, কিছু সুন্দর ফুল, স্নিগ্ধ আবহাওয়া আর কেমন একটা ছুটি-ছুটি

ভাব আকাশ বাতাস ছেয়ে থাকে! ভালবাসা, সবাই কাছাকাছি হওয়া আর জীবনে সুন্দর আনন্দের একটু করে অনুভূতি পাওয়া। আমি বরাবরই এই সময়টাতে মানুষের হৃদয়বত্তার কাছে, মহৎ ন্যায়ধর্মের কাছে, সব কিছুর মধ্যেকার গভীরতর অর্থের কাছে নতুন করে নিজেকে উৎসর্গ করতাম। যা সুন্দর, যা কল্যাণকর তার জন্যে এখান থেকেও নিজেদের জাগিয়ে তুলতে হবে আকণ্ঠ পিপাসা। পরম তৃপ্তির সঙ্গে যখনই আমি কাগজে দুনিয়ার কোন ভাল খবর পড়েছি, আমি বুঁদ হয়েছি। তুলনায় বলছি। কেননা তোমাকে ছেড়ে, ছেলেদের ছেড়ে, আমাদের জানা পৃথিবীতে এগিয়ে যেতে চায় যে যুধ্যমান জীবন সেই জীবনকে ছেড়ে ভিত্তিভূমিতে আমি একা।

তোমার মুখের স্মিত হাসি এথেল, তোমার উষ্ণ চুম্বন, তোমার মধুর কণ্ঠস্বর আর তোমার সমঝদার মন—আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমার আনন্দ।

আমার হৃদয় তুমি নাও, প্রিয়তমা। তোমার—

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ২৭শে মার্চ, ১৯৫৩

ইস্পাত আর কংক্রিটে গাঁথা সরু এইটুকু কবরে, সিং সিং-এর এই কশাইখানায় এসেছে একটি কার্ড—দূর বেলজিয়াম থেকে পাঠানো প্রীতির স্বাক্ষর নতুন এক ঝলক বসন্তের হাওয়া। এই বিশেষ কার্ডটা কে পাঠিয়েছেন আমি জানি না। তবে ম্যানি আমাকে জানিয়েছে বেলজিয়াম আর ফ্রান্স থেকে যে হাজার হাজার কার্ড এসেছে, এটি তার একটি। এই চিঠি চেতনার কাছ থেকে আসছে, কেননা তারা আমাদের ভালবাসে।

কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, স্পষ্ট করে বলা। তবু অতটুকুর মধ্যে সব কিছু সাপ্টে বলে দিয়েছে। সংক্ষেপে বলা ছাড়াও তাতে আঁকা আছে একটি ছবি—এক গুচ্ছ ফুল (পৃথিবীরই সৃষ্টি); সৌন্দর্য, অন্ন আর

জীবনের দিকে প্রসারিত হাত। আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে এই ছবি ; কারণ এখানে মূর্ত হয়ে চোখের কাছে ধরা দিয়েছে বিশ্বের বিবেক ; ধরা দিয়েছে কল্যাণের জন্যে, প্রাচুর্যের জন্যে মানুষের অবিরাম লড়াই। সেই সঙ্গের এও তারা জানে সেই কল্যাণ, সেই প্রাচুর্য শুধু শান্তি আর স্বাধীনতার মধ্যেই আসতে পারে।

প্রিয়তমা, এসো আমরা মাথায় করে রাখি এই সম্মান। যে আশ্চর্য হৃদয় এর উৎস, আমাকে তা উৎসাহ দিচ্ছে ঠেলে সামনে এগিয়ে যাবার। যে দুঃশাসনের দল আমাদের ধ্বংস করবার জন্যে হাত তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া জুড়ে আমরা আমাদের সমস্ত ভাইরা এক। সেই দৃঢ়বদ্ধ সংহতি আমাকে শক্তি দিচ্ছে। যারা অত্যাচারী, জনসাধারণের ওপর তাদের কোন আস্থা নেই ; তাই তারা ইতিহাসের গোড়াকার এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটুকুও ধরতে পারে না—ইতিহাসের গোড়ার কথাই হল জনসাধারণের শক্তি।

ম্যাকার্থির দেখাদেখি ইদানীং একদল ভুঁইফোঁড় খোকা ভগবানের উদয় হয়েছে। মার্কিন জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা নিজেরা একেকজন সর্বশক্তিমান দিকপাল সেজে বসে গেছেন। তাঁরাই বলে দেবেন আমরা বাকী মনুষ্যরা কি করব না করব, কি পড়ব না পড়ব, কি বলব না বলব, কিসে বিশ্বাস করব না করব। অতি-দেশভক্তির মুখোস পরে তাঁরা তাঁদের লোক-ঠকানো বড় বিদ্যে লুকোতে চান। আর সেই সঙ্গে তাঁরা দিনকে রাত করেন, রাতকে দিন। দেখ্-না-দেখ্ নালিশ ঠোকেন। পাছে যুক্তি আর সত্য এসে তাঁদের ফন্দিবাজি ধরিয়ে দেয়, তাই সে পথ মেরে রাখার জন্যে তাঁরা গা ছম্ ছম্ করা আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের নীচ প্রবৃত্তিগুলোকে খাইয়ে খাইয়ে মোটা করেন।

আমাদের বাপঠাকুর্দারা দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙেছিলেন। দেহে শক্তি থাকতে থাকতে এই সব শয়তান লোকগুলোর হাত চেপে ধরতে হবে। যাতে পুরোপুরি পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারে তার জন্যে মানুষের মনগুলোকে আগে ওরা পিছমোড়া করে বাঁধতে চাইছে।

তাই পদে পদে ওদের বাধা দিতে হবে। যারা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত, তারা আমাদের দেশের এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে নিজেদের বলে যথার্থই দাবি করতে পারে। তাতে তারা সত্যিই প্রেরণা পাবে—নিয়ত প্রেরণা পেয়েছি যেমন আমি।

সত্যি, তোমাকে কতদিন দেখিনি। যেন কত যুগ। কেননা বই, খবরের কাগজ, সুপ্রীম কোর্টের মন্তব্য, আইন সংক্রান্ত নথিপত্র—আমি পড়ার মধ্যে মগ্ন ছিলাম। চারজন নিগ্রোর বিরুদ্ধে রুজু করা মামলার (ড্যানিয়েলদের মামলা) রায় নথিপত্র পড়লাম! উত্তর ক্যারোলিনায় ওরা মরতে চলেছে। প্রিয়তমা, কাজির বিচার একেই বলে। আমেরিকার ঘুম কবে ভাঙবে? কবে বন্ধ হবে জানোয়ারদের মত জাতকে জাত এই হত্যা। এবার তারা আরেক কাঠি ওপরে উঠে ঠিক নাৎসীদের মত রাজনৈতিক খুন খারাপী শুরু করেছে, দাবানলের মত হু হু করে ছড়িয়ে দিচ্ছে বন্য বর্বরতা! ভালবাসা জেনো।

জুলি

প্রিয়তমা, ৯ই এপ্রিল, ১৯৫৩

সেদিন আইনঘটিত ব্যাপারে আমরা যে সলাপরামর্শ করেছিলাম, তাতে এত কাজের কাজ হয়েছে যে আমি এখন গায়ে ফুঁ লাগিয়ে বেড়াচ্ছি। সুপ্রীম কোর্টের কাছে পাঠানো ক্রোড়পত্র সমেত আমাদের দরখাস্তটা গত কয়েকদিন আমি সমানে পড়লাম! আমাদের তরফে বিভিন্ন বিষয় একসঙ্গে জুড়ে ম্যানি যে কি আশ্চর্য কাজ করেছে সময় করে পড়ে দেখো—দারুণ ভালো লাগবে। আমাদের অসামান্য এই উকিলটিকে তার আইনী শিল্পকর্মটি সম্বন্ধে আমার মতামত ছোট একটা চিঠিতে লিখে জানিয়েছি। আমার বিদ্যেয় যতটা কুলোয়, ওকে ওর চমৎকার কাজটার জন্যে উচিত মত তারিফ জানাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। প্রিয়তমা, লেখাটা হয়েছে অপূর্ব—আমাদের পক্ষ থেকে

এত ভাল আপীল, আর কারো হাত দিয়ে বেরোতে পারত না। যেসব ঘটনা রাখা হয়েছে তা একেবারে অকাট্য এবং আইনে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন আছে। আদালত যদি আইনের রাস্তায় চলে এবং শুধু গুণাগুণ দেখে মামলাটার বিচার করে তাহলে আমাদের প্রার্থনা নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে বাইরের চাপে বিচারের সিদ্ধান্তটা এদিক-ওদিক হবে। সে যাই হোক আমি বেজায় খুশী আমাদের পক্ষ থেকে পেশ হওয়া আইনের কাগজগুলোর জন্যে।

বিশ্বাস করো, রোজ রাতে যখন আমি শুতে যাই আমাদের সোনা-মানিকদের সুন্দর রঙীন ছবিটা দেখি, "ঈ পিকোল রোজেনবার্গস্"।* এত ভাল লাগে। শিষ্টশান্ত মানুষদের এই ভাবভালবাসা, এই সঙ্গীসাথিত্ব ; সাদামাটা মানুষদের এই দুখদরদী হৃদয় ; তামাম মানুষের এই ভাই ভাই একঠাঁই ভাব। জীবন এরই মূল্যে মূল্যবান, পৃথিবী এরই কল্যাণে সুন্দর। এরা যখন আমাদের দুটি শিশুসন্তানকে ছবিতে দেখে, এদের মনের মধ্যে কি হয় আমি বুঝি। কেননা আমি যখন অন্য নিরীহ হতভাগ্যদের শিশু সন্তানদের দেখি—সে শিশু নিগ্রোরই হোক আর কোরিয়ারই হোক—আমি তো জানি আমার বুকটার মধ্যে কি রকম করে। আমি শিশুদের ভালবাসি। আমি চাই তারা বেড়ে ওঠবার মুখে সুযোগ সুবিধের সমস্ত পথগুলো যেন খোলা পায়, জীবনে যেন তাদের বেঁচে থাকা সার্থক হয়। এই তীব্র অনুভূতিগুলো আমার মধ্যে নিশ্চয়ই আবার সেই মিলিত জীবনে ফিরে যাবার দুর্নিবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। সে কথা থাক। আমরা মানুষের মন এমনভাবে ছুঁতে পেরেছি যে, তারা এই ছবিগুলো ছাপায়। ফরাসী দেশের মেয়েরা তাই অমন করে তোমাকে চিঠি লেখে। সামনে যম-যন্ত্রণা মেলে ধরে অপেক্ষা করছে দিন। আমাদের বাজিয়ে নেবে। তাহলে এসো—আরও দ্বিগুণ শক্তিতে, আরও দ্বিগুণ সাহসে আমরা

*রোম থেকে প্রকাশিত একটি ইতালীয় কাগজের মলাটে মাইকেল ও রবীর রঙীন ছবি ছাপা হয়েছিল, সেই ছবিটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেই কঠিন দিনগুলির চোখে চোখ রেখে এসো দাঁড়াই। প্রিয়তমা মানসী অচঞ্চল বধূ আমার—আমরা একমন, আমরা একপ্রাণ। বুক দিয়ে আমরা রক্ষা করছি আমাদের আদর্শ, আমাদের পবিত্র সম্মান। মামলার ফলাফল যাই হোক—আমরা রেখে যেতে পারি, আমরা রেখে যাবো মাইকেল আর রবার্টের জন্যে সেই উত্তরাধিকার। প্রিয়তমা, সারাক্ষণ তুমি আছো আমার ভাবনায়।

তোমার বিশ্বস্ত পুরুষ—জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৩

আসছে কাল মে-ডে। মজুরের চিরাচরিত উৎসবের দিন। আমেরিকার মাটিতে যে বিরাট সংগ্রাম হাত মুচড়ে শেষ পর্যন্ত আট ঘণ্টা খাটনির দিন ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল, সূচনায় এই দিনটি ছিল তারই প্রতীক। পৃথিবীর দেশে দেশে যারা শান্তির মধ্যে সমৃদ্ধতর বহু বাঞ্ছিত জীবনের আশায় লড়ছে, তাদের কাছে এ যুগে এই দিনটি এক মহৎ অর্থ নিয়ে ধরা দেয়। আমরা বরাবর এই দিনটিকে নিজেদের কাছে একটি বিশেষ দিন বলে গণ্য করে এসেছি। তাই আজ এই দিনটিতে আমি তোমাকে ঐকান্তিক অভিনন্দন ও গভীর ভালবাসা জানাই। আমি জানি আমরা একা নই। কেননা আমাদের মত সমস্ত মানুষই চায় শান্তি। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কথা ভাবছে, আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্যে তারা সমানে কাজ করে চলেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমেরিকার জনসাধারণ এখন ম্যাকার্থিবাদের পোশাকে নয়া-ক্যানিশজ্‌মের আসল চেহারা দিন দিন পরিষ্কারভাবে চিনে ফেলছে। যদি আমরা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যেকে কাঁধ লাগাই, শান্তি আর প্রগতির জন্যে প্রত্যেকে হাত লাগাই, একমাত্র তাহলেই আমাদের স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র টিকবে।

প্রিয়তমা, এর ওপর আবার বসন্তের দিনকাল এসে তোমার

জন্যে আরও আমার মন কেমন করিয়ে দিচ্ছে। তোমাকে কাছে না পেয়ে আমি যাকে বলে ব্যাথায় কাৎরাচ্ছি। প্রেয়সী, আমি তোমার পাশে একটু বসব; আঙুল দিয়ে চুলগুলো একটু নাড়িয়ে দেব, আমার হাতের মধ্যে তোমার হাতদুটো নিয়ে আমি তোমার চোখের গভীরে তাকাব। আমরা একমন, আমরা একপ্রাণ; আলগোছে আদরে আমরা মুখরিত করে তুলব আমাদের যত কিছু বিভাব—কথার দরকারই হবে না। দুজনের মাঝখানে শুধু লোহার জাল যদি না থাকে, শুধু যদি না থাকে লোহার গরাদ আর মাথার ওপর উদ্যত আসন্ন নিষ্ঠুর মৃত্যু—তাহলে দুজনের শুধু কাছাকাছি হওয়াটাই আমাদের চরম সুখের হবে। পুরোপুরি সুখী হবার জন্যে আমরা এমন কিছু আকাশের চাঁদ চেয়ে বসিনি। যাদেরই হৃদয় বলে কিছু আছে, তারাই বুঝবে দুজন দুজনের কাছাকাছি হওয়ার চেয়ে আমাদের সন্তানদের কাছে পাওয়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই থাকতে পারে না।

পরের মে-ডেতে দুজনে একসঙ্গে আমরা বাড়ি থাকব।

জুলি

প্রিয়তমা আমার, ৭ই মে, ১৯৫৩

মায়েদের দিন ১০ই মে। এখান থেকে কিই বা পাঠাবো। তাই দিনটাকে স্মরণ করে তোমাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছি। ১০ই মে সত্যিই একটা মস্তবড় দিন। যা কিছু মহিমান্বিত, যা কিছু শুভ, যা কিছু সৃষ্টির সুরে বাঁধা—সবই প্রকাশ পায় মা-হওয়ার মধ্যে। আমার দুটি সুন্দর সন্তানের জননী তুমি, তোমার মধ্যে আমি খুঁজে পাই জীবনের সুরভিত মাধুর্য। তোমাতে পাই এক ফলেফুলেভরা চরিতার্থ ভবিষ্যতের অঙ্গীকার। শরীর আর মনের প্রত্যেকটা বন্ধন মানুষকে বেঁধে রেখেছে তা খুলে ফেলা, সকলের ভালোর জন্যে পরিবারেরও

ভালোর জন্যে কার্য-কারণ আর মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের সর্বোচ্চ জ্ঞান হাতের মুঠোয় এনে কাজে লাগানো—মানুষের সমস্ত চেষ্টার মুখ এই দিকে। কোন একজন মানুষের মধ্যে যতখানি সম্ভাবনা, প্রতিভা যতখানি থাকে—এটা ঠিক যে তাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে হলে দরকার দরকার স্বাধীনতার। কিন্তু তবু হাজার কষ্টের মধ্যেও, চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও—মা হয়ে মেয়েরা নিজেদের তৈরী করেছে, যাতে সমাজকে তারা বহুতর দানে সমৃদ্ধ করতে পারে। একাধারে মায়ের সমস্ত গুণ আর খাঁটি মানুষের সমস্ত মহত্ব যার মধ্যে মিলেছে—সোজা কথা হল এই আমার সহধর্মিণী, তুমিই হলে তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তোমাকে আমি হাড়হদ্দ জানি, মানুষটি তুমি কেমন আমি চোখের ওপর দেখেছি। আমি বলছি আমি গর্বিত—তোমার মত একজন অসামান্য বধূ, সন্তানের জননীকে পাশে নিয়ে যে বছরগুলো কাটিয়েছি, আমি তার জন্যে গর্ববোধ করি। যাদের আঁকার হাত আছে তোমাকে তারা তা এঁকে দেখিয়ে দিতে পারে। যারা পদ্য লেখে বর্ণে বর্ণে মিল দিয়ে তারা তোমাকে তা লিখে দিতে পারে। গলায় যাদের সুর খেলে তারা তোমাকে স্বকর্ণে শুনিয়ে দিতে পারে। আমার কথা যদি বলো, এ আমি অনুভব করি আমার মর্মে মর্মে, আমার হৃদয়ে, আমার মনে। আর এই হল পৃথিবীতে হীরের টুকরো, সত্যিকারের এই মানুষ। মায়ের পদাধিকারে অর্জিত সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলেই তো তোমার এত দুঃখ বেদনা। সুতরাং এ আমি জানি না তা নয়।

এতদিনে আমাদের শত্রুদের টনক নিশ্চয় নড়েছে ; তারা নিশ্চয় টের পাচ্ছে এ বড় শক্ত পাল্লায় তারা পড়েছে। ওদের এই হালটার কথা মানুষ যত বেশী জানতে পারবে, ততই তারা এইসব নররাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার চাপ ভেতর থেকে অনুভব করবে। তারা দেখে নিতে চাইবে কোন সাহসে লোকগুলো এই রকম জানোয়ারের মত কাজ করে। এই অসভ্য দণ্ড যতক্ষণ না বাতিল হয়ে যাচ্ছে

যতক্ষণ না বিচারের নামে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হচ্ছে—ততদিন দুনিয়ার ক্ষুব্ধ বিবেক শান্ত হবে না। যাদেরই মধ্যে এতটুকু সততা আছে, এতটুকু বুদ্ধিবিবেক আছে—তারা দাবি করছে যেন আমাদের গলার ওপর থেকে অত্যাচারীর দল হাত সরিয়ে নেয়।

আমি সেই অসংখ্য সাধারণ মানুষদেরই একজন। আমি তোমার সব চেয়ে কাছের লোক, এই সাজানো মামলার নির্দোষ দুজন আসামীর একজন। তাই আমি তোমার যন্ত্রণা গভীরভাবে অনুভব করতে পারি আর তোমার যন্ত্রণা দেখে নিজের হাত কামড়ে ধরে চীৎকার করে উঠি। যেন কোথায় কেমন করে দুজনে একসঙ্গে হয়ে দুজনের মধ্যে খুঁজে পাই সেই শক্তি, যার জোরে আমরা সহ্য করি এই হাড়গুঁড়ো-করা বিচারের ঝক্‌মারি। আমাদের লড়াই ন্যায়ের জন্যে। উৎসাহ-উদ্দীপনা, যে আশাভরসা নিয়ে আমরা লড়ছি—তার অফুরন্ত উৎস হল জগৎ সংসার জোড়া সাদা মনের সাধারণ মানুষ। আমাদের বিশ্বাস আর বাসনা আমাদের মনগুলোকে উঁচু পর্দায় বেঁধে রাখে। আমরা অভ্রান্তভাবে জানি, চূড়ান্ত জয় আমাদেরই ভাগ্যে নাচছে। তাহলে এসো—তুমি আমার মধ্যে থাকলেও, এসো তোমাকে বাহুতে বাঁধি, আমি যে তোমাকে ভালবাসতে চাই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে।

মনে আর প্রাণে, প্রেমে আর সত্যে যতদিন আমরা দুজনে দুজনকে বেঁধে রাখব—মিথ্যে আসুক, দুঃখ আসুক, মৃত্যুও আসুক না। কে ভয় করে?

তোমার চিরবিশ্বস্ত—

জুলি

প্রিয়তমা এথেল আমার, ১০ই মে, ১৯৫৩

মায়েদের দিনটা আজ সত্যি ভারি সুন্দর ছিল। হাতে একসঙ্গে অনেকটা সময় নিয়ে আমি তোমার কথা ভেবেছি। কিছুই এমন নয়;

জীবনটা কিভাবে দুজনে মিলে কাটিয়েছি। আমাদের আছে দুটি মিষ্টি ছোট্ট ছেলে, কিভাবে আমরা লড়ে চলেছি···এই সব আর কি। যা হামেশাই ভেবে থাকি। বাঁচবার অদম্য বাসনা। তাকে উস্কে উস্কে দেয় সসাগরা এই পৃথিবীর যাবতী. সৌন্দর্য। সত্য আর ন্যায়ের নিখাদ মূল্যে মূল্যবান হয়ে বাঁচব। এই দুর্নিবার মনোরথ আমাকে স্ফূর্তিতে উড়িয়ে নিয়ে চলে। বসন্ত। নতুন আশার ঋতু। আর এই মধুমাস আমার মুখ ঘুরিয়ে দেয় তোমার দিকে। আমার সমস্ত ভাবনা জুড়ে বসে তার প্রতি ভালবাসা—সেই যে আমার মানস-সুন্দরী। জমিয়ে বসে আরাম করে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা—তা সে যতই হোক, আমার এই নাছোড়বান্দা হৃদয়টার প্রবল তাগিদগুলো কিছুতেই শান্ত করতে পারে না। কাজেই আমাকে অন্য রাস্তা দেখতে হয়। বই পড়ি, লিখি। তবু কিছুতেই হবার নয়। আমি জ্বলতে পুড়তে থাকি। আর তখনই, এমনি ভাবে অনুভব করবার ভেতর দিয়ে আমি বুঝি কত গভীর তোমার বেদনা। আর প্রিয়তমা আমার, তখনই আমার হৃদয়ের সমস্ত আর্দ্রতা তরঙ্গ তুলে তোমার দিকে ছুটে যায়।

খুবই আস্তে, থেমে থেমে, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে—জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে ঘটনার অমোঘ গতি কোরিয়া মাথায় গাঁট্টা মেরে উদ্যত বন্দুকের নলগুলো নামিয়ে দিচ্ছে। যদি না অদৃষ্টপূর্ব কোন ঘোর বাতুলতা মানুষের আকাঙ্খাকে এলোমেলো করে দেয়—তাহলে আসছে গ্রীষ্মেই পৃথিবীতে শান্তি।

আমার মনের মধ্যে আমি মায়েদের এই দিনটি বরাবরকার মতই পালন করেছি। অতীতে এই দিনগুলোতে আমরা একসঙ্গে মিলে আনন্দ করতাম। আমি আশা করি, আসছে বছর মায়েদের এই দিনটিতে আমরা বাড়ীতে ছেলেদের কাছে থাকব। যা করলে ভাল হয়, তেমনি করে আমরা সবাই সকলের সুখে সুখী হবো।

বুকভরা আমার ভালবাসা।

জুলি

প্রিয়তমা এথেল, ১৪ই মে, ১৯৫৩

সাবাস্ মা-মণি। আমাদের ছোট খোকাটার বয়স আজ ছ বছর পূর্ণ হল। এই তো সেদিনকার কথা—কতটুকু ছিল। আর আজ? বই বগলে করে ইস্কুলে যাচ্ছে, কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং করে হলেও লিখছে তো, আর পাঁচটা ছেলের মতই এটা সেটা করছে। ছেলে বড় হচ্ছে। আমাদের নামে ওরা মিথ্যে মামলা দায়ের করেছে তো বটেই। শুধু কি তাই? আমাদের কোলের ছেলেটাকে শৈশব থেকে বঞ্চিত করেছে, বঞ্চিত করেছে ফুটন্ত কৈশোর থেকে। তাকে কান্নায় একটু সান্ত্বনা পেতে দেয়নি, বাপের একটু আদরও নয়। ডাইনীর দল আমাদের কচি ছেলেদের হাড় সশব্দে চিবিয়ে খাচ্ছে—এই জন্যেই আমাদের বিরুদ্ধে যে মামলা সাজানো হয়েছে, তা এত নৃশংস। যখন চোখের পর্দা বলে আর কিছু থাকে না, মনটা পাথর হয়ে যায় তখন আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা এই নরাধমদের কাছ থেকে সমস্ত সভ্য মানুষদেরই ভয় পাবার অনেক কিছু থাকে। দেখে মনে হচ্ছে খাস আমেরিকার মানুষরা তাদের শান্তির ঐকান্তিক আগ্রহ দিয়ে সরকারকে যতটা সমঝে দেওয়া উচিত ততটা পারছে না। তা নাহলে সরকার যে তার বর্তমান নীতির ওপর ভর করে আরও বেশী বেশী এবং আরও বড় বড় যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—এর আর কিই বা মানে থাকতে পারে? গোড়ায় যা আমরা আঁচ করেছিলাম সেটাই খেটে যাচ্ছে। আমরা তখনই বলেছিলামঃ যারা আমাদের দেশের হর্তাকর্তা, তারা মতলব করে ফ্যাশিষ্ট কায়দায় মারদাঙ্গা বাধাবার জন্যে যে গুচ্ছের চেষ্টা করছে, আমাদের মামলাটা সেই চেষ্টারই একটি ফল। আমাদের দেশটাকে মোড় ঘুরিয়ে শান্তির রাস্তায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হিম্মৎ যদি কারো থেকে থাকে, তো আছে সাধারণ মানুষের গর্জে-ওঠা গণতরঙ্গের—এ আজ দিনের মত পরিষ্কার।

এই দেখ, আবার কথায় কথায় কোথায় চলে এলাম। এই জাতীয় আলোচনায় ভিড়ে পড়তে আজ আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। আমি

শুধু বলতে চেয়েছিলাম আমাদের ছেলে দুটির কথা। বলতে চেয়েছিলাম কি অর্থ ওদের জন্মদিনের। আমরা জয় করে আনি মুক্তি—এইটাই আজ ওরা সব চেয়ে বেশী করে চায়।

আমি আমার ছেলেদের জন্যে ভয়ানক গর্বিত—এ তোমার অজানা নয়। সেই সঙ্গে আমি বলছি, বিশ্বাস করো আজ ওদের আমি যতখানি ভালবাসি এর আগে কোনদিনই এতটা ভালবাসিনি। সংসারের মায়ার বন্ধন আর মাইকেলের প্রতি আমার, রবীর প্রতি আমার পিতৃহৃদয়ের বাৎসল্য আমাকে সব থেকে বড় প্রেরণা দেয়, বলে—আমাদের নাম রেখো। আমাদের ছোট্ট এই একরত্তি সংসারটার প্রত্যেককে আমি কি গভীরভাবে স্নেহ করি, কি নিবিড়ভাবে ভালবাসি তা তুমি জানো। যে শক্তি জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে যথার্থভাবে জানাতে গিয়ে আমাকে রাস্তা-বরাবর আলো ধরেছে আমার গভীর স্নেহ, আমার নিবিড় ভালবাসা।

সেই যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হল। তারপর বিকেল বেলায় আমার জন্মদিনে কি দেওয়া যায় কি দেওয়া যায়—তো ওরা আমাকে জেলের ভেতর দিয়ে গাড়িতে করে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনল। যেতে যেতে কি ভাল যে লাগছিল। ঝলমল করছে সবুজ ঘাস, সার সার দো-পাটি ফুল,—বসন্তের একেবারে সমস্ত লক্ষণ। উঃ কি চওড়া নদী যে! ধূ-ধূ করছে যতদূর দেখা যায়। তারপর ওরা সব মাটি করে দিল কশের একটা দাঁত ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে উপ্‌ড়ে টেনে তুলে। কি বেরসিক বলো তো! এমন একটা জন্মদিন দাঁত তুলে নষ্ট কেউ করে! ঘোর অবিচার! ঘোর অবিচার!

জন্মদিনে আমি পেয়েছি সুন্দর বাছাই-করা অনেক সব কার্ড। তার প্রত্যেকটিতে ফুটে উঠেছে যথার্থ হৃদয়ের পরিচয়। আমি আ আত্মীয় চিরদিন একান্ত তোমারই—

জুলি

মিসেস্ ভ্যান্ হ্যারেন সমীপেষু: ১৮ই মে, ১৯৫৩

কোথায় সিং-সিং আর কোথায় হল্যাণ্ড! মাঝখানে মাইলের পর

মাইলের, সমুদ্রের পর সমুদ্রের, জাতির পর জাতির এক বিরাট সমষ্টিগত ব্যবধান; নির্দয় শ্রম আর খাটুনির কষ্ট, রক্তপাত আর বন্ধনের আধখানা পৃথিবী আমাদের আড়াল করে! এমন দূরত্ব কি আছে, যা মানুষের হৃদয় অতিক্রম করতে পারে না! অস্ত্রে অস্ত্রে কিচ্‌-কিচ্‌ করা এমন কোন যুদ্ধ আছে, যেখানে নতুন জীবনের ট্যাঁ-ট্যাঁ করা ধ্বনি হৃদয়ের নতুন সাহস, বুকে নতুন বল দেবে না!

এথেল জুলিয়ার মা গো! তুমি আমাদের কত আদরের। তোমার সারা মুখে ফোটা স্নিগ্ধ কোমলতায় আর দৃপ্ত মহিমায় তোমায় কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! খাঁটি নারীর দৃঢ়বদ্ধ শক্তিতে কোলে তোমার ছোট্ট খুকুমণিকে তুমি ধরে আছো বাহুর বেষ্টনে। তুমি হলে বিশ্ব সংসারের মা-টি। পৃথিবীর এই উর্বরা মাটির মতই তুমি সরল, তুমি সর্বংসহা, করুণাঘন তৃপ্তির লাবণ্যটুকু বাদ দিলে তুমি নিরাভরণ, তুমি স্থৈর্যবতী, তুমি অপরাজিতা, তুমি সুফলা।

দয়াময়ী মুক্ত হস্ত বোন আমার! যার নাম রেখেছ ভালবেসে, আমার বড় দুঃসময়ের সেই কন্যাকে আমি গর্ভে না ধরলেও, আমাকে তুমি দেবে তোমার মাতৃত্বের অংশভাক্‌ হতে? দেবে?—তাহলে আয় চলে, গান গা নির্ভয়ে—এথেল জুলিয়ারে! কি খুশি হয়ে তোকে (মাইকেল আর রবার্ট) দাদারা দ্যাখ্‌ ডাকে। গান গা নির্ভয়ে, এথেল জুলিয়া!—গান গাও রে, ওলন্দাজের মেয়ে নাহুস্‌ নুহুস্‌! আট্‌লান্টিক পেরিয়ে জাগুক ঘুমে বেহুঁশ মানুষ!—বোন আমার, মাথায়-খুন-চাপা সমুদ্র আজ ভয়ঙ্কর মারমূর্তি হয়ে আছড়ে পড়ছে। কোন উপকূলই আর বাদ রইল না যে!

এথেল রোজেনবার্গ

রোটারডামের এক মহিলা এথেল ও জুলিয়াসকে সম্মান জানিয়ে তাঁর মেয়ের নাম রেখেছিলেন এথেল জুলিয়া। খবরটা জানতে পেরে এথেল তাঁকেই চিঠিটি লিখেছিলেন। এই চিঠির জবাব এসে পৌছোয় এথেল ও জুলিয়াসের মৃত্যুর পর। চিঠির জবাবটি নীচে দেওয়া হ'ল:

বীরাঙ্গনা এথেল, বীর জুলিয়াস,

আমরা আপনাদের সিং-সিং থেকে লেখা চিঠি পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই। চিঠি পেয়ে আমরা গর্ব বোধ করছি। খুকু ভাল আছে। আমরা আশা করি আপনাদের যে নাম ওকে আমরা দিয়েছি আমাদের মেয়ে বড় হয়ে সে নামের উপযুক্ত হবে। আপনাদের নামে আমরা ওর নাম রেখেছি, কারণ আমরা জানি যে জন্যে আপনাদের প্রাণদণ্ড হচ্ছে, সে দোষে আপনারা দোষী নন। আর আমাদের খুকু এথেল জুলিয়ার কথা যে লিখেছেন, সে আপনাদের মেয়ে হতে পারবে কিনা, আপনাদের ছেলে দুটির বোন হতে পারবে কিনা। নিশ্চয় পারবে। আমরা সগর্বে তা স্বীকার করছি।

প্রিয় এথেল, প্রিয় জুলিয়াস, আমাদের বাপ-মার বেলায় ঠিক যেমন করতাম, তেমনি করে আপনাদের মুক্তির জন্যে লড়াই করব। সাহস ও বিশ্বাস বজায় রাখুন। আমাদের এথেল বড় হয়ে জানবে আপনারা কি কষ্ট পাচ্ছেন, আমাদের জন্যে কত দুঃখ ভোগ আপনারা করেছেন। এথেল ও জুলিয়াস, চিরদিন সত্যের জয় হবে। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে, আপনাদের ছোট্ট মেয়ে এথেল জুলিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের থাকল অজস্র অভিনন্দন।

মিসেস্ ভ্যান হ্যারেন

প্রিয়তমা এথেল, ২১শে মে, ১৯৫৩

ঠিক এই সময়টাতে আমার বেজায় আল্‌সেমি লাগছে। মনটা কেমন যেন উড়ু উড়ু হয়ে পড়েছে। কারণ একসঙ্গে দুটো বলে মনে হচ্ছে: সুন্দর বিলম্বিত বসন্তের দিন আর তা ছাড়া প্রেয়সীকে কাছে পাবার অনেক দিনের বাসনা তো আছেই। তোমাকে যে আমি গভীরভাবে চাই, আমাকে তা সমস্ত সময় মনে করিয়ে দেয় এই বিরামহীন বাসনার প্রবল শক্তি। দুজনে আবার এক হবার নতুন

নতুন চেষ্টার দিকে আমাকে সামনে ঠেলে দেয়। সমস্তই কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে। সবই ঝাপসা। যেন আমরা অনেক, অনেক দূরে—কোন জায়গায় ঝুলে আছি। সব দেখতে পাচ্ছি, সব কিছু চোখের সামনেই হচ্ছে। কিন্তু করবার কোন ক্ষমতা নেই আমাদের অথচ যত বাদানুবাদ কিন্তু আমাদেরই নিয়ে।

স্বাধীনভাবে এবং যুক্তির সাহায্যে বিচার করে দেখতে পারে যে মন—তাকে পিছমোড়া করে বাঁধবার জন্যে অন্তর্টিপুনির আক্রমণ পুরোদমে চলেছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন এক দঙ্গল লোকের মাথায় খুন চাপিয়ে, তাই দিয়ে ব্যক্তিকে তারা ভয় দেখিয়ে জল উঁচু নীচু বলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমেরিকার মানুষদের ওপর এটাই হল সব চেয়ে জবর আঘাত। যার এতটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান আছে নিজেকে যে ছোট করতে চায় না, যে চায় বুক ফুলিয়ে বেঁচে থাকতে—তেমন কোন লোক এই অবস্থার মধ্যে কিছুতেই বাড়বাড়ন্ত হয়ে বাঁচতে পারে না। ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই স্বৈরাচারী অরাজকতার শুধু একটিই উত্তর আছে—স্বাধীনতার রক্ষার জন্যে গণতন্ত্র বাঁচাবার জন্যে, শান্তি বজায় রাখার জন্যে এখুনি এই মুহূর্তে সংগ্রামে নেমে পড়তে হবে।

প্রিয়তমা, তাহলে দেখ—যখন উচিত নীতির জন্যে, আমাদের মর্যাদার পবিত্রতা রক্ষার জন্যে আমরা লড়ছি তখন এ লড়াই আর শুধু আমাদের বাঁচবার লড়াই হয়েই থাকছে না ; সভ্যতা আজও পর্যন্ত মানুষকে যত কিছু গুণে ভূষিত করেছে, সেই গুণগ্রাম হাতে কেউ মুছে দিতে না পারে আমাদের সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াচ্ছে তারই জন্যে।

চিরদিন আমি তোমারই অনুরাগী—

জুলি

এথেল, প্রিয়া আমার, ২৪শে মে, ১৯৫৩

তুমি নিশ্চয় কাগজে সব দেখছ। আমাদের বিরুদ্ধে বাক্যশর নিক্ষেপের লড়াইতে একদম হালে ওরা যে মোচড়টা দিয়েছে নিশ্চয় তা দেখেছ। এই সূত্রে মনে রাখতে হবে—খুবই সম্প্রতি মাত্র এই দিন কতক আগে যেসব ছাঁকা সাক্ষ্যপ্রমাণ হাত্ড়ে বার করা গেছে, তাতে লোকগুলো এখন ভারি প্যাঁচে পড়েছে। এই সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো সোজাসুজি মুখের ওপর বলে দিচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে বিচারটা হয়েছে জঘন্য প্রকৃতির। অথচ 'স্বাধীন' কাগজগুলোতে সে সম্বন্ধে একটি কথা পর্যন্ত লেখা হচ্ছে না। চোখ-খুলে-দেওয়া এমন একটা জরুরী খবর যে আছে, জনসাধারণকে তার বিন্দুবিসর্গও জানতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ এই মামলা সম্পর্কে সত্যিকার খবর জানবার সম্পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। এই সত্যগুলো ধামাচাপা দিয়ে রাখার জন্যে বিচার বিভাগ অন্তর্টিপুনির সেই একই কৌশল কাজে লাগাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মগজগুলোকে ধোলাই দিয়ে এই মামলায় তারা ঠিক খবরের কাগজগুলোর ঢঙেই চলেছে।

বিচার বিভাগের 'কর্তৃস্থানীয় মহল' থেকে খবর তৈরী করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে ; ফরিয়াদী পক্ষের দিকে যাদের একটু কানের টান আছে সেই সব প্রচার যন্ত্র মারফৎ ব্যাপকভাবে সেই খবর বিলিয়ে লোকের কান ভারী করা হচ্ছে। বিচার বিভাগের দিক থেকে এটা একটা সাংঘাতিক অপরাধ। অপরাধ শুধু এই কারণে নয় যে এইভাবে এক তরফা খবর পেশ করাটা দেখায়ও খারাপ এবং গুরুতর অন্যায়ও বটে। আসলে সমস্ত খবরগুলোই হয় অর্ধসত্য নয় পুরোপুরি অসত্য—এই কারণেই এটা একটা সাংঘাতিক অপরাধ।

একেবারে তথ্যপ্রমাণ সুদ্ধ যে অভিযোগগুলো আমরা তাদের সামনে হাজির করেছি। তার ধার দিয়েও না গিয়ে এবং কোন রকম প্রমাণের বালাই না রেখে নিজেদের সুবিধেমত খবর তৈরী করে তারা বাজারে প্রচার করছে। কর্তাব্যক্তিরা যে 'চূড়ান্ত নিন্দনীয় আচরণ'

দেখিয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে মার্কিণ ন্যায়বিচার এবং দেশের সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা সপাটে ভেঙে পড়ার গুরুতর বিপদ খুব সামনে। যতই হোক, আমার ভরসা আছে—এই বিকট রকমের জাল মামলাকে ঠেকো দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে যত কারসাজিই ওরা করুক না কেন, ওদের সব চাল বানচাল হয়ে যাবে। কেননা আমরা হলাম একেবারে নির্দোষ এবং ওদের সমস্ত কিছুই একটা প্রকাণ্ড মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই মামলার ভেতরকার আসল ব্যাপারগুলো টেনে বার করতে, বিচারের নামে এই ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করতে আমাদের আরেকটু সময় লাগবে—মানুষের মত মানুষ নারী ও পুরুষ যেখানে যে আছে তারা নিশ্চয়ই চেষ্টা করে আমাদের নেই সময়টুকু দেবে। তাছাড়া, মামলায় নিজের বাণে ওরা নিজেরাই মরবে। একবার যদি ব্যাপারগুলো সাধারণ মানুষের কাছে খোলসা হয়ে যায়, তাহলে তারা চোখের সামনে দেখতে পাবে শান্তি আর স্বাধীনতা সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন। আর তখনই তারা বীর বিক্রমে কাজে লেগে যাবে। স্বাধীনতা এবং শান্তিকে রক্ষা করবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রতিপক্ষ যে এমন মরীয়া হয়ে একটার পর একটা দাঁত বার করে চলেছে, তার কারণ আর কিছুই নয়—আসলে ওদের বড়ই দুশ্চিন্তা এবং ওরা নিজেদের বড় কাহিল বোধ করছে। ওদের ঘুম নষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে আসল কথাটা এই বুঝি বেরিয়ে পড়ে, হাত সাফাইটা এই বুঝি ধরা পড়ে যায় —তাহলে দুনিয়ার লোক তা দেখতে পাবে। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর একটার পর একটা চোট এসে লাগছে ; সেই সূত্র ধরেই দলনিরপেক্ষ পত্রিকা 'ন্যাশনাল গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদক সেড্রিক বেলফ্রেজকে নির্বাসন দেবার চেষ্টা চলছে এবং ম্যাক্‌কারান আইনের পাকে ফেলে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ শান্তিবাদীকে জেলে পুরবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ঘটনাগুলো যেভাবে গড়াচ্ছে, তাতে ফ্যাশিজ্‌মের স্পষ্ট লক্ষণ ফুটে বার হচ্ছে! একবার

মনটাকে শক্ত শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারলে, ব্যস—বিবেক-বৃত্তির আর নড়াচড়া করবারও ক্ষমতা থাকবে না। আমেরিকার মানুষ এ জিনিষ এখানে কিছুতেই ঘটতে দেবে না—এ বিশ্বাস আমি রাখি।

যতটা যা মনে হল, বিচার দপ্তরের কোন একটি লোক বিচারকের কাছে পেশ করা আমাদের অভ্রান্ত-প্রমাণ-দেওয়া দরখাস্তটা সম্বন্ধে সব খবরই রাখে। যাই হোক ব্যাপারটা ঠিক কিনা সোমবার দিনই আমরা জানতে পারব। এ সপ্তাহের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তোমার কবিতা পড়ে খুব খুশী হলাম। দারুণ ঝাঁঝালো কবিতা হয়েছে। কমিটি থেকে যেমন কাগজপত্র ছেপে বার হয়েছে, সেগুলো পাঠাবার কথা বলে বলে আমি হদ্দ হয়ে গিয়েছি। তোমার মিষ্টি কথায় হয়ত কাজ হতে পারে ; যাতে কাগজপত্রগুলো পাঠায়, ম্যানিকে বলবে তুমি একটু ?

ও' মিষ্টি—এই বেচারার বুক তোমার জন্যে ফেটে যাচ্ছে। বড্ড মন কেমন করে যে। আমার হৃদয় ও মনের সমস্ত ভালবাসা তোমাকে দিলাম।

চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান

প্রিয় ম্যানি, ২৭শে মে, ১৯৫৩

এই সঙ্গে জুলির লেখা একটা চিঠিও পাঠালাম। দেখ তো পেলে কিনা। আদালতে আমাদের দরখাস্ত নাকচ হয়ে যাবার ঠিক আগের দিন চিঠিটা জুলি আমাকে লিখেছিল। যে সব ঘটনার শেষ পরিণতি হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট বশ্যতা স্বীকার করল, সেই ঘটনাগুলো জুলির চিঠিতে এমন স্পষ্টভাবে খুঁটিয়ে তুলে তুলে ধরা হয়েছে যে, পড়লে অবাক লাগে। ওর লেখা এই রকম আরও আছে। সবুর করো, আগে এই একটা চিঠিই তাড়াতাড়ি সেন্সার হয়ে ভালোয় ভালোয় তোমার কাছে পৌঁছোক। অন্য চিঠিগুলো তো তার পরের কথা।

জিতা রহো ম্যাকার্থি! কাণ্ড দেখ! ভাবো একবার। দুটো কাঠগোঁয়ার বেহায়া নাস্তিক কিনা আমাদের খোদ দাদার পাতা ফাঁদটা উল্টে দিতে চায়। সাহস বলিহারি। তাও কিসের জন্যে? না, যাতে দুটো ছোটলোক দস্তুর মত লাল গাড়ী পাশ হতে না হয়। ঠাট্টা নয়, বিচারটা অবিকল এই ধাঁচেরই হয়েছে। লজ্জার মাথা একেবারে খেয়ে বগল বাজিয়ে, নাক সিঁটকে, রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্যে এই বিচার। কিন্তু তার জন্যে হাল ছাড়বার কি কারণ থাকতে পারে? অনেক সময় এমন হয়—বাইরেটা চিকণ-চাকণ, ভেতরটা ফাঁপা ওদের এই বুক বাজানো, ওদের এই পাঁয়তারা দেখানো থেকে যেন মনে করা না হয় ওরা জিতে গেছে। বরং, একদম উল্টো; আমাদের মনগুলোকে নিছক দমিয়ে দেবার জন্যে আক্রমণকারীর দল এই যে সব মারপ্যাঁচগুলো চালাচ্ছে, সেগুলো যদি ঠিকঠাক বুঝে নেওয়া যায় তাহলেই আর ওরা আত্মরক্ষাকারীদের ঠুঁটো করে দিতে কিংবা অকেজো করে বসিয়ে দিতে পারবে না।

পদে পদে মৃত্যুকে পরাভূত করে বাঁচব। তারই জন্যে এই বেদম লড়াই। সেই যে বিখ্যাত একটা কথা আছে না: ভয়কে ছাড়া আর কিছুতেই ভয় নেই। বাখ্‌দের বলো এই সত্যি কথাটা ওদের বুঝতে হবে। তবেই ওরা নিজেদের এবং আমাদের বুক-বাঁধা সাহস দিয়ে আমাদের দুই খোকার মনে তার রেশ টানতে পারবে। আমরা সব সময় নিজেদের সামলে রাখি যাতে ছেলেদের সামনে আমাদের আবেগগুলো না প্রকাশ হয়ে পড়ে। বাপ মা হয়েও যখন আমরা পারি ওদেরও পারতে হবে। ছেলেদের কাছে ওরা হবে আমাদেরই। শক্তি, আমাদেরই ভালবাসা নিজেদের মধ্যে ওদের ফুটিয়ে তুলতে হবে। কাজটা শক্ত, কিন্তু না করলেই নয়। এই ভার কাঁধে নিয়ে উঁচু করে ওরা সহ্যাদ্রির মত যখন দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন নিষ্পাপ দুটি ছেলেকে নিষ্ঠুর হাতে জাহান্নমে পাঠাবার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও অত্যাচারীর আক্রোশ সেই শক্ত পাহাড়ের গায়ে বৃথাই মাথা ঠুকে মরবে।....

শুধু দেখো, আমার ছেলেদের একটু শান্তি দিও; আমার হাত দুটো বাঁধা। ওরা যে দারুণ আঘাত পাবে।

আমার সমস্ত ভালবাসা থাকল। আমার অবিচলিত নিষ্ঠা থাকল।

এথেল

এথেল, প্রিয়তমা, ৩১শে মে, ১৯৫৩

যখন কারো অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, আর আঠারো দিনের মধ্যে, বিয়ের ঠিক চোদ্দ বছর পর নিজেদের ঠিক বিয়েরই তিথিতে— হুকুম হয়েছে মরতে হবে। তখন? প্রিয়তমার কাছে কি কথা সে তখন লেখে? আমাদের অগ্নি পরীক্ষার সব চেয়ে কঠিন সময় সামনে। মুখের কাছে খাঁড়া তুলে নাচছে ভয়ঙ্কর বিপদ। এ সময় আমাদের খুব শক্ত থাকতে হবে। কোন রকম চেঁচানো-চিক্‌রোনো নয়, কোনো

রকম ঝুটো বীররস নয়। শুধু মাথা ঠাণ্ডা রেখে, শুধু শান্ত থেকে একটি একটি করে হাতে তুলে নেওয়া, নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খেই খুঁজে বার করা সব চেয়ে জটিল সমস্যাগুলোর।

আমাদের মামলার ব্যাপারে সরকার এমন কেন করল—প্রিয়তমা আমি নিজেকে যতটা সম্ভব সরিয়ে রেখে বার বার প্রশ্নটার চুল-চেরা বিচার করে দেখেছি। যত রকমে যতবার দেখেছি একই উত্তর মিলেছে—নারাজ লোকদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবার ব্যাপারে এই মামলাটা যাতে কাজে আসে, তারই জন্যে একদল ক্ষ্যাপা লোকের পাল্লায় পড়ে তাদের কথা শুনে চলা হচ্ছে। যাই হোক, আমি এখনও বিশ্বাস করি—সরকারের একটু বড় রকমের ঝক্কিগুলো যাদের ঘাড়ে আছে, অন্তত তারা মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রেখে বিচার করবে এবং আমাদের একদম জানে মারবে না। আমার মনে হচ্ছে, ঠিক এই সময়টাতে এখনও ঠেলা সামলাবার ঝুঁকি রয়ে গেছে। কাজেই আমাদের দেখতে হবে যাতে আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি না থাকে।

আমেরিকার সরকার নিশ্চয়ই চায় না যে, আমাদের মামলাটার মত এমন একটা যাচ্ছেতাই লজ্জার ব্যাপার ইতিহাসের দুরপনেয় কালিতে লেখা হয়ে থাক—কেননা তা যদি হয়, তাহলে সাংঘাতিক অবিচারের জন্যে এবং দুটি নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে আমানুষিক দণ্ড দেবার জন্যে চিরকাল তাদের অপরাধী হয়ে থাকতে হবে। তার কারন বুকে হাত দিয়ে এবং আত্মসম্মান বজায় রেখে কখনও এই সহজ সত্যটুকুকে আমরা অস্বীকার করে উঠতে পারিনি যে, আমরা নিরপরাধ। যুক্তির দিক থেকে দেখলে যে কেউ একথা স্বীকার করবে—এমন ঘোরতর সন্দেহের ব্যাপার যখন থেকে যাচ্ছে, তখন যাতে আমরা দায়মুক্ত হবার এবং সত্যিকার ঘটনাগুলো সকলের সামনে তুলে ধরবার সুযোগ পাই, তার জন্যে আমাদের বাঁচতে দেওয়া হোক। খুব দেরী হয়ে গেছে। তবু এখনও আমার বিশ্বাস হয়, আমাদের দেশের

অন্তঃকরণওয়ালা মানুষেরা তাদের ইচ্ছেটা যে কি তা এমনভাবে ওয়াশিংটনের কর্তাদের টের পাইয়ে দেবে যাতে মৃত্যুদণ্ডটা বন্ধ থাকে।

প্রিয়তমা, আমি জানি ঠিক এসময় আমাদের ছেলেরা, আমাদের বাড়ির লোকেরা দারুণ কষ্ট পাচ্ছে। ওদের মুখের দিকে তাকানোর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবু, আমি মনে করি এখন আমাদের সমস্ত শক্তি নিজেদের দিকে ঢেলে দিতে হবে। প্রথমত, আমাদের যা দিয়ে বুঝে নিতে হবে সত্যিই আমাদের বুকের ওপর একদম জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে কিনা এবং তারপর আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে কিভাবে পাথর সরাবার কাজে আমরা নিজেরাও খানিকটা হাত লাগাতে পারি। আমি যেভাবে সমস্যাটাকে দেখেছি তাতে আমার মতে ছেলেদের পক্ষে সব চেয়ে উপকার হয় যদি আমরা এই রাস্তাতেই চলি।

প্রিয়তমা, রবিবারের 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার একটা চমৎকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছে জুন মাসের সার কথা নিয়ে। আমাদের চারপাশে ঝলমলিয়ে-ওঠা শ্যামলবরণ সৌন্দর্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তাতে। এই মাসটা তো আমাদের। কেননা এই মাসেই আমি আর তুমি স্বামী-স্ত্রী হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলেছিলাম। আর আমরা পেলাম দিনে দিনে বেড়ে ওঠা এক অনিন্দ্যসুন্দর সম্পর্কের অপার আনন্দ। সোনা আমার, অন্তিমকালেও আমি তোমার প্রতি একাগ্র। আমার সমস্ত ভালবাসা সে তো তোমারই।

জুলি

এথেল প্রিয়তমা, ৪ঠা জুন, ১৯৫৩

আমি তো বলি, যে বিবৃতিটা আমরা আমাদের উকিলের জবানিতে কাগজে দিয়েছি, তা চমৎকার হয়েছে। আমি তো খুব খুশী। আমার বুক ফুলে ওঠে যখন ভাবি, বিবৃতির বেশীর ভাগ কথা এবং ভাবই তোমার মাথা থেকে এসেছে বলতেই হবে আর এর মধ্যে আমাদের দুজনকার মিলিত কৃতিত্ব। যে সব মুস্কিলের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে তা আর কারো পক্ষে ঠিকমত বুঝে ওঠা শক্ত। কত এদিক ওদিক ভেবে সামনে পেছনে তাকিয়ে আমাদের চিন্তাগুলোকে এমনভাবে দাঁড় করাতে হয়েছে, যাতে চিঠিটায় শুধু যা লেখা আছে তাই নয়, যা আমরা জনসমক্ষে বলতে চেয়েছি সেটাও প্রত্যেকে পুরোপুরি আঁচ করতে পারে।

যাক, শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমরা ফাঁড়া কেটে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু তার চেয়েও জরুরী হল, আমেরিকার মানুষদের উচিত আমাদের মামলার ব্যাপারে খাঁটি সত্যটা সবিশেষ জানা। আর সেই সঙ্গে এও জানা যে, বিচার বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা এই মামলার ব্যাপারে কি রকম নির্ঘিন্নে ব্যবহার দেখিয়েছে। আমি খুব বেশী করে অনুভব করছি, দেশটাকে লাঠির আগায় শাসন করার জন্যে যেসব প্যাঁচ পয়জার চলছে, তার মুখোশগুলো টেনে খুলে ফেলে দেওয়া দরকার। এ যদি আমরা না করি তো পাপ হবে। ভাল কাজে লড়ছি বলেই আমাদের উৎসাহ ঠিক্‌রে পড়েছে। কিন্তু এও ঠিক যে, এদিকে প্রাণ নিয়েই এখন আমাদের টানাটানি। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়ছে। বাড়বে বৈকি। তা সত্ত্বেও আমি জানি, এই ঝড় ফুঁড়ে জয়ের মুকুট মাথায় দিয়ে আমরা ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে যাবো। কাজে কাজেই প্রিয়তমা, তোমার তারিফ না করে আর বার বার না বলে পারছি না: তুমি এক মহীয়সী নারী—সত্যিই তুমি তাই—তারও বেশী, তুমি মনমোহিনী। আর বলছি, কিছু মনে করো না—তোমাকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।

আমরা যা ভেবেছিলাম তাই। সরকার অমনি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সব অস্বীকার করেছে। বলেছে—কক্ষণো না, ওসব ছ্যাঁচড়ামো নাকি তারা করেই নি। দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। মফঃস্বলের এক ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সরকারী উকিলের গল্প। উকিলের নামে এই বলে নালিশ রুজু করা হয়েছিল যে, এক আসামীর সঙ্গে নাকি সে রফা করতে চেয়েছিল। কায়দাটা একদম এক। তা সেই উকিল তো তারপর আদালতে দাঁড়িয়ে উঠে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে প্রচণ্ডভাবে এক গলা ফাটানো লম্বা বক্তৃতা ঝেড়ে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সমস্ত অস্বীকার করে-টরে তারপর শুধু একদম শেষকালে যাবার আগে শুধু এই কথাটুকু জুড়ে দিল—যাক্ যা হবার হয়েছে; তা আসামী যদি রাজী হয়, এখনও রফা একটা হতে পারে বৈকি (হুবহু এই কথাই সে বলেছিল)। হ্যাঁ তবে এটা ঠিক—মিষ্টার বেনেট সলাকক্ষে যে একঘণ্টা আমাকে নিয়ে, যে আধঘণ্টা তোমাকে নিয়ে একা ছিলেন এবং যে আধ ঘণ্টা আমরা তিনজন এক সঙ্গে ছিলাম আমাদের মনগুলোকে তিনি সমানে যাঁতায় পিষেছেন। আমাদের দুজনের ঠিক কাউকেই লক্ষ্য করে যেন তিনি বলছেন না, আমরা তাঁর সামনে দুটো জলজ্যান্ত লোক যেন সত্যিই বসে নেই।—এমনি একটা ভাব নিয়ে তিনি বলেছিলেন নিতান্ত অ্যাটর্ণি জেনারেলের তাগিদেই তাঁকে আসতে হয়েছে এবং 'মিষ্টার ব্রাউনেলের খুব ইচ্ছে আমরা একথা জানি যে, যদি সরকারের সঙ্গে আমাদের কাঁধে কাঁধ দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে নাকি একটা কারণ তখন পাওয়া যাবে যার জোরে প্রাণভিক্ষার প্রার্থনাটা মঞ্জুর করবার জন্যে প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে সুপারিশ করা যেতে পারে।'

মিথ্যেকে ওরা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফুলিয়ে আর কতখানি বড় করে তুলবে? তঞ্চকতা আর জালজুয়াচুরিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আর কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে? আমাদের দেশের নাম যে ওরা ডুবিয়ে দিল। নিরীহ মানুষদের যে ওরা থেঁৎলে থেঁৎলে মারছে—এ চৈতন্যের উদয়

হতে ওদের আর কত দেরি ? সে কথাটাই আমি ভাবছি। ঘটনা-গুলো সব হুড়মুড় করে ঘটে যাচ্ছে। যাতে আমরা ভয়ের চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াতে পারি তার জন্যে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে শক্তি আর সাহস খুঁজব। প্রেমে আর আত্মশক্তিতে এক হয়ে আমরা মাথায় পরব জয়ের টোপর।

তোমার চিরদিনের বিশ্বস্ত—

জুলি

প্রিয় ম্যানি, ৫ই জুন, ১৯৫৩

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল যে বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মোলাকাত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করে জানাই এবং সমস্ত ঘটনাটার একটা পুরো বিবরণ লিখে ফেলি। কিন্তু পরদিন তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছ শুনে ঠিক করলাম মৌখিকভাবেই তোমাকে আগাগোড়া ঘটনাটার কথা বলা যাবে। কিন্তু কাগজে বিচার দপ্তরের যে বিবৃতি পড়লাম, তারপর আর দেখছি চুপ করে থাকা চলে না। মিষ্টার বেনেটের* জেলখানায় আসাটা নাকি নিতান্তই একটা বাঁধা-ধরা রুটিনের কাজে এবং তারা বলেছে টোপ ফেলা-টেলা ওসব কিছু হয়নি। এতবড় একটা মিথ্যে কথা বলতে ওদের জিভ খসে পড়েনি—কেমন আনায়াসে গড় গড় করে বলে গেছে। তাই গত মঙ্গলবার ঘটনাটা ঠিক যেমন যেমন ঘটেছিল, অবিকল সেইমত আমি তোমাকে লিখে পাঠাচ্ছি।

গোড়াতেই তোমাকে বলে রাখি, এথেল আর তোমার ওপর দিয়ে সেদিন দারুণ মানসিক যন্ত্রণার ঝড় গেছে। কিন্তু তার বদলে আমরা একটা বড় রকমের মাশুল আদায় করে ছেড়েছি—উৎপীড়নের ওপর দাঁড়ানো এই ঠ্যাঙাড়ে রাষ্ট্রকে আমরা কুৎসিত পশুত্বের নগ্ন মূর্তিতে—

*যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কারাধ্যক্ষ

আমরা তাকে তার আসল চেহারায় দেখেছি।

সোমবার ১লা জুন। যুক্তরাষ্ট্রের দুই সরকারী ব্যবস্থাপক মিষ্টার ক্যারল্ এবং মিষ্টার ফলি এসে হাতে হাতে আমাদের শমন জারী করে গেলেন। তাতে লেখা আছে দেখলাম: ১৮ই জুন রাত এগারোটা—যেদিন আমাদের বিয়ে চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবে, আমাদের ঠিক সেই বিয়ের তিথিটিতেই মৃত্যুর দিন পড়েছে। যে দিনটা আমাদের সব চেয়ে সুখের, আমাদের সেই বিয়ের তারিখটাতেই—আমি আমার বঁধু—দুজনে আমরা মৃত্যুর মধ্যে সাংঘাতিকভাবে মিলতে চলেছি। লোক দুটি কিন্তু ভারি সুন্দর। কি করবে বেচারারা—এটা ওদের কাজ; আর এই কাজটাই যে বিশ্রী। তাই তাড়াতাড়ি কাজের কথা সেরে যাবার আগে আমার ভেতরটা দেখে নেবার মত করেই জিজ্ঞেস করেছিল ওরা আমাদের কোন কাজে লাগতে পারে কিনা। আমি বলেছিলাম, নিশ্চয়; আমাদের জন্যে ভালো খবর এনো। লোক দুটো এসেছিল—কিন্তু এসেছিল নিতান্তই একটা বাঁধা-ধরা রুটিনের কাজে।

মঙ্গলবার সকাল এগারোটা। এথেলের সঙ্গে আমার কথা শেষ হতে আমাকে সলা-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। ঢুকে দেখি মিষ্টার বেনেট বসে আছেন। ঘরে শুধু আমি আর মিষ্টার বেনেট। সঙ্গে না আর কোন অফিসার, না সিং সিং-এর কোন কর্তা। লক্ষ্য করো কিন্তু, অন্য কারো সঙ্গে আমি একা—এমন ব্যাপার এখানে এই প্রথম ঘটল (তাছাড়া আমার ধারণা, এখানকার যা আইন—তাতে কাজটা রীতিমত বেআইনী হয়েছে)। আমরা প্রায় পুরো একটি ঘণ্টা সেই ঘরে ছিলাম—তৃতীয় কোন প্রাণী সে ঘরে ঢুকতে পায়নি। বন্ধ দরজার বাইরে বসে ছিলেন বড় জেলার মিষ্টার ফেলি।

মিষ্টার বেনেটই প্রথম কথাবার্তা শুরু করলেন। তিনি বললেন:

'মিঃ ব্রাউনেল, অ্যাটর্ণি জেনারেল, তিনিই আমাকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাঠালেন এবং তিনি চান আপনারা একথা

জানুন যে, যদি সরকারের কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতে রাজী থাকেন তো স্বচ্ছন্দে আমার মারফৎ তা জানাতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে আপনারা যাতে এ ব্যাপারে উপযুক্ত যে কোন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে পারেন সে ব্যবস্থা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে। আর তাছাড়া, যদি আপনি, জুলিয়াস, ওপর-ওয়ালাদের এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ করতে পারেন যে, সরকারকে আপনি সত্যই পুরোপুরি সাহায্য করেছেন তাহলে যাতে আপনাদের প্রতি অনুকম্পা দেখানো হয় তার জন্যে সুপারিশ করবার তাঁরা একটা সূত্র খুঁজে পাবেন।

বুঝতেই পারো, প্রথমে শুনেই আমি থ' হয়ে গেলাম। লোকটা বলে কি! কিন্তু আমি ঠিকই করেছিলাম মাথা গরম করব না। নিজেকে শান্ত রাখব। আমি বললাম একেবারে গোড়াকার কথাটাই হল আমরা নির্দোষ, পুরো সত্যিটাই তাই। আর সেই জন্যেই আমাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না 'সহযোগিতা' কথাটার অন্য কি অর্থ থাকতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভালো কথা, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি কি আমাদের উকিল মশাইকে জানিয়েছিলেন যে, এ ব্যাপারে আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন?

উনি বললেন—না আপনাদের উকিল মশাই তো কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। আমি ওঁকে বললাম উনি যেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন; কেননা সেটাই উচিত কাজ হবে। উনি বললেন করবেন, পরে কোন একটা সময়ে।

তার মানে আপনি আমাকে বলতে চান, মিষ্টার বেনেট—আমি বললাম—যে আমাদের এই বিরাট দৈত্যকায় সরকার আমাদের মত দুটি নেহাৎ ক্ষুদ্র প্রাণীর কাছে আসছে এবং এসে বলছে 'হয় কাঁধ দাও, নয় প্রাণ দাও।' এই তো আমাকে মুগুর দিয়ে ছ্যাঁচবার আজ দরকার পড়ছে না। মধ্যযুগে যা সব ঘটত তার সঙ্গে এই জাতীয় প্রস্তাব মিলে যায়। সেই একই যমযন্ত্র; শুধু চেহারার যা তফাৎ।

দেখুন, আমার ভয়ানক লাগছে কিন্তু।

উনি বললেন, কি বলেন; আমি কাল রাত্তিরে যখন জানতে পারলাম যে আপনার সঙ্গে এবং এথেলের সঙ্গে আমাকে আজই দেখা করতে আসতে হবে, এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে হবে—জানেন, সারা রাত আমি ছুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। এমন দুশ্চিন্তা হচ্ছিল কি বলব।'

কোন দোষ না করা সত্বেও দিন নেই রাত নেই পুরো দু দুটো বছর মৃত্যুর জন্যে দিনগুণে এখানে অপেক্ষা করে বসে থাকতে আমাদের কেমন লাগে বলে আপনার মনে হয়?—আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার গোটা পরিবারকে দারুণ দুঃখভোগ করতে হয়েছে। আমার বোন এমন পড়ল যে আর তার ওঠার ক্ষমতা হল না। আমার রুগ্ন বুড়ী মাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে। আমাদের দুটি দুধের বাচ্চার ওপর দিয়ে ব্যাথায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে হু হু করে ছুটে গেছে অনুভূতি আর আবেগের ঝড়। কাকে আপনি ওসব দেখাচ্ছেন?

মনে রাখবেন, মিষ্টার বেনেট! আমরা আমাদের দেশটাকে ভালবাসি। এ হল আমাদের দেশঘর—আমার সন্তানদের, আমার পরিবারের দেশের মাটি। আমরা চাই না আমাদের দেশের সুনামে কালি পড়ুক; যাতে আমরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারি যে, আমরা নির্দোষ—তার জন্যে ন্যায়ের দিক থেকে, সাধারণ চক্ষুলজ্জার দিক থেকেও আমাদের বাঁচতে দেওয়া উচিত।

তখন উনি বললেন, 'উঁ-হু—নতুন করে বিচার-টিচার ওসব হচ্ছে-টচ্ছে না। কাঁধ যদি লাগান, তবেই অন্তত প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা চরিত্র করা যেতে পারে, অন্তত বলবার একটা মুখ হয়। দেখুন, জুলিয়াস'—উনি বলতে লাগলেন, 'আপনি একথা বলতে পারবেন না যে গোয়েন্দাগিরির এই ব্যাপারে 'আপনি একথা বলতে পারবেন না যে গোয়েন্দাগিরির এই ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন না—কেননা আপনি কখনও তা অস্বীকার করেন নি।'

নিশ্চয় অস্বীকার করেছি, আমি জবাব দিলাম। আর সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মামলার কাগজপত্রগুলো কিছু পড়ে দেখেছেন, আজ্ঞে ?

উনি বললেন উনি পড়েন নি। তবু আগের কথারই রেশ টেনে বলে চললেন, 'এলিজাবেথ বেণ্ট্লির সঙ্গে আপনার যোগসাজস ছিল।'

একদম বাজে কথা, আর আপনি কাগজপত্রগুলো একটু যদি পড়ে দেখেন, দেখবেন সাক্ষী দিতে গিয়ে বেণ্ট্লি নিজে বলেছে সে আমাকে চেনে না, কখনও দেখেওনি।

'সে যাই হোক, আর গোল্ড-এর সঙ্গে তো আপনার সম্বন্ধ ছিলই। কি, অস্বীকার করতে পারেন ?'

নিশ্চয়, ওর সঙ্গে আমার কোনদিন কোন সম্বন্ধ ছিল না। গোল্ডও সাক্ষী দিতে গিয়ে বলেছে, আমার সঙ্গে কখনও ওর আলাপ হয়নি, ও আমাকে চিনত না। মামলার কাগজপত্রগুলো পড়া থাকলেই প্রকৃত ঘটনাগুলো আপনার জানা থাকত।

'ও হো, আমি তো আবার খবরের কাগজগুলোর খবর পড়েছি কিনা।' (লক্ষ্য করবার বিষয় ওদের নিজেদেরই বানানো মিথ্যে কথাগুলো কিভাবে পরে ওদেরই মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়।)

শুনুন জুলিয়াস—কি করব, আমাকে এখনে ওরা ধরে পাকড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে আপনি যদি রাজী থাকেন, আমি ফিরে গিয়ে বরং এমন কাউকে পাঠিয়ে দেব, যে মামলাটা সম্বন্ধে ভাল রকম জানেশোনে—আপনি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে, আপনি, হ্যাঁ, সরকারের কাঁধে কাঁধে লাগিয়েছেন।'

কি করতে চান আপনি, চান কি ? আমি প্রশ্নের সুরে বললাম। আমি দোষী না হলেও, তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করাতে চান যে, আমি দোষী। আমার মাথায় কতকগুলো ধারণা গুঁজে দিতে

চান। যে কথাগুলো আপনারা আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চান, সেগুলো আমি পাখী পড়ার মত করে বলে গেলেই আপনারা খুশী হবেন এই তো ? কিন্তু মাপ করতে হল। এ ব্যাপারে আমি মিথ্যে কথা বলব না।

'দেখুন জুলিয়াস,' উনি বললেন, 'গর্ডন ডীন, যিনি আণবিক শক্তি কমিশনে আছেন, তিনি আমার খুব বন্ধু লোক। তিনি যদি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে আপনি পুরোপুরি এ ব্যাপারে কাঁধ লাগিয়েছেন এবং এই গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে আপনি যা যা জানেন সব যদি ওঁকে জানান তাহলে তিনি সটান প্রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে প্রাণভিক্ষার জন্যে দরবার করতে পারেন।'

আমি নির্দোষ। গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে তাই কিছুই আমি জানি না। বরং আপনি অ্যাটার্ণি জেনারেলকে গিয়ে বলুন যেন তিনিই মৃত্যুদণ্ডটা রদ করানোর জন্যে সুপারিশ করেন—কেননা এই মামলার ব্যাপারে সেটাই হবে ন্যায্য, সেটাই হবে মানবিক এবং সেইটাই হবে যুক্তিযুক্ত। পৃথিবীতে আমাদের দেশের যে সুনাম আছে, তা বজায় রাখা দরকার হয়ে পড়েছে—কারণ বাইরে আমাদের দেশের যাঁরা শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আছেন, এই মামলায় যে অমানুষিক দণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং যে অবিচার দেখানো হয়েছে, তাতে তাদের অনেকেই দারুণ ক্ষুব্ধ।

হ্যাঁ জানি, এই মামলাটার ব্যাপারে খুব সোরগোল তোলা হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে কথা হচ্ছে না। আসল কথাটা হল এই যে কর্তৃপক্ষের লোকদের এটা আপনাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আপনি কাঁধ লাগিয়েছেন। আচ্ছা বলতে পারেন জুলিয়াস, আপনার নিজের শালাই বা আপনাকে এভাবে জড়াতে গেল কেন ?'

আমার বিশ্বাস সে নিজের গা বাঁচাতে চেয়েছিল। তাছাড়া সেই সঙ্গে এটাও সে দেখাতে চেয়েছিল যে, সে হল আসল সাকরেদ এবং নিরীহ অন্য কোন ওস্তাদ লোকের পাল্লায় পড়ে সে দোষ করে

ফেলেছে। নিজে ওস্তাদ সেজে যে সব কাজ সে করেছে, তার দায়িত্ব থেকে এই ভাবেই সে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া সরকার গ্রীণগ্লাসদের মালসমেত হাতে হাতে ধরেছিল; কাজেই তারা এমন রাস্তা খুঁজেছিল যাতে বিচারে তাদের দণ্ডটা খানিকটা হাল্কা হয়ে যায়। আমার মত একজন লোককে সহজেই সে মিথ্যাভাবে জড়াতে যে পেরেছিল, তার কারণগুলো হল এইঃ আমি যেহেতু ইউনিয়নের কাজ করতাম, সুতরাং আমি নিশ্চয় কমিউনিষ্ট—এই রকম অভিযোগে আমাকে সরকারী চাকরীটা খোয়াতে হয়; আমি ওর আত্মীয় হওয়ায় আমার সম্পর্কে খুঁটিনাটী অনেক খবর রাখত; আমাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কে ব্যক্তিগত শত্রুতার ভাব ছিল। এই সব কারণের জন্যেই আমাকে মিথ্যেভাবে জড়াতে পেরেছিল। তাছাড়া, ফরিয়াদী পক্ষ হাতের কাছে একটা সুযোগ পেয়ে গেল, যাতে করে তারা 'কমিউনিষ্ট—গোয়েন্দা—পরমাণু—বোমা' একসঙ্গে এতগুলো সাজানো জিনিসের ভেতর দিয়ে বড় রকমের রাজনৈতিক মতলব হাসিল করে নিতে পারে। আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বলির পাঁঠা করা হল। চোরাগোপ্তা যুদ্ধের আবহাওয়ায় রাজনৈতিক বাদানুবাদের ঝড়ে খড়ের কুটোর মত আমরা ভেসে বেড়াতে লাগলাম। তার চেয়ে বরং একটা কাজ করুন—গ্রীণগ্লাসদের কাছে যান না। ওদের ধরে কাঁধ লাগাতে বলুন। বলুন যে এই পরিবার সম্পর্কে সত্যি কথাগুলো ওরা বলুক।

মিষ্টার বেনেট, আপনি হলেন জেলবিভাগের বড়কর্তা। আপনি ভালভাবেই জানেন যে, টুম্‌স্‌-এ* গ্রীণগ্লাস আর গোল্ড একটানা ন মাস ধরে একসঙ্গে ছিল; তারা মামলার ব্যাপারে ক্রমাগত আলোচনা করেছে; পাতাগুলো আলাদা করা যায়, এমনি একটা লেখা বড় খাতা তারা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে, সাক্ষী হিসেবে কি বলবে না বলবে তার মহড়া দিয়েছে; ফরিয়াদী পক্ষ, তাদের উকিল আর সরকারী গোয়েন্দাবিভাগের লোকদের সঙ্গে দিনের পর দিন

*নিউইয়র্ক সিটি জেলখানা

তাদের কথা হয়েছে। আপনি সব জানেন। কারণ, ট্রুম্‌স্‌-এর নথিপত্রের মধ্যে তার পরিচয় মিলবে। এসব জেনেশুনেও আপনার দপ্তর আমাদের সে সুযোগ দেননি—নথিপত্রগুলো একবার দেখতে দিলে আমরা সমস্ত প্রমাণ করে দিতে পারতাম। আণবিক বোমার ছক-বিষয়ক সাক্ষ্যটা যে মুখে বলে এবং লিখে দিয়ে একেবারে পাখী-পড়া করে ওদের শেখানো হয়েছিল, তা আপনি জানেন। আপনি জানেন যে, গ্রীণগ্লাসেরা মিথ্যে বলবে জেনেও ফরিয়াদীপক্ষ তাদের আদালতে সত্যি বলার শপথ নিতে দিয়েছে। স্নাইডারকে* মিথ্যে সাক্ষী দিতে ফরিয়াদীপক্ষ বাধ্য করেছে—এ আপনি জানেন। দোষ ক্ষালন হয়ে যাবে এমন কোন সাক্ষ্য আমার স্ত্রীর পরিবারের লোকদের কাছ থেকে যাতে না আসতে পারে—আপনি জানেন, সরকার পক্ষ থেকে ক্রমাগত সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফরিয়াদী পক্ষের হাতে এমন অনেক দলিল আছে, যার সাহায্যে আমরা নির্দোষ বলে প্রমাণ হতে পারি। কিন্তু সেগুলো আদালতে পেশ করা হচ্ছে না, আপনি জানেন। এক কথায়, আমরা সুবিচার পাইনি এবং আমাদের নামে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আর আপনি কিনা বলছেন আমরা যেন সেই প্রকাণ্ড মিথ্যেটাকেই সত্যি বলে মেনে নিই। সে কাজ আমরা কখনই করতে পারি না।

নিশ্চয় মিষ্টার বেনেট, নিশ্চয়। কাঁধ আমরা দেব বৈকি। আদালতে যাতে আমরা বিচারের একটা দিন পাই, সেই ব্যবস্থাটা করুন তো। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে আমরা সত্যি কথাটাই আবার বলল। আর সেই সঙ্গে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্যে চাইব শমন পাঠিয়ে সাক্ষী সাবুদ হাজির করা হোক। তবেই বলা যাবে—হ্যাঁ, আমরা সুবিচার পেয়েছি।

*পাস্‌পোর্ট ফটোগ্রাফার। স্নাইডার পরে স্বীকার করেছিল যে সে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে।

'না জুলিয়াস, না নতুন করে ও সব বিচার টিচার আর হচ্ছে-টচ্ছে না—যদি বাঁচতে চান তো পথে আসুন, কাঁধ দিন—

কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের উকিলকে আমাদের একটি প্রস্তাবেও তো আপনারা রাজী করাতে পারেন? তারপর যা হয় হোক—আমাদের বলবার আর কিছু থাকবে না। আমাদের স্থির বিশ্বাস, আমরা নির্দোষ প্রতিপন্ন হবো।

'না, না। সে কথা হচ্ছে না। কথাটা হল, সরকারের সঙ্গে আপনাদের কাঁধ দিতে হবে।'

বেশ মৃত্যুদণ্ডটার কথাই ধরুন। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, বিচার ঠিক হয়েছে—আমরা অবশ্য তাতে ঘোর আপত্তি করব—এত বড় একটা শাস্তি দেওয়া কোন দিক থেকেই উচিত হয়নি। আমাদের দেশের ইতিহাসটা যদি এই হয়—যুদ্ধের পাইকারী খুনী-গুণ্ডা নাৎসী-ফ্যাশিষ্টরা খালাস পাবে, যারা দেশদ্রোহী যারা গুপ্তচর তাদের প্রাণ বাঁচানো হবে, আর এই প্রথম, যত চোর দায়ে ধরা পড়বে কিনা এই রোজেনবার্গরা—দেখুন, আপনি তো হাজার হোক মানুষ, আপনার ভেবে দেখার ক্ষমতা আছে—আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। মামলার সমস্ত তথ্য, বিচারের নথিপত্র এবং তার রায় থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা আগাগোড়া জোর জবরদস্তির ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের প্রাণে না মারাটাই হবে সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত এবং মনুষ্যত্বের আচরণ; শক্তিমান আগুয়ান দেশ হিসেবে তুনিয়ায় আমাদের সুনাম বড় কম নয়। এটা আমাদের বোঝা উচিত, যখন আমাদের এত বড় একটা সরকার দেশের তুটি লোককে বলে 'হয় কাঁধ দাও, নয় প্রাণ দাও'—সারা তুনিয়ার লোক ভাববে-টা কি? মনে রাখবেন, আমাদের প্রাণ দণ্ড মুকুব করলে দেশেরই মঙ্গল করা হবে।

'কী মুস্কিল—আমি তো জুলিয়াস, আপনাকে তার সুযোগ দিচ্ছি—কাঁধ দিন না।'

তা তো বটেই, বিচারক কাউফম্যান এই নৃশংস সাজা দিয়ে সাংঘাতিক ভুল করেছেন। এখন এমন একটা পাকে পড়েছেন যে তা থেকে বেরিয়ে আসারও তাঁর মুরোদ নেই।

'ঠিকই বলেছেন, জুলিয়াস। ওঁকে আপনার সাহায্য করা উচিত, যাতে তিনি ওঁর রায়টা ঘোরাতে পারেন। যা আপনি জানেন, না রেখে ঢেকে সব যদি আপনি ওঁকে খুলে বলেন, তাহলেই তাঁকে আপনি সাহায্য করতে পারেন।

ওঁকে ওঁর ভুলের জন্যে আমি ক্ষমা করতে পারি না। কেননা, আমাদের বিরুদ্ধে সাজা দেওয়াটাই হয়েছে অন্যায়; সত্যি বলতে কি, আসামীর কাঠগড়ায় আমাদের দাঁড় করানোটাই উচিত হয়নি।

'প্রত্যেকটা আদালত যতবার বসেছে, সাজা ঠিক হয়েছে বলে ততবারই রায় দিয়েছে, এবং তাছাড়া ওয়াশিংটনের কর্তৃস্থানীয় সবাই মনে করেন আপনি দোষী। কি ব্যাপার! সবাই আপনাকে দোষী ঠাওরাচ্ছে—ব্যাপারখানা কি!'

আপনি জানেন, যত আপীল আদালত বসেছে, তার মধ্যে শুধু একটিতেই আগেকার সাজা বহাল থেকেছে; আমরা চেয়েছিলাম ছোট আদালতে যে ভাবে বিচারের কাজ চালানো হয়েছে, তা ঠিক হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে নথিপত্র চেয়ে পাঠানো হোক। আমাদের সে আবেদন মঞ্জুর হয়নি। যে জাতীয় মামলা তাতে আমাদের আবেদন নাকচ করে দেওয়াটা মোটেই কাজের কাজ হয়নি। আর অন্য কোন কোন আদালতে তো আমাদের হাজির হয়ে কিছু বলবার সুযোগই দেওয়া হয়নি—আমাদের অধিকার বলতে ছিল শুধু লিখিত কাগজপত্র পেশ করা। শাঁসটুকু বাদ দিয়ে আমাদের দেওয়া হয়েছে আইনের শুধু খোসাটা। তাও সব সময় বিচার হয়েছে যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে—কারণ, ওদের সব সময় ভয় এই বুঝি আমরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করে ফেলি, এই বুঝি। তাছাড়া বিচারের নথিপত্র পড়ে দেখে ডক্টর উরে, অধ্যাপক আইনষ্টাইন এবং আরও অনেক নামজাদা

আইনবিদ এবং লেখক-পণ্ডিত মানুষ মামলার ন্যায্যতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ পোষণ করেছেন। পোপ স্বয়ং এবং তাছাড়া তিন হাজার খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্মনায়ক, বহু বিশিষ্ট ইহুদী ধর্মযাজক এবং আরও লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ প্রাণভিক্ষার আবেদন জানিয়েছেন।

'না, জুলিয়াস। পোপ প্রাণভিক্ষা চাননি।'

আল্‌বাৎ চেয়েছেন। লেখা খুলে আমি তার প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারি। 'ল্'য়োসার ভাতোর রেমোনা' পত্রিকা আমার নিজের কাছেই কাছে। আমরা একটা পুরো দলিল ছাপিয়ে নিয়েছি—তার মধ্যে বিচারের সমস্ত ধারাবিবরণী দেওয়া আছে। লোকে তা পড়েছে এবং তা পড়ে দণ্ডাদেশের ন্যায্যতা সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়েছে। এই ছাপানো দলিল লোকের কাছে পৌঁছুবে এবং লোকে তা পড়বে। এরকম একটা কেলেঙ্কারির দলিলের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একটি মাত্র পথই আছে—সে পথ হল আমাদের বাঁচতে দেওয়া।

'দেখুন জুলিয়াস, আপনি যে বলছেন বিচার ঠিক মত হয়নি, সাজা অতিরিক্ত কড়া হয়েছে, বড় বেশী লোক-জানাজানি হয়ে গেছে—ওসব কথা বাদ দিন। যে একটা মাত্র রাস্তা আপনার সামনে এখন খোলা তা হল কাঁধ দেওয়া এবং ওয়াশিংটনের কর্তাদের সংশয় দূর করা। একমাত্র তাহলেই তাঁরা আপনার হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইবার একটা সূত্র পেতে পারেন।

আপনি বলছেন, সমানে এই তিন সাল আমি সত্যি কথাটা বলছি না সুতরাং যে কথাটা আমাকে দিয়ে আপনারা বলিয়ে নিতে চান তা যদি বলি, তাহলে সেটা হবে 'কাঁধ-দেওয়া' এবং তখন সেটাই হবে 'সত্যি কথা'। দেখুন যে পর্যন্ত আমার বিবেক আছে, আপনাদের এই সব কাজকারবারে আমাকে পাবেন না। আর সেই সঙ্গে এও বলছি, এইভাবে আমাদের ওপর চাপ দেওয়াটা কার্যত নিষ্ঠুরতা এবং জুলুমবাজি ছাড়া কিছু নয়। বরং ব্রাউনেলকে গিয়ে বলুন যেন তিনি আমাদের মৃত্যুদণ্ডটা মাপ করার পরামর্শ দেন—এ যদি করেন, তাহলে

বলব তবু যাহোক ভদ্দর লোকের মত কাজ হল।

এথেলের সঙ্গে যখন উনি দেখা করতে ঢুকলেন ঘড়িতে তখন বারোটা। আধ ঘণ্টা কথা হল। তারপর ওঁরা আমাকে মেয়েদের বাড়িটায় ডেকে নিয়ে গেলেন। একটা পর্যন্ত আরও আধ ঘণ্টা ধরে আমাদের দুজনকে উনি নানাভাবে ভড়কে দেবার চেষ্টা করলেন। এই সময়কার ঘটনাগুলো এথেলের কাছ থেকেই শুনে নিও।

পালা চুকে যাবার পর মেয়েদের বাড়িটায় জেলার মশাই এসে জিজ্ঞেস করলেন—এসব কি হচ্ছে-টচ্ছে, ব্যাপারটা কি? আমি বললাম মিষ্টার ব্রাউনেল মিষ্টার বেনেট্‌কে পাঠিয়েছিলেন আমাদের বলতে যে আমরা যদি সরকারের কাঁধে কাঁধ দিই তাহলে তিনি আমাদের মৃত্যুদণ্ডটা মাপ করার জন্যে প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে বলবেন। মনে থাকে যেন, যখন আমাদের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়, তখন সেখানে জেলার মশাই ছিলেন না।

আমি যখন সেলে ফিরে গেলাম একটা তখন বেজে গেছে। এর পর আবার একবার মিষ্টার বেনেট এলেন। আবার তিনি আমাকে ঘ্যান ঘ্যান করে বোঝাতে লাগলেন—তার চেয়ে বরং উনি গিয়ে এমন কাউকে পাঠিয়ে দেবেন মামলার ব্যাপারগুলো সম্পর্কে যাঁর ভাল জানাশুনা আছে এবং তাঁর এই প্রস্তাবে যেন আমি রাজী হই। আর বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনি কতদূর জানেন না জানেন উনি প্রশ্ন করবেন, আপনি তার জবাবটা দিয়ে যাবেন।' তখন আমি বললাম: ক্ষেপেছেন, তার মানে তো 'মগজ ধোলাই' পাল্লায় পড়া, মিষ্টার বেনেট। তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন আবার কোন সময় উনি আসতে পারেন কিনা। আমি বললাম আসতে পারেন, তবে যদি ভাল খবর দিতে পারেন তাহলেই।

দুটি নিরুপায় মানুষকে এমনি এক জ্বলজ্যান্ত বিভীষিকার মুখে পড়তে হয়েছিল। ন্যায় আমাদের দিকে, তাই সে পারেনি। আমরা আমাদের নীতিগুলোকে জলাঞ্জলি দিতে চাইনি; আমরা রাজী হইনি

গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার প্রতি আমাদের তদ্‌গত বিশ্বাসকে ছেড়েছুড়ে দিতে; সততা হারিয়ে মানুষের ভগ্নাংশ হতে আমরা চাইনি। বিভীষিকা তাই আমাদের সঙ্গে পারেনি। এই ঘটনার সবটা দেশের লোককে জানানো উচিত; কারণ, এই মালমশলা দিয়েই ফ্যাশিজম তৈরি হয়। এখুনি যদি এর পথ আটকানো না যায়, আমাদের দেশ সাংঘাতিক বিপদে পড়বে। খবরের কাগজে খুব ঘটাপটার পর ওরা মিন্‌মিন্ করে বলেছে—না তো সব ফাঁস হয়ে যাবার দরুণ কোন কুপ্রস্তাব করা হয়নি তো। মুস্কিল হল এই যে দেশসুদ্ধ লোকের কাছে খবর পৌঁছে দেবার যতগুলো রাস্তা আছে তার সবগুলোই ওদের দখলে। তার মারফৎ আমাদের মামলার ব্যাপারে সমানে ওরা পাঠক ও শ্রোতাদের মৃদু মৃদু 'মগজ ধোলাই' করে চলেছে। ফলে সাধারণ মানুষ ভুল খবর পাচ্ছে। সুতরাং কাজটা শক্ত হলেও আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে সত্যিকথাটা যেন লোকের কানে পৌঁছে দেওয়া যায়।

আমাদের কাজে লাগানো গেল না দেখে বিচার বিভাগ আমাদের খুন করাটাই সাব্যস্ত করেছে। ওদের মতলবগুলো পণ্ড করে দেবার জন্যে আমাদের বেঁচে থাকা দরকার। আমি বিশ্বাস করি, দেশের লোক সত্যি ঘটনাগুলো জেনে বুঝে নিয়ে আমাদের জীবনগুলো রক্ষা করবে, আমরা যাতে মহান আমেরিকান ঐতিহ্যের চিরাচরিত ধারায় সুবিচার পেতে পারি তার জন্যে আদালতকে বাধ্য করবে আমাদের মৃত্যুদণ্ড ঠেকিয়ে রাখতে। আমেরিকা এর কি উত্তর দেবে? আমাদের দেশের সুনাম বজায় থাকবে, আমরা বাঁচবো—এ ভরসা এখনও আমাদের আছে।

আমার সমস্ত ভালবাসা—

জুলি

৭ই জুন, ১৯৫৩

উকিল মশাই, তুমি বুঝতেই পারো—কথাবার্তা যা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি শব্দ মনে রাখা সম্ভব নয়; তবে মগজ-ধোলাই পর্বটা যদি রেকর্ড করে রাখা হত তাহলে দেখা যেত আমি যা লিখেছি, সেটা হল গোটা ব্যাপারটার মোদ্দা কথা। ব্যাপারটাকে মিহি মিহি কথা আর ফিন্‌ফিনে পাতলা চাদর দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল; লেখবার সময় আমি সেই মোড়কটা টান মেরে ফেলে দিয়েছি। সে যা বলেছিল, তার মানে করে বললে কথাটা দাঁড়ায় এই: আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে, কোর্ট কাছারিগুলো আমাদেরই হাতে; ওদিক দিয়ে পার পাবার কোন উপায় নেই। তাছাড়া, দুনিয়ার মানুষদের ভাবনা-অনুভূতি বিচার-বিবেচনা সম্বন্ধে তার একটা দারুণ রকমের থোড়াই-কেয়ার ভাব। যেন সে বলতে চায়: 'এখন আমরাই রাজা এটা যদি ওদের মিষ্টি না লাগে, কোঁৎ করে গিলে ফেললেই তো পারে!' অনেক কথার ভেতর দিয়ে সে এইটাই আমাকে বলেছিল যে, আমি যদি গোয়েন্দা-বৃত্তি করি এবং আমার কাজে ও কথায় ওয়াশিংটনের কর্তারা খুশী হন একমাত্র তাহলেই আমাদের ওরা বেঁচে থাকতে দেবে। বোঝা যাচ্ছে, ওদের মরবার পাখা উড়ছে; এক সাংঘাতিক দুরারোগ্য রোগে ওরা ভুগছে—এসব তারই উপসর্গ। মাথা যাদের ঠাণ্ডা, যাদের জ্ঞানকাণ্ড আছে, যাদের সরকার চালাবার ঠেলা সামলাতে হয় সরকারের সেইসব মাথা মাথা লোকদের সুযুক্তি এবং ভাল কথা কানে না তুলে—আমার ভয় হচ্ছে, পাগলামির কোন একটা মুহূর্তে হতাশায় আর আক্রোশে হয়ত তারা জোড়া খুন করে বসবে।

দেখছ না, যে প্রশ্নগুলো আমরা তুলছি আদালতের বিচারকরা সেগুলো একবার পড়েও দেখছে না একটু যাচাই পর্যন্ত করছে না। আদালত থেকে শমন জারী করা হোক বলে যে দরখাস্তগুলো আমরা করেছি, যদি তাঁরা সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যাবার ভাণটুকুও করতেন, আমাদের শাঁস না দিয়ে আইনের খোসাটুকুও দিতেন—তবু

কথা ছিল ; কিন্তু সেটুকুও তাঁরা করেন নি। আর তারপর তো আদালত নামতে নামতে যে পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তাতে তাকে সর্বে-সর্বা পুলিশ বাহিনীরই একটি ল্যাংবোট ছাড়া কিছু বলা যায় না ; রাজনৈতিক মামলায় বিবাদীপক্ষের ন্যায্য অধিকার এবং শাসনতন্ত্রের রক্ষাকবচ—ওসব এখন অকেজো হয়ে গেছে। এই হল সোজা সত্যি ঘটনা। আমি মনে করি, আমাদের মামলা-সংক্রান্ত কাগজগুলো প্রত্যেকটা হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বিলি করা দরকার ; আমেরিকার মানুষজন তা প'ড়ে জানুক—*ঠিক সেই জিনিষ কিন্তু এখানেও ঘটছে*।

এথেল সম্বন্ধে একথা না বলে পারছি না যে, সত্যিই সে হীরের টুকরো—সত্যি সে এক আশ্চর্য বলবীর্যবতী নারী। আমাদের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ধকল গেলেও, আমরা যে আমাদের মনগুলোকে করাত দিয়ে চিরতে দিইনি—তার জন্যে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি। যখন জানতে পারি আমরা সবাই আমাদের জানপ্রাণ দিয়ে যা করার তা করছি—কি ভাল যে লাগে। কবে, বল তো কবে আমাদের এই যন্ত্রণার শেষ হবে ? আমরা খানিকটা দিনের আলো দেখতে চাই—আর কত দেরি ? শীগ্‌গিরই সুখের খবর আসবে, এই আশায় আমরা পথ চেয়ে বসে আছি যে।

চিরদিনের—

জুলি

প্রিয় ম্যানি, ৮ই জুন, ১৯৫৩

পুরো দুবছরেরও ওপর হল যে বিষয়টা নিয়ে বিচার দপ্তর দেশের লোকের 'মগজ-ধোলাই' করতে চাইছেন ; তাঁদের এই হাত দিয়ে হাতী ঠেলবার চেষ্টা দেখে ইআগোর সেই খোঁচা-মারা কথাটা মনে পড়ছে : 'কাজে না লাগলে বীরত্বের আসল চেহারা ফুটে ওঠে না।'

মনে আছে তোমার—মঙ্গলবার ২রা জুন, সর্বোচ্চ কারাধ্যক্ষ মিষ্টার জেমস্ ভি, বেনেট আমাদের সঙ্গে সিং সিং-এ 'রুটিন মাফিক' মোলাকাত করতে এসেছিলেন এবং তক্ষুণি সে কথাটা আমরা তোমাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলাম।

যেদিন আমাদের ওপর জোর করে খোলাখুলি বর্বর প্রতিহিংসা-পরায়ণ দণ্ডাদেশ চাপিয়ে দেওয়া হল তারপর থেকে কিছুদিন অন্তর অন্তরই খবরের কাগজ, রেডিও এবং টেলিভিশণ মারফৎ আমাদের পই পই করে বলা হতে লাগল—যদি আমরা সরকারের সঙ্গে 'কাঁধ দিতে' রাজী থাকি, যদি আমরা আমাদের 'অপরাধে'র জন্যে 'ঘাট মানি' তবেই আমাদের বাঁচবার একটা মওকা মিলবে। 'বলে ফেলা'র অনুরোধ জানানো এই বেসরকারী 'আমন্ত্রণ'গুলো অনেক সময় এমনভাবে একইসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে সপ্তমে সুর চড়িয়েছে যে, তার মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটা স্পষ্ট মতলব টের পাওয়া গিয়েছিল। আর ঠিক তাই দেখা গেল, সুপ্রীম কোর্ট শেষবারের মত পুনর্বিচার করতে অস্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে করে মিথ্যে খবর রটানো হল যে, আমাদের কাছে নাকি প্রস্তাব করা হয়েছে, আর তুমি আমাদের উকিল হিসেবে যখন প্রকাশ্যে স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে সেই 'খবর'কে নীতিবিগর্হিত জালিয়াতি বলে নিন্দে করলে, তখন সরকার বামাল ধরা দিতে বাধ্য হল।

বিচারক কাউফম্যান চিরাচরিত ধারায় বিশ্রী রকমের তাড়াহুড়া করে ১৫ই জুন থেকে যে সপ্তাহের শুরু সেই সপ্তাহে আমাদের দুজনকে একই দিনে মারবার সময় বেঁধে দিলেন। তারপরই ওয়ার্ডেনকে সঙ্গে করে যুক্তরাষ্ট্রের দুই মার্শাল স্বহস্তে আমাকে সরকারী শমন দিয়ে গেলেন, দেখা গেল, সেই মহৎ ব্যাপারটির দিন ধার্য হয়েছে ১৮ই জুন (ভাল কথা, ঐদিন আমাদের বিবাহের চতুর্দশ বার্ষিকী)। তারিখটা ছিল ১লা জুন, সোমবার। তার ঠিক পরদিন আমি খেতে বসেছি এমন সময় মিষ্টার বেনেট মৃত্যুপুরীতে মেয়েদের

বাড়ীতে এসে হাজির। এখানকার চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করে তিনি সম্পূর্ণ একা আমার সঙ্গে দেখা করেন, এখানে যিনি প্রধান ভারপ্রাপ্ত এবং সেই সঙ্গে মেট্রন—ওঁরা চুপচাপ দালানের বাইরে লোহার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর যিনি যে কোন সরকারী পরিদর্শক এলে সঙ্গে না থেকে যান না, সেই ওয়ার্ডেন কিন্তু সন্দেহজনকভাবে সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন।

মিষ্টার বেনেট আসল কথায় এলেন। অ্যাটর্ণী জেনারেল হার্বার্ট ব্রাউনেল (ছোট) ওঁকে নির্দেশ দিয়েছেন উনি যেন আমাকে জানান যে, গুপ্তচরবৃত্তির যে খবর এতদিন আমি চেপে রেখেছি তা যদি আমি কোন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে বলতে রাজি থাকি তাহলে সেই মত তিনি লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। যদি এইভাবে আমি সহযোগিতা করি, তাহলে সরকার মৃত্যুদণ্ড রদ করতে রাজী আছে। উনি জুলির সঙ্গে একঘণ্টা এবিষয়ে কথাবার্তা চালিয়েছেন এবং এখন আমার মতামতটা জানতে চান।

আমি খুব ছোটর মধ্যে মিষ্টি মিষ্টি করে বললাম। আমি নির্দোষ আমার স্বামী নির্দোষ এবং আমরা কেউই গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ জানি না। এবং অ্যাটর্ণী জেনারেল যদি কোন কর্তাব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠান, এখুনি যে কথা বললাম সেই একই কথা তাঁকেও বলব এবং সেই সঙ্গে জোর দিয়ে বলব—এরকম একটা কেলেঙ্কারির হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে আমার প্রাণদণ্ডটা মাপ করুণ।

মিষ্টার বেনেট খুব মোলায়েম করে কাঁধ দেবার কথাটা আমাকে বোঝাতে লাগলেন। 'আপনি কিছু জানেন বৈ কি'—উনি আমাকে বাজিয়ে নিতে চাইলেন। আমিও তার সঙ্গে তাল রেখে তক্ষুনি জবাব দিলাম: যার মধ্যে আমি ছিলাম না, তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব কেমন করে। আপনাদের কথা শুনে যদি চলতে যাই, তাহলে তো আমাকে বসে বসে এখন ভেবে চিন্তে একগাদা মিথ্যে কথা তৈরি

করতে হয় আর সেই সঙ্গে নিরীহ কতকগুলো মানুষকে জড়িয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয়। সরকারী কর্তারা কি তাই চান যে আমি মিথ্যে কথা বলি ?'

উনি দস্তুর মত থ' হয়ে গেলেন তারপর বললেন, 'না, না, দেখুন সত্যিই আমরা আপনাকে মিছে কথা বলতে বলছি না। তবে কি জানেন—এই ধরুন যেমন কয়েকজনের একটা পরিবার। তার মধ্যে একজন হয়ত নিজে বিশেষ ধরণের কতকগুলো কাজের সঙ্গে জড়িত নন—কিন্তু যিনি হয়ত জানেন বাড়ির অন্য একজন লোক কী করে না করে। এমন ধরণের ব্যাপার হতে পারে।

আমি খুব ভদ্রভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, 'দেখুন, ব্যাপারটা এখনও সেই আছে—বিচারের সময় আমি যতটা জানতাম, এখন তারচেয়ে বেশী আর কিছুই জানি না। তখন আমি পুরো সত্যি কথাটা সমস্ত বলেছি, এখন নতুন করে মিথ্যে বলবার আমার প্রবৃত্তি নেই।'

উনি তখন অন্য একটা রাস্তা ধরলেন। 'আমি একজন খাঁটি সাচ্চা প্রকৃতির মানুষ। তাহলেও এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হল এই যে, নিজেকে অপরাধী জেনেও মানুষ অনেক সময় নিজেকে নির্দোষ বলে জাহির করে—অবশ্য তার কারণ যাই হোক। কি আপনার মনে হয় না তা ?

'আমারও সেই ধারণা, ওঁর মত করেই বললাম, আপনার কথা আমি মানি যে, খুঁজলে এমন ঘটনা পাওয়া যাবে। তাহলেও, ওসব ক্ষেত্রে কে কি মনে করেছে তা আমি দেখতে চাই না। যাই হোক আমি আমার নিজের মনপ্রাণটাকে ভালভাবেই জানি এবং আপনাকে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি—এখনও আমি বলছি আমি নির্দোষ ; কেননা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ সত্যিই আমি করিনি।

'কিন্তু দেখুন, সরকার বলছে তাদের কাছে নাকি এমনসব দলিল-

পত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যাতে আপনার ঐ কথাটা অপ্রমাণ হয়ে যায় ; কাজেই আপনি যদি একটু কাঁধ দেন তাহলে মৃত্যুদণ্ডটা রদ করার একটা সূত্র পাওয়া যায়।'

তাঁর কথায় আমার কোনই ভাবান্তর হল না। 'গোড়াতেই বলে রাখি, ওদের কাছে কি আছে না আছে আমি জানি না, জানতে চাইও না। যাই থাক, আমার সঙ্গে জড়িত কোন ব্যাপারে নিশ্চয়ই নয়। তাছাড়া, ওদের কাছে যদি থোতা মুখ ভোঁতা করে দেবার মত তেমন কিছু থাকে থেকে, সে সম্বন্ধে আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেবারই বা দরকার পড়ছে কেন?—তাও আবার একেবারে নিদান কালে? যেসব ব্যাপার সম্বন্ধে আমি হলপ করে আগেই বলেছি আমার কিছু জানা নেই—সেই ব্যাপারগুলো এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমাকে দিয়ে আপনি কবুল করিয়ে নিতে চাইছেন, যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সামনে কখনও আদালতে হাজির করা হল না। ঐসব সাক্ষ্য প্রমাণ যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, হ্যাঁ সত্যি সত্যিই তার কাছে আছে—তাহলে এ কথাটা খুবই স্পষ্ট যে ঐসব সাক্ষ্য প্রমাণের যথার্থ সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ করা চলে। আমি আপনাকে মুখের ওপরই বলছি। দুনিয়ার সবচেয়ে জবরদস্ত সরকার আমাদের কাছে এই রকমের একটা নির্লজ্জ প্রস্তাব দিয়ে তার লোক পাঠিয়েছে এই কারণে যে, এক্ষণে বেআইনী ভাবে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যেই চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছে—এ বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান আছে এই কদর্য সাজানো মামলার ব্যাপারে তাদেরও যে হাত আছে, সে কথা ফাঁস হয়ে যাবে —এই ভয়টাই তাদের বড়। তাই সেই ভয়েই তারা আর দিন কতকও সবুর করতে রাজী নয় ; জোড়া খুনের ব্যাপারটা চট্‌পট সেরে ফেলতে চায়। হায়ালজ্জার মাথা খেয়ে ওরা জোর করে মোচড় দিয়ে আমাদের কাছ থেকে মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে চায় আর তারই জন্যে আমাদের প্রাণ দুটোকে বড়শিতে গেঁথে টোপ হিসেবে

নাকের সামনে ধরে—যেন আমরা দুটি হতচ্ছাড়া মাছ। যা চাইছি বার করো, নইলে জয়মাকালী—বলবার কথাটা এই না?'

দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আমার ঘৃণার আগুনে ছাই চাপা দেবার জন্যে মিষ্টার বেনেট এই সময় হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন, 'না, না! আপনি বড্ড চটে যাচ্ছেন। দেখুন, আমি মোটেই তা বলতে চাইনি আপনি আমার কথাটা ভুল ভাবে নিচ্ছেন।' আমি সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবে বললাম: 'মোটেই না। আপনার কথা আমার বুঝতে বাকি নেই। অবশ্যই আপনি অতটা নৃশংসতায় এখনও ধাতস্থ হতে পারেননি, তাহলেও আমি খুব সঠিকভাবেই সরকারের মনের কথাটা আপনার কাছে খুলে ধরতে পেরেছি। বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসে মরতে যদি আমরা ভয় পাই, সরকারের দোষ ঢাকা পড়বে—তাই তার জন্যে যতই ভয় দেখানো হোক ভয় আমরা পাব না। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে সুবিচার আমাদের ন্যায্য পাওনা; তার বদলে এতটুকু একটু ঘুষ নিয়ে হাত নোংরা করে আমরা সেই সমস্ত কায়দা-কানুনের কব্জিতে বল যোগাতে চাই না, যে কায়দাকানুনগুলো শুধু গণতন্ত্রহীন ঠ্যাঙাড়ে রাষ্ট্রের পক্ষেই মানায়। ওসব কায়দাকানুন হিটলারী জার্মানিতেই চলে ভালো; আমাদের এই স্বাধীনতার মাটিতে নয়। সত্যিই মহান সত্যিই মহিমান্বিত যে দেশ তার কাজই হল অভাব অভিযোগ মেটানো; যে জীবনগুলোর আদৌ বিপদ্‌গ্রস্ত হবার কথাই নয়, যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে—অনিচ্ছার সঙ্গে তাদের একটু করে বাঁচতে দেবার বদলে দাম চাওয়া, এটা এই মহামহিমান্বিত দেশের পক্ষে একেবারেই উচিত কাজ হচ্ছে না।

'কিন্তু আমরা তো আপনাদের সাহায্য করতে চাই—শুধু একটু কাঁধ দিন না। ভদ্দরলোক এরপর থেকে আরও কেমন টাল খেতে লাগলেন। যেভাবে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা হাতের মধ্যে নেবেন বলে নিশ্চয়ই মনস্থ করে এসেছিলেন, কিন্তু সেভাবে ব্যাপারটা তাঁর হাতের মধ্যে কিছুতেই তিনি রাখতে পারছিলেন না। ক্রমেই তাঁর

ক্ষমতাস্পর্ধী নির্বিকার মুখের মুখোশ খসে গিয়ে তাঁর পরাজয়ের দুর্বল আন্তরিক ভাব ফুটে উঠছিল।

আমি অচঞ্চলভাবে বলে চললাম। 'আপনি যাই বলুন না কেন, ডালপালা দিয়ে যতই চেপে রাখুন না কেন, যতই জমকালো বাহারে করুন, যতই পলেস্তারা লাগান, যেদিক দিয়েই যান—এর নাম জুলুম, এর নাম চাপ, এর নাম বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মারা।' আমি ওঁকে ঘড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম; ঘড়িটা টিক্ দিয়ে দিয়ে মহানন্দে হিসেব করছে আমার আয়ুর বাকি থাকল কত। 'খুব ঠাণ্ডা মাথায় আপনাকে এই কথাটা শুধু বলতে—চাই ১৮ই জুন, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা-১০ মিনিটে আমার কাছে আসবেন; দেখতে পাবেন আমি যে নির্দোষ—এ সত্যটুকু বিকৃত হয়নি।

মিষ্টার বেনেট আমার চোখের দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যেন বলতে চাইছেন: 'মেয়েটা ছিটগ্রস্ত; নইলে প্রাণটাকে হাতের কাছে পেয়ে কেউ ছাড়ে? অবশ্যই একদম বিনামূল্যে পেত না, দাম একটা দিতে হত। যাইহোক, ওর এই মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ব্যাপারটায় শ্রদ্ধা হয় বৈকি।

লোকটার কথা ভেবে সত্যি খারাপ লাগছিল; আরও দশজনের মত একটা প্রকাণ্ড চাকার সঙ্গে বাঁধা, চাকরির খাতিরে এই ঝকমারির কাজ করতে হয়। আমাকে প্রাণপণে বোঝাবার কত চেষ্টা; তিনি নাকি কোন পক্ষেই নন। কিন্তু সুস্থ সবল আত্মবলিদানকৃত সততার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই অবাস্তব কোনদিকেই নয় অবস্থা বজায় থাকছিল না।

নিরুপায়ভাবে হাত দুটো ওপর দিকে ছুঁড়ে শেষকালে জুলিকে ডেকে আনার অনুরোধ জানালেন। আরও আধঘণ্টা ধরে তিনি প্রায় অনুনয়ের সুরে অনেক করে 'কাঁধ দেবা'র জন্যে বোঝাতে লাগলেন, এমন কি তাঁর বিশেষ বন্ধু আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান গর্ডন ডীনের সাহায্য এ বিষয়ে আদায় করে দেবার কথা দিলেন। জুলির

কথাগুলো হচ্ছিল খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে স্পষ্ট সোজাসুজি করে বলা।

জুলি বলছিল, আমেরিকা এতটা নীচ প্রবৃত্তি দেখানোর পরেও কি করে আশা করে যে, আমাদের বন্ধুদের সম্মান আর সহৃদয়তা আর সাহায্য আগের মতই পাবে? সত্যি তা ভাবা অসম্ভব। মানুষের কাছে মানুষ যেভাবে বলে, তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে আপনিই বলুন না এমন কোন যুক্তি দেখাতে পারেন যাতে এই রকমের হিংস্র দণ্ডাদেশ সমর্থন করা যায়? আপনি কি নিজের মনে একবারও এই তাগিদ অনুভব করেন না যে, নিছক সাধারণ ভদ্রতার দিক থেকে, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের দিক থেকে অ্যাটর্নী জেনারেলের কাছে আপনার পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ড রদ করার সুপারিশ জানানো উচিত? এই রকমের একটা শয়তানি চোখের ওপর ঘটতে দেখেও আমাদের দেশ কী করে তা নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে? ইতিহাসের অপনেয় কালিতে এ ঘটনা লেখা হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের কাছে চিরদিন এ একটা কলঙ্কের ডালি হয়ে থাকবে একথা জেনেও আমাদের দেশ কি করে চুপ করে বসে থাকতে পারে? মামলাটা আগাগোড়া উত্তেজনা, বিদ্বেষ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে চালানো হয়েছে—আমাদের এই একপা মিষ্টার ব্লককে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়াটাই কি সত্যিকার পৌরুষের লক্ষণ নয়? একবার ভেবে দেখুন! সত্যি নয়, কিন্তু যদি সব সত্যিই হত—আমার স্ত্রীকে বীভৎস মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে কয়েকটি লেখা টাইপ করার জন্যে! সাংঘাতিক অপরাধ, 'মানুষ খুনের চেয়ে খারাপ', তাতে সন্দেহ নেই এবং তার জন্যে চরমদণ্ড হওয়া উচিত—কিন্তু ঠিক সেই সময় যারা সমস্ত সভ্য মানুষের কাছে নৃশংস নির্বিকার খুনী হিসেবে দায়ী হয়ে আছে, সেই নাৎসী যুদ্ধাপরাধীরা কিন্তু দৈনিক ছাড়া পাচ্ছে।'

মিষ্টার বেনেটের চউনির মধ্যেও কেমন ক্ষ্যাপা ভাব ফুটে উঠতে লাগল। 'আপনারা যা বলছেন, ওসব কথা এখানে ওঠে না। দয়া করে

যদি আপনারা কাঁধ দিতে রাজী থাকেন, তাহলেই কিছু একটা করবার উপায় থাকে। আর কোন পথ খোলা নেই।' 'কেন থাকবে না,' আমি কথার মাঝখানে বলে উঠলাম, 'নতুন সাক্ষীসাবুদের ভিত্তিতে শুনানীর ব্যাপারটা মোটেই অবান্তর নয়; যতই হোক, আমরা যা দাবি করছি তা প্রমাণ করে ফেলা সম্ভব। সারা পৃথিবী জুড়ে যাদের অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তাসত্বেও সেই অসহায় দুটি মানুষকে শাস্তি দেওয়া এবং কার্যত বলা: হয় মার খাও, নয় মরো— সরকারের এই ব্যাপারটাই বরং ঘোরতর অবান্তর।'

ওহো, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম জুলির আসার বেশ খানিকক্ষণ পরে ওয়ার্ডেন শেষ পর্যন্ত হন্তদন্ত হয়ে এলেন। তখন ওঠাউঠির পালা শুরু হয়-হয়। জুলি তখন বলে চলেছিল: 'ভাল করে ভেবে দেখবেন, আমাদের বাঁচতে দেওয়াটাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে কিনা। দুনিয়ার মানুষ তা থেকে কি এই সত্যিকার প্রমাণটুকুই পাবে না যে, মানুষের ন্যায্য অধিকারগুলো সম্বন্ধে এদেশ যথার্থই সজাগ? অ্যাটর্ণী জেনারেলের নির্দেশে আপনার এখানে আসার ভেতর দিয়ে কি এটাই বোঝা যাচ্ছে না যে, এই মামলা চালানোর দোষে বাকি পৃথিবীর কাছে মুখ আমাদের অনেকটা ছোট হয়ে গেছে? এটা খুবই স্পষ্ট যে, আমাদের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার সুযোগ দিলে মর্যাদার দিক থেকে তাঁদের অনেক কম মূল্য দিতে হবে।

'ওঃ এই মামলা নিয়ে এত রাজনীতির কচ্‌কচি হয়েছে যে, অসহ্য! আর তাছাড়া ওটা প্রাসঙ্গিকও নয়। আপনারা বলছেন দেশের কোনাদন কোন ক্ষতি করেননি আপনারা, আপনারা বলেছেন দেশকে আপনারা ভালবাসেন, সত্যিই ভালবাসেন?'

আমরা জোরের সঙ্গে হ্যাঁ বললাম। তখন উনি বললেন, 'বেশ তো, তাহলে কাঁধ দিন এবং আমাদের এমন খবর দিন যার জোরে আমরা সাজা কমিয়ে দেবার সুপারিশ করতে পারি!' আমরা হতভম্ব

হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর আস্তে আস্তে জুলি বলল, 'দেখুন মিষ্টার বেনেট, আমরা তাকে এত বেশী ভালবাসি যে পাপের পথে নেমে তার সুনামে কলঙ্ক দিতে চাই না।'

ভদ্রলোক ক্লান্তভাবে কাঁধটা ঝাঁকালেন; ওয়ার্ডেনকে ভাল করে বোঝালেন যে, আমাদের তরফ থেকে তাঁর কাছে খবর দেবার কিছু থাকলে সে খবর যেন চটপট পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর যাবার মুখে আমি শেষ বারের মত জানলাম: 'আদালতে আমাদের বিচার হতে দিন, মিষ্টার বেনেট। যাতে আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি আমরা নির্দোষ—আমাদের বাঁচতে দিন। সেটাই হচ্ছে ন্যায়ের পন্থা, আমেরিকার পন্থা।'

পরে শুনলাম ভদ্রলোক জুলির পেছনে পেছনে গিয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে তাকে ধরে আবার বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, 'কাঁধ দিলে' তবেই একমাত্র আশা থাকে। 'পরে আবার একবার কি আসতে পারি'—ভদ্রলোক খানিকটা ভয়-ভয় করে বলছিলেন। জুলি স্পষ্ট করে খুব জোর দিয়ে বলেছিল, 'স্বচ্ছন্দে; তবে ভাল কোন খবর যদি আনেন তবেই!'

ভালবাসা— এথেল

৩৫৪ হাণ্টার ষ্ট্রীট,
ওসিনিং, নিউইয়র্ক।
১৬ই জুন, ১৯৫৩

প্রেসিডেণ্ট ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার
হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন সদর
প্রিয় মিষ্টার প্রেসিডেণ্ট,

দুটি সুদীর্ঘ জ্বালা-ধরা বছর সিং সিং-এর এই মৃত্যুপুরীতে আমার কেটেছে। কত বার যে আমার ঝোঁক চেপেছে—এবার একটা চিঠি

লেখা যাক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে। কিন্তু প্রত্যেক বারই আমার স্বভাবগত কেমন একটা লাজুক-লাজুক ভাব, আর সেই সঙ্গে মহৎ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের সামনে সাধারণ মানুষ যে রকম জড়োসড়ো হয়ে পড়ে তেমনি এক জড়তা শেষ পর্যন্ত আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। লিখতে দেয়নি।

এরপর যখন মিসেস উইলিয়াম ওটিস-এর আবেদন পড়লাম, মনে আমার সাহস হল। প্রাণস্পর্শী এক আবেদনে তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি করুণা ভিক্ষা করেছেন। দেখলাম এক বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের কাছে নিজের হৃদয় খুলে ধরতে তাঁর সংকোচ হয় নি ; আর আমি এই দেশের নাগরিক হয়ে নিজের দুঃখ জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারব না ? মিসেস ওটিস্ বাইরের লোকেদের কাছ থেকে যে সহানুভূতিটুকু পেয়েছেন আমি কি সেটুকু সহানুভূতিও আশা করতে পারি না ?

চেকোশ্লোভাকিয়া দেশটা ঠিক কেমন আমি জানি না। সে দেশের প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে আরও কম জানি। কিন্তু আমার এই দেশ এ-তো আমার অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। পৃথিবীর যেখানেই যাই, আমার মন কেমন করবে এই দেশটার জন্যে। আর 'প্রেসিডেন্ট' হবার চেয়ে আগেই ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছিলেন 'মুক্তিদাতা' কাজেই এমন একজন প্রেসিডেন্ট আমার চিঠি শান্ত মনে বিবেচনা করে দেখবেন না, বিশেষ করে যার মধ্যে মৃত্যু দণ্ডিত স্ত্রী এবং মৃত্যুদণ্ডিত স্বামীর প্রশ্ন জড়িত রয়েছে ?—এটা আমার বিশ্বাস হয় না।

এটা ঠিক, আজও পর্যন্ত আমাদের জীবনগুলো রক্ষা করা আপনি সঙ্গত বলে মনে করেননি। যাই হোক, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই কথাই মনে হয় যে, আপনার মাথার ওপর যে গুরু দায়িত্ব, এই সময় এত দিককার এত সব জরুরী প্রশ্ন—তারই দরুণ আজও পর্যন্ত আপনি সত্যিই এসব সুযোগ করে উঠতে পারেননি যাতে বিষয়টার ওপর

নিজে একটু ভেবে দেখতে পারেন।

আমি বিশেষ ব্যগ্রতার সঙ্গে বলছি, প্রধানত মৃত্যুদণ্ডটার কথাই আপনি ভেবে দেখবেন। আপনাকে আমি বলব, অনুগ্রহ করে নিজেই আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন—এই ধরণের দণ্ডাদেশের ফলে সুবিবেচিত বিচারের বদলে 'জোরজুলুম আর হিংসার' পথই প্রশস্ত হচ্ছে কিনা। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, যথানিয়মেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে (বরং ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো বলেই এখন অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে); বছরের পর বছর নির্জন কারাবাস প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ, এত কিছু সত্বেও দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে বার বার যখন একই কথা ঘোষণা করা হয় যে, আমরা নির্দোষ—তখন এই মৃত্যুদণ্ড একটা নিছক প্রতিহিংসা মেটানোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ইউরোপের রণাঙ্গণের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন আপনি। প্রতিহিংসার এই নীতি কি ভাবে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়াটা খেলা হিসেবে নিয়েছিল, তার বীভৎস রূপ নিজের চোখে দেখার বহু সুযোগ ঘটেছে আপনার। আর আজ যখন সেই ভয়ঙ্কর গলা-কাটা পাইকারী খুনীর দল উদার অনুকম্পা পাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রে সরকারী পদে পুনর্বহাল হচ্ছে—ঠিক তখনই প্রবল গণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র বন্যবর্বরের মত ধ্বংস করতে চাইছে একটি নির্বিরোধী ক্ষুদ্র ইহুদী পরিবারকে, যাদের অপরাধ সম্পর্কে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গেই বলেছেন, কোন জাতির পক্ষে একলা চলা সম্ভব নয়। এ কথা বলে আজকের এই ঘোরাল অবস্থায়, মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি সময়োপযোগী স্থির বুদ্ধি এবং নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, আমাদের দেশের সুনাম নষ্ট হওয়ার এই ব্যাপারটাকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।—বিশেষ করে, পক্ষপাত শূন্য ন্যায়ের ওপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আমাদের দেশ

যখন বাকি পৃথিবীতে পথ দেখাতে চাইছে।

এই দেশ যে ধর্মসম্মত ও গণতন্ত্রসম্মত আদর্শে বিশ্বাসী—আমার স্বামীকে ও আমাকে প্রাণ ভিক্ষে দিয়ে সে কথা প্রমাণ করবার এমন একটি সুযোগ আর কিসে মিলবে?

যদি তা করা হয়, একটি ক্ষুদ্র বালকের কাতর প্রার্থনায় তাহলে যথার্থই সাড়া দেওয়া হবে। মিষ্টার ওটিস্ ছাড়া পেলেন দেখে সেই বালকের প্রাণে আশা জেগেছে যে, তা'র আদরের বাপ মা-ও ছাড়া পাবে; আর কৈশোরের তাজা মন, বাড়ির জন্যে মন-কেমন-করা তার হৃদয় মিষ্টার ওটিস্-এর মুক্তিতে প্রেরণা পেয়েছে (তার মা-ও যেমন প্রেরণা পেয়েছে)। তাই তাঁরই মত শুধু মাত্র অনুকম্পাটুকুর জন্যেই আপনাকে লিখছি, সানুনয়ে বলছি; যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করবার প্রক্রিয়ার যেমন আছে আদালতেরই থাকুক; চোখ থেকে বিচার বিভাগীয় যুক্তি তর্কের ঠুলি সরিয়ে দিয়ে আপনি শুধু হৃদয় দিয়ে দেখুন। আমি সেই এলাকায় প্রবেশ করতে চাই, যেখানে বাস করেন স্নেহান্ধ পিতামহ, সংবেদনশীল শিল্পী, নিষ্ঠাবান ধার্মিক মানুষ। আমার আবেদন তাঁরই কাছে। দুনিয়ার মানুষের কাছে যিনি অপরিচিত নন, সেই মানুষটিকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—ইতিহাসে মহৎ বলে স্বীকৃত কোন্ এমন মানুষ আছেন, যাঁর মহত্ত্ব মহানুভবতার তুলাদণ্ডে মাপা হয় নি? সত্যিই তো, নেপোলিয়ানের এত দিগ্বিজয় সত্ত্বেও আমরা মুগ্ধ নেত্রে যখন তাকাই খৃষ্টের দিকে, মুশার দিকে, গান্ধীর দিকে—আমাদের আত্মার সম্পদ বাড়ে।

যাঁর নামের আছে মহিমা সেই মানুষটিকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত একটু অনুকম্পার চেয়ে বড় মহিমা আর কিসে আছে?

যিনি আপনার একান্ত আপন জন, আপনার সেই স্ত্রীর পরামর্শ নিন; দেশে রাজনীতিজ্ঞেরা তো গড়াগড়ি যাচ্ছে। শুনুন আপনার একমাত্র পুত্রের জননীর হৃদয় কি বলে! তাঁর হৃদয় আমার দুঃখ

বুঝবে। ওঁর পুত্রের মতই আমার ছেলেরাও মানুষ হয়ে উঠুক, আমি চাই ; আপনি যেমন ওঁর পাশে পাশে আছেন, তেমনি আমার স্বামীকেও আমি নিজের কাছে পেতে চাই—এ উনি বুঝবেন। আনন্দের সঙ্গেই তাঁর বিগলিত হৃদয় আমার হয়ে আপনার মনে সাড়া জাগিয়ে তুলবে ! এ তিনি করবেনই।

আর মহত্ত্বের কাছে সমস্ত পৃথিবীই শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াবে !

সশ্রদ্ধ

(স্বাক্ষর) (মিসেস্) এথেল রোজেনবার্গ ১১০-৫১০

জেনানা জেল—ফাঁসীর সেল।

শেষ চিঠি

প্রিয় ম্যানি, ১৭ই জুন, ১৯৫৩

ছেলেরা ঠিক কোথায় জানি না। তুমি একটু কষ্ট করে যত তাড়াতাড়ি পারো এই চিঠিটা ওদের পৌঁছে দিও কিম্বা টেলিফোনে পড়ে শুনিও, না হয়ত লোক মারফৎ ওদের কাছে চিঠিটা পাঠিয়ে দিও।

আমার সোনামাণিকেরা,

এরই নাম 'গা দিয়ে ঘাম ছোটা।' অবস্থাটা কষ্টের, সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন ছুরিতে শাণ পড়ে, মুরগীর দল ভয় না পেয়ে দিব্যি টুক টুক করে নিজেদের কাজ করে যায়। মুরগীরা যাতে ভয় পায় না, আমরা তাতে ভয় পাবো? শেষকালে মানুষ জাতটার নাম ডোবাবো? কক্ষনো নয়। তোমাদের শেষ চিঠিটায় যে 'মুরগীর উদাহরণ'টা দিয়েছিলে, সেদিন যখন দেখা হল সে কথাটা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। পরে বড্ড আপশোস হল—কথাটা মনে করে বললে ছেড়ে চলে যাবার সময় তোমরা মনে শান্তি পেতে।

যখন আমরা এ-ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বিদায় নিচ্ছিলাম তোমরা হয়ত ভাবলে মার কই কাঁদবার ইচ্ছে হল না তো!—হুঁঃ, যেন আমি দশ বছরের চেয়ে সামান্য একটু বেশী বয়সী খুকী! যখন কান্নায় তোমাদের ভেতরটা মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে উঠছিল, তোমরা চাইছিলে মা সেই কান্নাকে দু ফোঁটা চোখের জলে স্বীকার করে নিক; তোমরা হয়ত তখন ভাবছিলে মা মনটাকে অতটা শক্ত না করলেও পারে, একটু কাঁদুক না। সোনা মানিকরা, আমার পক্ষে সেইটেই সবচেয়ে সহজ, সব চেয়ে কম কষ্টের ছিল। তোমাদের দেখাদেখি কান্নায় ভেঙে পড়ার

জন্যে আমার দারুণ লোভ হচ্ছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে আমি ধরে রেখেছিলাম। সত্যিই, আমার দিক থেকে সব চেয়ে সহজ ছিল কান্নায় ভেঙে পড়া ; কিন্তু সেটা বড় নিষ্ঠুরতার কাজ হত। তাই আমি সহজ পথে না গিয়ে কষ্টের পথই বেছে নিয়েছিলাম—তোমাদের যে আমি নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসি, আমি যে জানতাম আমার কেঁদে মন হাল্কা করা যতটা দরকার। তার চেয়েও তোমাদের বেশী দরকার আমার সেই ভালবাসা।

তাই যে কটি মুহূর্ত হাতে পেয়েছিলাম, না কেঁদে আমি তোমাদের প্রাণপণে আশ্বাস দিয়েছি, বলেছি চিঠি লিখব। আরও অনেক কথা জানাবার মাঝখানে একটা বলে রাখি। তোমাদের বাপি আর মা-মণির মধ্যে চুমো খাওয়ার সম্পর্ক আছে—যদিও এখন এ অবস্থার মধ্যে আমরা তা পারি না। পারলে আমরা সুখী হতাম ; বাপ-মা পরস্পরকে এবং তাদের সন্তানদের যার যা মুস্কিল আছে দূর করতে এবং দরকার হলে 'গা দিয়ে ঘাম ছোটা'তে কতখানি বলভরসা দিচ্ছে—আমি বলি, সেই দেখেই বিচার করতে হবে তাদের মধ্যে সত্যিই ভালবাসা কতটা।

আদরের বাছারা আমার। আমি জানি যে অভাব আমাদের থেকে যাচ্ছে, যার জন্যে আমরা ফিরতে চাই—এই ভাবে বলে বুঝিয়ে যে অভাব পূরণ হয় না। আমি তা করতে চাইও না। যা বলছিলাম, আমাদের শুধু দরকার মনটাকে শান্ত করা, ভয়কে কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া—যাতে আমরা পরস্পরকে যতদূর পারি সাহায্য করে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারি।

আজ সকালে তোমাদের বাপির সঙ্গে আমার দেখা হবে। তার পর তোমাদের আবার লিখতে বসব। চিটিটা আধ-লেখা অবস্থাতেই তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমার অনেক ভালবাসা। আমার অনেক চুমো।

মা-মণি

প্রিয় ম্যানি, ১৮ই জুন, ১৯৫৩

আমাদের যাবতীয় ব্যাপার তদারক করার এবং ছেলেহুটোকে দেখার ভার আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। এ কাজ এমনিতেই তুমি করছ। কিন্তু তবু এ নিয়ে যাতে পরে কোন রকম প্রশ্ন না ওঠে, তার জন্মে মরবার আগে আমি একটা উইল তৈরি করেছি। তোমাকে এই অনুরোধ জানানোর ব্যাপারে এথেল আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং এই সঙ্গে সে নিজের হাতে সই করছে।

আমাদের হুই ছেলে আমাদের চোখের মণি, আমাদের গর্ব, আমাদের মহামূল্য সম্পদ। ওদের তুমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসো, ওদের তুমি বুকে করে রেখো যাতে ওরা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হতে পারে, ওরা যাতে নির্বিঘ্নে বড় হতে পারে। তুমি তা করবে আমি জানি—তবু আমি ওদের গর্বে গর্বিত পিতা, সেই পদাধিকারবলে আমি তোমার কাছে তা প্রার্থনা করে নিচ্ছি—তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধু, আমার বিশ্বস্ত ভাই। আমি আমার ছেলে হুটিকে অন্তরতম হৃদয় দিয়ে ভালবাসি।

বিদায় বলা আমার তেমন আসে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি—ভাল কাজ চিরদিন থেকে যায়; তবু এইটুকু বলতে পারি—জীবনকে এত ভাল এর আগে আর কোনদিনই বাসিনি; এই ভালবাসা এত প্রবল, তার কারণ আমি দেখতে পেয়েছি যে দিনগুলো আসছে, সেই দিনগুলো কি সুন্দর। সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ এগিয়ে আনার কাজে খুব সামান্য হলেও আমাদেরও কিছুটা দান থাকল—আমি মনে করি, আমার ছেলেরা এবং আরও লক্ষ্য মানুষ তার ফল পাবে।

যে আমার জীবন-সঙ্গিনী, যে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে আছে, আমার সেই মধুর-হৃদয় স্ত্রীর গৌরবোজ্জ্বল মহিমার কথা যখন বলতে যাই আমি ভাষা খুঁজে পাই না। আমাদের এক মহৎ ভালবাসা, মানুষের এক আশ্চর্য বন্ধন। হাতে হাত ধরা এই ভালবাসার মহামূল্য স্বর্ণসম্ভারে আমার জীবন সমৃদ্ধ আমার জীবন কানায় কানায় পূর্ণ।

রুগ্ন বর্ষীয়সী মা আমার ছিলেন বিপুল সান্ত্বনার উৎস। মা আমাকে, আমি মাকে, বরাবর অচঞ্চলভাবে ভালবেসেছি। আমাদের পক্ষ নিয়ে মা বরাবর কাজ করে গেছেন—নিজের সুখশান্তির দিকে তাকাননি। আমার বোনেরা, আমার ভাই একেবারে গোড়া থেকেই আমাদের সমর্থন করেছে যোলো আনা পেছনে দাঁড়িয়েছে, আমাদের পক্ষ নিয়ে কাজ করেছে। আমরা যথার্থই বলতে পারি – হ্যাঁ, আমাদের কঠিন দুঃসময়ে আমাদের দারুণ অগ্নিপরীক্ষার দিনে, আমার পরিবার আমাদের বল দিয়েছে।

আর ম্যানি তুমি! তোমাকে শুধু যে আমাদের পরিবারেরই একজন বলে মনে করি, তা নয়; তুমি আমাদের এক অতি পরম বন্ধু। তখনই তুমি হলে আমাদের ভাইয়ের মত আপন, আমাদের মধ্যে গড়ে উঠল ভালবাসা—যখন জীবন এবং জীবন বলতে যত কিছু বোঝায়, সমস্ত কিছুর জন্যে আমাদের সংগ্রামে নামতে হল। এই ভ্রাতৃত্ব, এই ভালবাসা আমাদের দুর্জয় শক্তি দিয়েছে। প্রিয় বন্ধু, আমাদের মনে করে বুক বাঁধো। আমরা তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি—তুমি সুস্থ থেকে, সুখী হয়ে জীবনকে ফলেফুলে সাজাও; তুমি যে বড় ভাল একজন মানুষ, প্রিয় বন্ধু, সাধারণ মানুষের একজন হৃদয়বান উকিল। আমি তোমাকে সম্মান করি, অভিবাদন জানাই, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে আদর করি।

পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্যে, সোনার ফসল তার গোলাপের দিন আনার জন্যে অনায়াসে মাথা উঁচু করে সাহসে, নিজেদের শক্তিতে, লক্ষ্য স্থির রেখে, অকম্পিত বিশ্বাসে, জল্লাদের চোখে চোখ রেখে আমরা দাঁড়াচ্ছি। চিরদিনের—

জুলি

পুনশ্চ :—আমার নিজের সম্পত্তি বলতে যা কিছু তিনটে ছোট কাঠের বাক্সে রইল এবং তুমি তা ওয়ার্ডেনের কাছে চাইলেই পাবে। অনেক ভালবাসা।

১৯শে জুন—এথেল চায় একথা সবাই জানুক : আমরাই প্রথম বলি আমেরিকার ফ্যাশিজমের।

এথেল ও জুলি

প্রিয়তম ম্যানি, ১৯শে জুন ১৯৫৩

নীচের এই চিঠিটা আমার ছেলেদের জন্যে।

আমার আদরের মানিকরা, আমাদের দুটি চোখের মণি :

মাত্র আজ এই সকালে দেখে শুনে মনে হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত বুঝি আবার আমরা মিলতে পারব। যখন দেখা যাচ্ছে তা হবার নয়—আমি চাই যা কিছু আমি জেনেছি তোমরা তা জেনে রাখো। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি হয়ত মাত্র খুবই কয়েকটি সহজ কথা লিখে জানাতে পারব; বাকি কথাগুলো তোমাদের শিখতে হবে নিজেদের জীবন থেকে, আমিও যেমন জীবনের কাছ থেকেই শিখেছি।

গোড়ায় গোড়ায় অবশ্য আমাদের কথা মনে করে তোমাদের ভীষণ কষ্ট হবে। কিন্তু সে দুঃখ তোমাদের সঙ্গে সমান করে ভাগ নেবার আরও অনেকে থাকবে। এই আমাদের সান্ত্বনা, তোমরাও এ থেকে সান্ত্বনা পাবে।

দিন যত যাবে ততই তোমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নেবে—হ্যাঁ এই জীবনটা বাঁচবারই মত। মনে শান্তি আনো আর জেনে রাখো, আজ এখনও পর্যন্ত—একেকটি মুহূর্ত যায় আর দিন আমাদের ফুরিয়ে আসে, কিন্তু তবুও—আজও এখনও আমরা সেই সত্যে বিশ্বাসী। সেই সত্যের সামনে হত্যাকারী জল্লাদকেও নতজানু হতে হয়।

নিজেদের জীবনই তোমাদের শেখাবে—খারাপের মাঝখানে

ভালো কখনও বেড়ে উঠতে পারে না। স্বাধীনতা এবং এমনি যেসব জিনিস জীবনকে সত্যিই সুন্দর, সত্যিই সার্থক করে তোলে—তা পাবার জন্যে মাঝে মাঝে খুব বেশী রকমের মূল্য দিতেই হয়। আমরা মনের প্রশান্তি হারাইনি, আমরা গভীরভাবে বুঝেছি—সভ্যতা আজও এতদূর অগ্রসর হতে পারেনি যখন আর জীবনকে জীবন দিয়ে কিনতে হবে না ; আমরা সুনিশ্চিতভাবে একথা জানি বলেই সান্ত্বনা পাই যে, আমাদের কাজ অন্যেরা চালিয়ে যাবে। কাজেই সে কথা ভেবে নিজের মনটাকে শান্ত করো।

যদি তোমাদের সঙ্গে একত্রে থেকে জীবনটাকে আমরা কাটিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে কত আনন্দ কত সুখই না আমরা পেতাম। তোমাদের বাপি এই শেষের স্মরণীয় মুহূর্তগুলো আমার সঙ্গেই আছে। তোমাদেরই কাছে সে তার হৃদয় উজাড় করে দিতে চায়, হৃদয়ে যত ভালবাসা আছে সে তার মানিকদের দিতে চায়। চিরদিন মনে রেখো আমরা ছিলাম নির্দোষ, হাজার পীড়নেও আমরা আমাদের বিবেক বিসর্জন দিতে চাই নি।

তোমাদের বুকের কাছে নিচ্ছি। আমরা তোমাদের চুম্বন করছি সমস্ত শক্তি দিয়ে। ভালবাসা জেনো।

বাপি ও মা-মণি

জুলি, এথেল।

পুঃ। ম্যানির প্রতি।—বুকে ধারণ করার মঙ্গলকবচ ও চেন—আমার বিয়ের আংটি—আমাদের মৃত্যুহীন ভালবাসার স্মারকচিহ্ন হিসেবে ওদের কাছে পৌঁছে দিও।

পুঃ। ম্যানির প্রতি।—এস, এম্‌-কে আমার শুভেচ্ছা জানাতে ভুলো না। তাঁকে বলো, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তাঁকে আমি ভালবাসি

ও শ্রদ্ধা করি। আমি যে জয়ী, নিশ্চয় সেকথা ভাবছেন—আমার এই অনুভবের কথা তাঁকে বলো। আমার কোন ভয় নেই, কোন অনু-শোচনাও নেই। এই ফাঁদ সম্পূর্ণভাবে কেটে আমরা মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারলাম না, আর আমার মাথার মধ্যে যে গুণগুলো ছিল তা পরিপূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পেল না - এই সামান্য একটু দুঃখ থেকে গেল। উনি যেন তোমার কাছ থেকে একথা জেনে খুশী হন যে, তিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, আমাকে হাত ধরে এগিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত প্রিয়জনদের কাছে থাকল অনেক, অনেক ভালবাসা। তোমাকে কত যে ভালবাসি—

এথেল